ভান্ডার

শারদীয়া ১৩৯৮

১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায়
নিয়োজিত

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীভাইদের কৃষিঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

- এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের পর ½ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন
- আপনার সঞ্চয় ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কীমে সুরক্ষিত থাকবে।
- 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে
- মনে রাখবেন—এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে
- ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কীমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ

হেড : অফিস : ২৪এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
প্রধান শাখা অফিস : ২৪এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
অন্যান্য শাখা অফিস : ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালী, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, মিঃ আলিপুর ও চেতলা। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে
আঞ্চলিক তথা শাখা অফিস : হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

শারদ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

—সম্পাদক

আটত্রিশতম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর, ১৯৯১

ঃ অনুষ্ঠানসূচি ঃ

১৫ নভেম্বর :	বৃহস্পতিবার :	সমবায়ে গণতন্ত্রীকরণ দিবস
	শুক্রবার	সমবায়ে ঋণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
	শনিবার	সমবায় ও পরিবেশ দিবস
	রবিবার	সমবায় বিপণন ও ভোক্তা দিবস
	সোমবার	গ্রামীণ সমবায় দিবস
		মহিলা ও যুব সমবায় দিবস
		আবাসন ও শহরাঞ্চলীয় সমবায় দি

শহর, গ্রাম-গঞ্জ, সর্বত্র সংখ্যেচিত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত সূচি অনুযায়ী 'সমবায় সপ্তাহ' পালন করুন।

—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

সমবায় সমিতি গড়ে তুলুন

সমবায় সমিতির অংশীদার হয়ে আপনি আপনার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সমবায় সমিতি সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে হলে প্রতি জেলায় জেলা সমবায় ইউনিয়নে যোগাযোগ করুন।

সমবায়

শারদীয় ১৩৯৮

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৩২৯
১১১৮ চৈত্রসংক্রান্তি

সম্পাদক : ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : অপরূপ টাকলা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলকাতা-৭০০০০১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

নতুন সমবায় আইনের দিকে দিকে সংশোধন

ছায়াচিত্রের চালচিত্র

রম্যরচনা

টাইপরাইটার

ভালবাসা

অন্য বেলা

ঘোলাজল ঘরে

সমীর চট্টোপাধ্যায়

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ১৯৮৩-র ৬৫(১) এবং নিয়মাবলী ১৯৮৭-র ১১১(১) ধারাবলে প্রত্যেক সমবায় সমিতির তাঁদের পরীক্ষিত উদ্বর্ত পত্র (ব্যালান্স সীট) অনুযায়ী সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রদেয় টাকা জমা দেওয়া অতি অবশ্য পালনীয়।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার বকেয়া সমবায় ঋণ মকুব করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে এ বছর প্রত্যেক সমিতি ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান খাতে যে সুযোগ পাবেন সেই সুযোগে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি আশা করে, প্রত্যেক সমিতি তাদের প্রদেয় সমবায় শিক্ষা তহবিলের টাকা [বকেয়া সহ] জমা দেবেন। নিজ নিজ এলাকার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কলিকাতার **"সমবায় শিক্ষা তহবিল"** এ্যাকাউন্টে ঐ টাকা জমা দেওয়া যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক বা সমবায় পরিদর্শকের সাহায্য নিতে পারেন।

সম্পাদক

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

কর্তৃক প্রকাশিত

সমস্ত পুস্তক এবং উপবিধি নিম্নলিখিত ঠিকানাতেও পাওয়া যায়

সহ-শিক্ষা আধিকারিক

উত্তরাঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

শচীন্দ্র ভবন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

[খেলার মোড়ের নিকটে]

গল্প

সন্ধ্যা	মহাশ্বেতা দেবী
ঝোমবুড়ো ও বধূরা মারা	সুবোধকুমার চক্রবর্তী
আশাবরী	নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রভবন্ধুদের জন্য	বিমল মজুমদার
সাবধানে বুঝিয়ে	অমলকুমার রায়
প্রতিবেশ	মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘর	দুর্গা ভট্ট
বিপদ	শৈলেন ভট্টাচার্য
যে রাতগুলোর আর হবে না দেখা	শ্যামল মৈত্র
পদ্মপত্র	শেখর বসু
নিভৃত পলের প্রজাপতি	কবিতা সিংহ
নীলকণ্ঠের হনিমুন	নীলাদ্রি ঘোষ
যাত্রিনী	আবুল বাশার
প্রহর শেষে	শক্তিনারায়ণ পাল

কবিতা

নদীর কিনারে ওরা	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কিনারের পাশে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কোন বিকল্প নেই	কৃষ্ণ ধর
এই হাওয়া	শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
প্রতিধ্বনি	শুভ্র সাহাগুপ্ত
বৃষ্টি	প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ভাগাড়ে সাম্রাজ্য	অপরাজিতা গোপী
দাগ	বীরেন সাহা
প্রাত্যহিক	হিরণশঙ্কর মৈত্র
অন্ত	মলয়শঙ্কর সাহাগুপ্ত
স্বপ্নের ভিতরে	কাজী নুরুলিস্লাম আবেদিন
এসো, তোমারও নিমন্ত্রণ	অজিত বাইতী
বৃষ্টির রাতখানে	গৌতম হাজরা
নৈসর্গিক বেদনায়	সুজিত হালদার
কবি সম্মেলন	নারায়ণ সেন

জানেন তো ?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নগর কার্যালয়ে নানারকম মডেল উপবিধি, আবেদন পত্র, সমবায়ের উপর বিভিন্ন বই, সমবায় আইন ও নিয়মাবলী, বাৎসরিক রিটার্ন ফর্ম ইত্যাদি পাওয়া যায়।

☐ নতুন নতুন বিষয়ে আরো নতুন সমবায় গড়ে তুলুন। বেকার সমস্যা সমাধানে সমবায় সংগঠনের বিকল্প নেই।

☐ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা করতে ক্রেতা সমবায় সবচেয়ে ভালো প্রতিষ্ঠান। ন্যায্য মূল্যে, সঠিক ওজনে, খাঁটি জিনিস সরবরাহ করতে পারে একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসঙ্ঘ লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের শীর্ষ সংস্থা)

C o পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল,

কলিকাতা-৭০০ ০০১

রেজিঃ নং ১/সি তারিখ ২১-৩-৮১

ফোন : ২০-৮১১৮

☐ মহিলাদের স্বনির্ভর করার ব্রতে আমরা এগিয়ে চলেছি।

☐ মানিকতলা সিভিক সেন্টারে সমবায়িকাতে আমাদের সেল-কাউন্টারে কেনাকাটা করুন।

আরতি ভট্টাচার্য
সভানেত্রী

মঞ্জরী গুহ
সম্পাদিকা।

শুভায় ভবতু

শরতের প্রথমে চলছে অফুরান সুরের খেলা। মোহিনী আড়াল থেকে শরৎরাণীর সলাজ অলস চরণধ্বনির নিরুন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। এখনো যেন প্রসাধনরত মেঘদূতের রক্তিম ওড়না পুরোপুরি সরে নি। অঙ্গ দেবীপক্ষের আর দেরি নেই। দশপ্রহরণধারিণী বন্দিজনবন্দনী চিন্ময়ীর বোধনমুহূর্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে। তবু আধারাক্ত নীল মাঝে মাঝে মেঘের অভিমান নিয়ে মুখরতার করে থাকে। যেন বলতে চায় আমি থাকবো। আশ্বিনের শুভ্রে টানা নীলে মাঝে মাঝে জলের পলক পড়ে। আমনের অভিপাশে উত্তরবাংলা বিবশ্রী। আমাদের বাস্তবসজন মহাসুগিতিতে উৎখাত, দিশাহীন। তারা দ্রুত অন্তর্কাতি কাটিয়ে উঠুন এই আমাদের একান্ত কামনা।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহবেদনা পাশে। তবুও শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত আলো। অনটন, ধার্মতা ক্লান্তি নৈরাশ্যের অন্ধকার বারবার ছেয়ে ফেলে আমাদের স্বপ্নের ঈমানা। সেই অন্ধকারের পাখায় আমাদের ঢেকে ফেলে বসে, যখন মনে হয় কোথাও আলোর চিহ্নটুকুও নেই, এমনি মানুষের অন্তরের আলো শক্তির প্রদীপে জ্বালিয়ে তোলে অগ্নিশিখা। একটি জীবনের ছন্দে সহস্র জীবনের সম্মিলিত কলরোলে আশ্বিনের ভোরে গড়ে ওঠে। বাধা, শিরাশঙ্কার কালো পাহাড় পেরিয়ে যেন ছেলে যৌবনসুরের। নতুন প্রত্যুষ, নবারুণ শিশু, কিশোর, সবা যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত প্রচণ্ড যুবশক্তি, তাদের দুচোখে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন। নতুন সমাজ অনেক ভাঙা-গড়ার ঘণ্টা দিয়ে নতুন পৃথিবীর অভিনব ইসারা। উৎসব, পূজার দিনগুলি নিয়ে আসে সব বিভাজন রেখার লুপ্তি সাধনের মুহূর্ত। সমস্ত সুখদুঃখ ধাক্কি থেকে ছুটিয়ে পড়ে বিশ্বমানবতায়। রাত্রির কালো আধারের পর যেমন দিনের আলোর দীপ্ত স্বচ্ছতা তেমনি সারা বছরের কড়-ঝাপির শেষ এই শরতের সুরে সুরে। তীতি ও শুভেচ্ছার প্রসন্নতায় অশুভ শক্তির হুকুটি ঘরে সরিয়ে দিয়ে দেশবাসী এসে দাঁড়ান সাফল্যের অবগুণ্ঠনে। তাঁদের বরাভয় মুদ্রিত হাতে আমাদের এই সদ্যপ্রসূ সৃষ্টির বিনম্র নৈবেদ্য উপস্থাপিত করার সুযোগ পেয়ে আমরা কৃতার্থ। আনন্দময় হোক উৎসবমুখর দিনরাত্রি। □

সমবায় সম্বন্ধে জানতে হলে

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের

একমাত্র মাসিক মুখপত্র

ভা ণ্ডা র

প ড়ু ন

* সমবায় নীতি, আদর্শ এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচারে
* দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে
* জনমানসে মার্জিত রুচি ও বিজ্ঞানমুখী চেতনা সৃষ্টি করতে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত

ভা ণ্ডা র

সর্বদা সচেষ্ট

সমবান্দোলনের সংবাদ, সফল সমবায়ের কাহিনী, দৃষ্টান্তমূলক, ক্ষুদ্রশিল্প, চাষবাস, গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিষয়ক রচনা, সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর সংশোধন, সমবায় বিভাগীয় সার্কুলার এবং সমবায় নিবন্ধকের নির্দেশ, ইতিহাস এবং শারদীয় সংখ্যায় জীবনমুখী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিত্ররচনা ইত্যাদি ভাণ্ডারে ছাপা হয়।

[এই লাইন বরাবর কাটুন]

.....

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অষ্টম তল),
কলিকাতা-৭০০ ০০১

ভাণ্ডার পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা তিন টাকা ড্রাফট / মানি অর্ডার যোগে / লোকে মারফত পাঠাইলাম।

নাম.....

গ্রাম ..... ডাকঘর.....

জেলা ..... পিন কোড.....

.....

স্বাক্ষর ও তারিখ

নতুন সমবায় আইনের দ্বিতীয় সংশোধন

অসীম রায়

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর সাথে ১৯৮৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার পর ১৯৮৩ সালের আইনের (অ্যাক্ট) মোট দু'বার সংশোধন হয়েছে। প্রথমটি কার্যকর হয়েছে ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে। এটি ভান্ডার পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় ও সাম্প্রতিক সংশোধনীটি গত ২১শে আগস্ট (১৯৯০) বিধানসভায় পাশ হয়। এ সম্পর্কে রাজ্যপালের সম্মতিসূচক বিজ্ঞপ্তিটি আইন বিভাগের ১৫৩২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গত ১১১০ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের ১১৯১ সালের ২২শে জুলাই ওয়াজিদে দেওয়া ২৭০৪ কো-অপ নং নির্দেশ বলে দ্বিতীয় সংশোধনীটি ১৯৯১ সালের ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।

এই সংশোধনের দ্বারা যে-সমস্ত ধারা ও সেকশনে প্রয়োজনে অল্পবিস্তর পরিবর্তন আনা হয়েছে ধারা (সেকশন) অনুসারে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

১। সংজ্ঞাসমূহ (ডেফিনিশনস)-ধারা-২

(১) প্রকরণ (ক্লজ)-২। শীর্ষ সমিতি (এপেক্স সোসাইটি)

"শীর্ষ সমিতি এমন একটি সমবায় সমিতি যার সদস্য এলাকা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত এবং যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে সভ্যভুক্ত অন্যান্য সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সহায়তা করা ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সুবিধার ব্যবস্থা করা। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককেও শীর্ষ সমবায় সমিতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।" সংশোধনের মাধ্যমে পূর্বের কার্যকর এলাকার (এরিয়া অফ অপারেশন) স্থলে "সদস্য এলাকা" (এরিয়া অফ মেম্বারশিপ) করা হয়েছে।

(২) প্রকরণ (৪)-নিরীক্ষাধিকারিক (অডিট অফিসার)

"নিরীক্ষাধিকারিক এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমবায় আইনের ১০ ধারা অনুসারে নিরীক্ষাধিকারিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ১ ধারার ২ উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারি নিরীক্ষা অধিকর্তাকেও বোঝাবে।" এই সংজ্ঞায় নতুন সংযোজন হ'ল সহকারি নিরীক্ষা অধিকর্তা।

(৩) চতুর্থ প্রকল্পের পর "নিরীক্ষা এলাকা (অডিট রেঞ্জ)" শীর্ষক ও (৪ক) সংখ্যক নিম্নলিখিত প্রকল্পটি নতুন সংযোজিত হয়েছে:

"প্রকরণ (৪ক)-নিরীক্ষা এলাকা (অডিট রেঞ্জ)

নিরীক্ষা এলাকা বলতে ১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত সহকারি নিরীক্ষা অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনস্থ নন এমন নিরীক্ষা আধিকারিকের অধিকারক্ষেত্রকে বোঝাবে।"

(৪) প্রকরণ (৭)-কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক)

"১১৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক আইনে বর্ণিত অর্থেই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হবে।" পূর্বের সংজ্ঞায় ন্যাবার্ডের স্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উল্লেখ ছিল।

(৫) প্রকরণ (১) : কেন্দ্রীয় সমিতি (সেন্ট্রাল সোসাইটি)

"কেন্দ্রীয় সমিতি বলতে বোঝাবে এমন একটি সমবায় সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল সভ্যভুক্ত অন্যান্য সমবায় সমিতির কার্যক্রমে সহায়তা করা এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককেও বোঝাবে।" এর আগের আইনে কেন্দ্রীয় সমিতির সংজ্ঞায় কার্যকর এলাকা সম্পর্কে বলা ছিল, উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না।

(৬) প্রকরণ (১১) : সমবায় ঋণদান সমিতি

"সমবায় ঋণদান সমিতি এমন এক ধরনের সমবায় সমিতি যার প্রধান উদ্দেশ্য সমিতির বা তার সদস্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত মূলধন চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা। তার লক্ষ্য হবে ঋণ, ধন ও অন্যান্য উপায়ের যথোপযুক্ত সম্ব্যবহারের দ্বারা কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।" সংশোধনের দ্বারা মূল অর্থের কোন পরিবর্তন হয় নি। শুধু গঠনের কিছু ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে।

(৭) প্রকরণ (১৭) : সমবায় ঋণদান সমিতি

"সমবায় ঋণদান সমিতি এমন এক সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সদস্যদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন।" এই সমিতির সংজ্ঞার পরিধি থেকে ঋণদান সমিতিসমূহের ইউনিয়ন বা মহাসঙ্ঘ (অপেক্স ইউনিয়ন) সংশোধনের দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৮) প্রকরণ (২১) জেলা সমবায় ইউনিয়ন

"জেলা সমবায় ইউনিয়ন এমন সমবায় সমিতি যার সদস্য এলাকা একটি সম্পূর্ণ সমবায় জেলা জুড়ে বিস্তৃত ও যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে তার উদ্দেশ্য রূপায়ণে সহায়তা করা।" পূর্বের সংজ্ঞার "কার্যকর এলাকা" বাদ দিয়ে "সদস্য এলাকা" সন্নিবেশিত হয়েছে আর "কেন্দ্রীয়

সমিতি" হিসাবে প্রত্যক্ষ পরিচিতি থেকে জেলা সমবায় ইউনিয়নকে প্রত্যাহৃতি দেওয়া হয়েছে।

(১) আঠাশ প্রকরণের পর (২৮এ) সংখ্যায় "জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক" সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি নতুন সংযোজিত হয়েছে—

প্রকরণ (২৮ এ) : জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

"এই ব্যাঙ্ক বলতে বোঝাবে ১৯৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক আইনের তিন ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ককে।" আগের আইনে এই ব্যাঙ্কের কোন সংজ্ঞা ছিল না।

(১০) **প্রকরণ (৩১) আধিকারিক (অফিসার)**

আধিকারিকের সংজ্ঞা থেকে ৩১ ধারার (সি প্রকরণ অনুসারে নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক (স্পেশাল অফিসার) অংশের আইনে অনবধানবশত বাদ পড়ে গিয়েছিল। সংশোধনের দ্বারায় বর্তমান আধিকারিকের সংজ্ঞায় প্রাধিকারিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(১১) **প্রকরণ (৪১) : রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক**

"১৯৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক আইনে বর্ণিত অর্থেই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হবে।" পূর্বের সংজ্ঞায় নাবার্ডের স্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উল্লেখ ছিল।

(১২) **প্রকরণ (৪২) : রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন**

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পূর্বের সংজ্ঞায় "কার্যকর এলাকা" বাদ দিয়ে "সমস্য এলাকা" স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

২। **ধারা ১০ (২) : নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর অর্পণ**

ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত নিরীক্ষা অধিকর্তার প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসহ সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে নিরীক্ষা অধিকর্তাকে সাহায্য করার জন্য নিম্নস্থ ব্যক্তিদের ওপর অর্পণ করতে পারেন। এই সংশোধনের ফলে নিরীক্ষা অধিকর্তার ষষ্ঠ তফসিলের ক্ষমতাগুলি আর অনন্য (এক্সক্লুসিভ) থাকলো না। অর্থাৎ রাজ্য-সরকার নিরীক্ষা অধিকর্তার সাহায্যকারিদের উপরেও এই তফসিলের ক্ষমতাগুলি এখন থেকে অর্পণ করতে পারবেন।

৩। **ধারা ১১ (১) : যে-সমস্ত সমিতি নিবন্ধিত হতে পারে :**

সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য সমবায় নীতি মানার কথা আগের আইনেও বলা ছিল। কিন্তু এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় নীতি বলতে সুনির্দিষ্ট কোন্ নীতিগুলিকে বোঝাবে তা আগে কোথাও বলা ছিল না। ১১ ধারার (১) উপধারার দ্বিতীয় অনুবিধির নীচে সংযোজিত ব্যাখ্যার মধ্যে সমবায় নীতিগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

"ব্যাখ্যা—সংশয় দূর করার জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষিত হচ্ছে যে সমবায় নীতি বলতে নিম্নলিখিতগুলি বোঝাবে।

(এ) সমবায় সমিতির সদস্যপদ হবে ঐচ্ছিক এবং যাদের অনুরূপ যোগ্যতা আছে তাদের কাছে কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক তারতম্য ব্যতিরেকে সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে ;

(বি) নামিক (নমিন্যাল) সদস্য ছাড়া সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যের "এক সদস্য এক ভোট" নীতি অনুসারে ভোট-দানের সমান অধিকার থাকবে ;

(সি) সমিতির লেনদেন থেকে কোন উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় হলে তা সামগ্রিকভাবে সমবায় সমিতির বলেই গণ্য হবে এবং সাব্যস্ত উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ের উপর কোন ব্যক্তি সদস্যের কোনরূপ দাবি থাকবে না ;

(ডি) সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে সম্ব্যবহার করা হবে :

(এক) সমবায় সমিতির ব্যবসায় উন্নয়নের স্বার্থে ;

(দুই) সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে উপভোগ্য পরিষেবাদির সম্প্রসারণে ;

(তিন) সমবায় সমিতির সাথে সদস্যগণ যে কারবার বা লেনদেন করবেন সেই অনুপাতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে ;

(ই) সমবায় সমিতি তার সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে সমবায় নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে ;

(এফ) সমবায় সমিতি প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে স্থানীয়, রাজ্য বা আন্তর্রাজ্যের সমবায় সমিতিসমূহের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে ;

(জি) সমবায় সমিতির অংশধন মূলধন লাভ্যাংশের আকারে খুবই সীমিত হারে প্রতিদান পাবে ;

(এইচ) সমবায় সমিতির সদস্যবর্গের সাধারণ সভায় সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিফলিত সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হবে ;

(আই) সমবায় সমিতির পর্ষদের (বোর্ড) পরিচালকগণ সমবায় সমিতির সদস্যবর্গের নিকট অবশ্যই দায়ী থাকবেন।"

৪। **ধারা-১৩ নিবন্ধনের আবেদনপত্র**

(১) উপধারা-(২) "পৃথক পরিবারভুক্ত হতে হবে"-র পরে নিম্নলিখিত অনুবিধি (প্রভাইজো) যোগ করতে হবে :

"প্রকাশ থাকে যে সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সংখ্যা আটের কম হবে না।" ধারা ৮ জন নিয়ে সমবায় আবাসন সমিতি গঠনের বিধানটি ১৯৮০ সালের মূল আইনে ছিল না। সমবায় আইনের ৭(বি) ধারা অনুসারে ১৯৮৭ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে প্রকাশ ৪৪৮৩-কো-অপ. সংখ্যক নির্দেশ মোতাবেক রাজ্য-সরকার আবাসন সমিতিগুলিকে ন্যূনতম ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমান সংশোধনীর মাধ্যমে

মূল আইনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় বিধানটি আনা হল।

(২) উপধারা-(৭)—প্রকরণ (ক) ও (খ)-তে উল্লিখিত—প্রধান সমবায় "ন্যায়পীঠের সদস্যের" পরিবর্তে হবে, "সমবায় ন্যায়পীঠের সভাপতি বা প্রধান সমবায় ন্যায়পীঠের সভাপতি, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে"। মূল আইনে নিবন্ধন পরিষদের সভাপতি পদে সমবায় ন্যায়পীঠের সদস্যের কথাই ভাবা হয়েছিল। বর্তমান সংশোধনের মাধ্যমে সমবায় নিবন্ধন পরিষদের সভাপতি পদে সমবায় ন্যায়পীঠের সভাপতি বা প্রধান সমবায় ন্যায়পীঠের সভাপতির কথা বলা হয়েছে।

৫। ধারা-১৭(১) : উপবিধির সংশোধন

এক উপধারার পরে নিম্নলিখিত অনুবিধিটি (প্রভাইসো) যোগ হয়েছে :

"প্রকাশ থাকে যে উপবিধির বিধান যদি আইন বা নিয়মাবলীর সাথে সঙ্গত না হয় তাহলে উপবিধির বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট অসামঞ্জস্য দূর করে উপবিধি সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উপবিধিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ আইন বা নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।" পূর্বে উপবিধির মধ্যবর্তী সম্পর্কে আইনে এরূপ কিছু বলা না থাকলেও নিয়মাবলীতে (নিয়ম-১১) বলা ছিল ও এখনও আছে।

৬। ধারা-১৮ : উপবিধি সংশোধনে নির্দেশদানবিষয়ক নিবন্ধকের ক্ষমতা

দুই উপধারার অর্থপ্রদায়ী ব্যাঙ্কের পরে "যদি থাকে" যোগ করতে হবে। নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সমিতি উপবিধি সংশোধনের কাগজপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হলে অর্থপ্রদায়ী ব্যাঙ্কের (যদি থাকে) সাথে পরামর্শক্রমে নিবন্ধক সংশোধনী প্রস্তাব নিবন্ধন করে নেবেন। সব সমিতির তো অর্থপ্রদায়ী ব্যাঙ্ক থাকে না। তাই এ সংশোধনটির প্রয়োজন ছিল।

৭। ধারা ১১ : সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পদ ও দায়িত্বের হস্তান্তর এবং বিভাজন ও সংযোজন

(১) ৪ নং উপধারার সাথে নিম্নলিখিত অনুবিধি (প্রভাইসো) যোগ করতে হবে।

"প্রকাশ থাকে যে, কোন সদস্য সমিতির কাছে ঋণী থাকলে বা সমিতি প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সদস্যের হয়ে জামিন থাকলে ততদিন পর্যন্ত ঋণীর ক্ষেত্রে ধারের টাকা আর জামিনদারের ক্ষেত্রে জামিনের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণ শোধ না হচ্ছে ততদিন অবলেখন মূল্যধন বা আমানতের টাকা তুলে নেওয়ার কোন ইচ্ছা সদস্য প্রকাশ করতে পারবে না।"

(২) উপধারা-(৭) : এই উপধারাটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। এই উপধারাতে বলা ছিল—"যখন কোন সমবায় সমিতির পরিসম্পদ ও দায়িত্ব অন্য কোন সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহে হস্তান্তরিত হবে তখন হস্তান্তরকারী সমবায় সমিতি জেলে গেছে বলে বিবেচিত হবে এবং তার অবলুপ্তি ঘটবে।"

(৩) উপধারা-৮) : (এক) বিভাজনের দ্বারা নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে (এ) প্রকরণের (ক্লজ) শেষে নিম্নলিখিতগুলি যোগ হবে—"এবং সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ ও দায়িত্বের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যা ১৬ ধারা মতে দেয় নিবন্ধনের প্রমাণপত্রের অংশ বলে বিবেচিত হবে।"

(দুই) সংযোজনের দ্বারা নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে (সি) প্রকরণের (ক্লজ) শেষে নিম্নলিখিতগুলি যোগ হবে :

"এবং সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ ও দায়িত্বের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যা ১৬ ধারা মতে দেয় নিবন্ধনের প্রমাণপত্রের অংশ বলে বিবেচিত হবে।"

৮। ধারা। ২০ সমবায় সমিতিসমূহের বিভাজন বা পুনর্গঠনের নির্দেশদান সংক্রান্ত নিবন্ধকের ক্ষমতা :

(১) ২০ ধারার সংশোধনের মাধ্যমে বিভাজনের দ্বারা বিভিন্ন সমিতি গঠনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। আগে ২০ ধারায় বিভাজন সম্পর্কে কিছু না বলে পুনর্গঠন সম্পর্কে বলা ছিল।

উপরোক্ত উপান্ত টীকা (মার্জিনাল নোট) পরিবর্তিত হয়ে নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত হয়েছে, "সমবায় সমিতিসমূহের বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনসংক্রান্ত নিবন্ধকের ক্ষমতা।"

(২) এক উপধারার মধ্যে বিভাজনের দ্বারা একটি সমিতিকে একাধিক সমিতিতে রূপান্তরের সুস্পষ্ট উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

(এক) পূর্বের নিম্নলিখিত কথা "দুই বা ততোধিক সমবায় সমিতিসমূহের সংযোজিত বা পুনর্গঠিত হওয়া উচিত" শব্দগুলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথা থাকবে, যথা—"কোন সমবায় সমিতি বা সমবায় সমিতিসমূহের বিভাজিত, পুনর্গঠিত বা সংযোজিত হওয়া উচিত।"

(দুই) "সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহকে নির্দেশ দেবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহকে নির্দেশ দেবেন" শব্দগুলি প্রযুক্ত হবে।

(তিন) "সংশ্লিষ্ট সংযোজন বা পুনর্গঠন করতে" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "সংশ্লিষ্ট বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজন করতে।"

(চার) "সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের, ক্ষেত্র বিশেষে, সংযোজন বা পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে—"সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহের ক্ষেত্র বিশেষে, নিয়মাবলীর বিধান মোতাবেক বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের ব্যবস্থা নেবেন।"

(পাঁচ) "সংযোজন বা পুনর্গঠনের দ্বারা গঠিত" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের দ্বারা গঠিত।"

(ছয়) "ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে অগ্রিম পরামর্শ না করে কোন সমবায় ব্যাঙ্কের সংযোজন বা পুনর্গঠনের কোন

নির্দেশ দেওয়া যাবে না" বাক্যটির পরিবর্তে হবে, "জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা ক্ষেত্র বিশেষে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে আগাম পরামর্শ না করে কোন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের কোন নির্দেশ দেওয়া যাবে না।"

(৩) সমবায় আইনের ২০ ধারার তিন উপধারার মধ্যে "সংযোজন বা পুনর্গঠনের" পরিবর্তে হবে "বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজন।"

(৪) (ক) সমবায় আইনের ২০ ধারার চার উপধারার মধ্যে—"সংযোজিত বা পুনর্গঠিত" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে—"বিভাজিত, পুনর্গঠিত বা সংযোজিত।"

(দুই) পূর্বোক্ত চার উপধারার সাথে নিম্নলিখিত অনুবিধি (প্রভাইসো) সংযোজিত হবে।

"প্রকাশ থাকে যে, কোন সদস্য সমিতির কাছে ঋণী থাকলে বা সমিতি প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সদস্যের হাতে জামিন থাকলে যতদিন পর্যন্ত ঋণীর ক্ষেত্রে ধারের টাকা আর জামিনদারের ক্ষেত্রে জামিনের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণ শোধ না হচ্ছে ততদিন অংশগত মূলধন বা আমানতের টাকা তুলে নেওয়ার কোন ইচ্ছা সংসা প্রকাশ করতে পারবে না।"

(৫) (ক) ছয় উপধারার বর্ণিত "সংযোজন বা পুনর্গঠনের জন্য" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "বিভাজন পুনর্গঠন বা সংযোজনের জন্য।"

(দুই) পূর্বোক্ত ছয় উপধারার মধ্যে "সংযোজিত বা পুনর্গঠিত" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে—"বিভাজিত পুনর্গঠিত বা সংযোজিত।"

১। ধারা ২১ঃ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংযোজন ঃ

মূল সমবায় আইনের ২১ ধারার পর উপধারার স্থলে নিম্নলিখিত দশ উপধারা সংযোজিত হবে—"(১০) এক উপধারা মতে যদি রাজ্য সরকারের মনে হয় রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কোন ইউনিটকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, যেমনটি প্রয়োজন হবে, গঠন করা দরকার তাহলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে বিভাজন করে পুনর্গঠন কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার নিবন্ধককে নির্দেশ দেবেন। নিবন্ধক তারপর ২০ ধারা মতে যেমন প্রয়োজন হবে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে বিভাজন করে পৃথক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কে গঠন করবেন।

১০। ধারা—২৭ঃ সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা

(১) এক উপধারার অনুবিধিতে "তিন অপেক্ষা কম বা পাঁচ অপেক্ষা বেশি" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে—"তিন অপেক্ষা কম বা ছয় অপেক্ষা বেশি, যেমনটি সমবায় সমিতির উপবিধিতে উল্লেখ থাকবে।" পূর্বে ১২ জনের কম সদস্যবিশিষ্ট সমিতির পরিচালকদের ঊর্ধ্বতন সংখ্যা ছিল পাঁচ। সংশোধনের মাধ্যমে সেই সংখ্যা উপবিধির বিধান সাপেক্ষে ছয় করা হয়েছে।

(২) পূর্বে তিন উপধারার বলা ছিল—কমপক্ষে দশজন কর্মচারি কাজ করে এমন সমবায় সমিতির বোর্ডে কর্মচারিরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে পারবেন। সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে মাত্র পাঁচজন কর্মচারি কাজ করলেই একজনকে নিজেদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে বোর্ডের পরিচালক পদে পাঠানো যাবে।

(৩) (ক) পাঁচ উপধারার মধ্যে "এলাকা-সমূহে ব্যবসাকারী প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে—"এলাকাসমূহে ব্যবসাকারী প্রাথমিক সমিতি।" অর্থাৎ এখন শুধু কৃষি ঋণদান নয় এলাকার সব প্রাথমিক সমিতিতেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। পূর্বে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তঃ একটি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার ব্যবসাকারী কেবলমাত্র প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির বোর্ডেই পঞ্চায়েত সমিতির একজন সদস্যকে পরিচালক করার বিধান ছিল। সংশোধনের ফলে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তঃ একটি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার ব্যবসাকারী সমস্ত প্রাথমিক সমিতির বোর্ডে পঞ্চায়েত সমিতি তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে।

(খ) "সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী গঠিত জেলা পরিষদ তার অধিকারক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদে তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে।"—সম্পূর্ণ নতুন এই বিধানটি পাঁচ উপধারার পরে যোগ করতে হবে।

(গ) পর্ষদে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি সংক্রান্ত পাঁচ উপধারার পরে নিম্নলিখিত অনুবিধি যোগ করতে হবে—

"তবে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কোন সদস্য যদি সমবায় সমিতির দেওয়া ঋণ পরিশোধে খেলাপ করে তাহলে সেইরূপ সদস্যকে মনোনীত করা যাবে না।"

(৪) পাঁচ উপধারার মধ্যে সংযোজিত অনুবিধির পর নিম্নলিখিত নতুন উপধারাটি যোগ করতে হবে—

"(৫ক) কোন সমবায় সমিতিতে অর্থলগ্নি করেছে এমন অর্থলগ্নি সংস্থা একজন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির পরিচালন পর্ষদে মনোনীত করতে পারে।" মনোনয়নের এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ নতুন।

(৫) ছয় উপধারার পুরোনো বিধানটি সম্পূর্ণ বাতিল করে নিম্নলিখিত বিধান-গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

"(এ) তিন উপধারার উল্লিখিত পরিচালকের (কর্মচারি প্রতিনিধি পর্ষদের বৈঠকে ভোটদানের কোন অধিকার থাকবে না।

(বি) পর্ষদের কর্মকর্তাদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পর্ষদের বৈঠকে বা পর্ষদের পরিচালক পদে কোন ব্যক্তির সহযোজনের ক্ষেত্রে চার উপধারা অনুসারে পর্ষদে পরিচালক হিসাবে আগত সমিতির বেতনভুক মুখ্য কার্যাধ্যক্ষের এবং পাঁচ উপধারা অনুসারে পর্ষদে পরিচালক হিসাবে আগত পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। তবু পূর্বের তুলনায় মুখ্য কার্যাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পর্ষদের সভায় অন্যান্য বিষয়ে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে।

(সি) তিন (কর্মচারি প্রতিনিধি) এবং চার ও পাঁচ উপধারায় উল্লিখিত পরিচালকগণ পর্ষদের কর্মকর্তা হিসাবে কোন পদে থাকতে পারবেন না।

(৬) সাত উপধারার মধ্যে "বা পাঁচ উপধারা"র পরেই "বা পাঁচ-এ উপধারা" যোগ করতে হবে। অর্থাৎ দুই বা পাঁচ উপধারার বদলে পাঁচ-এ উপধারা অনুসারে মনোনয়ন বা তিন উপধারা অনুযায়ী নির্বাচন না হওয়ার দরুন সৃষ্ট অনুপস্থিতির কারণে পর্ষদের কোন কাজ বা কার্যবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে না।

(৭) আট উপধারার মধ্যে "বা পাঁচ উপধারা অনুসারে মনোনীত পরিচালকগণ পদে থাকবেন" স্থলে হবে "বা পাঁচ উপধারা বা পাঁচ-এ উপধারা অনুসারে মনোনীত পরিচালকগণ পদে থাকবেন"। অর্থাৎ সমবায় সমিতির পর্ষদে পঞ্চায়েত প্রতিনিধির কার্যকালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থলগ্নি সংস্থার মনোনীত একজন ব্যক্তির কার্যকাল মনোনয়নের তারিখ থেকে তিন বছর করা হয়েছে। তবে ৩এ উপধারা মতে অর্থলগ্নি সংস্থার ক্ষেত্রে পুনরায় মনোনয়নের কোন বাধা আরোপিত হয় নি।

(৮) আট উপধারার অনুবিধির পর নিম্নলিখিত আর একটি অনুবিধি সংযোজিত হয়েছে—

"প্রকাশ থাকে যে তিন উপধারা অনুসারে নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদের কোন বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন না যদি তিনি নিম্নাবলীতে বর্ণিত কোন অযোগ্যতার কবলে পড়েন।" অপর আইনে কর্মচারি প্রতিনিধির এরূপ কোন অযোগ্যতার বিধান ছিল না।

(৯) (এক) নয় উপধারার মধ্যে "পদাধিকারী (ডেসিগনেটেড অফিসার)" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক (ডাইরেক্টর)" শব্দটি বসবে। আর "অনুরূপ পদাধিকার (সাচ ডেসিগনেটেড অফিসার) শব্দের পরিবর্তে" একজন কর্মকর্তা (আন্ অফিস বেয়ারার" শব্দটি বসবে। এই সংশোধনের মাধ্যমে নতুন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। শুধু গঠনের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি ছিল তাই সংশোধিত হয়েছে।

(দুই) নয় উপধারার অনুবিধির মধ্যে "দুই উপধারা অনুসারে"র পরে "বা ৩-এ উপধারা অনুসারে মনোনীত পরিচালক" প্রভৃতি শব্দগুলি যোগ করতে হবে। অর্থাৎ কর্মকর্তা পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি মেয়াদ বা ৭২ মাসের অধিক সময়কালীন অযোগ্যতা সংক্রান্ত নয় উপধারার বিধানটি দুই উপধারার সরকার মনোনীত পরিচালক ও পাঁচ-এ উপধারার অর্থলগ্নি সংস্থার মনোনীত পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(তিন) নয় উপধারার শেষে প্রদত্ত পুরানো ব্যাখ্যাটির পরিবর্তে নিম্নলিখিত নতুন ব্যাখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হবে—

'ব্যাখ্যা : কর্মকর্তা (অফিস বেয়ারার) বলতে বোঝাবে কোন সমবায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহকারি সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ।" ইতিপূর্বে সমবায় আইনের মধ্যে "কর্মকর্তা"র কোন ব্যাখ্যা ছিল না। সেদিক থেকে নতুন এই ব্যাখ্যাটির প্রয়োজন ছিল।

(১০) দশ উপধারার (বি) প্রকরণে (৯ক) বর্ণিত "দুশ্চরিত্রজনিত অপরাধে" পরে "বা এই আইন মোতাবেক সংঘটিত অপরাধে" শব্দগুলি যোগ করতে হবে। এই সংশোধন মারফৎ পরিচালক পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমবায় আইন ভঙ্গ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(১১) বারো উপধারার প্রথম অনুবিধিটি (প্রভাইজো) বাতিল হয়ে গেছে। এই অনুবিধিতে জেলা সমবায় ইউনিয়ন বা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকদের সর্বোচ্চ সাতটি সমিতির পরিচালক থাকার সুবিধা দেওয়া ছিল। আর কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতির পরিচালকগণই শুধু রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বা জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালক নির্বাচিত হতে পারবেন বলে উল্লেখ ছিল। সংশোধনের দ্বারা পূর্বের সুযোগ ও শর্ত উঠাই প্রত্যাহৃত হয়েছে।

১১। ধারা-২৮ সমবায় সমিতির কাজ কর্মের ব্যবস্থাপনায় সরকারি আধিকারিকদের প্রতিনিধি—

(১) সমবায় আইনে ২৮ ধারার ৩এ উপধারা অনুসারে সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে রাজ্য সরকার কর্তৃক একজন সরকারি আধিকারিকের নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বলীতে বর্ণিত "শর্তে" পরে "পর্ষদে" শব্দটি যোগ করতে হবে।

(২) ২৮ ধারার অনুবিধিতে সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার সমবায় প্রথা সংস্থার শর্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নাবলীতে বর্ণিত শর্তে ও পর্ষদে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে নিয়োগ করবেন। "নিম্নাবলীতে বর্ণিত শর্তে ও পর্ষদে" শব্দগুলি সংযোজিত হয়েছে।

(৩) ২৮ ধারার দুই উপধারার মধ্যে নিবন্ধক কর্তৃক সরকারি আধিকারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নাবলীতে বর্ণিত "শর্তে" পরে "পর্ষদে" শব্দটি যোগ করতে হবে। এই উপধারার মধ্যে "নিবন্ধক

কর্তৃক প্রেরিত" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "অনুরূপভাবে প্রেরিত"।

১২। **ধারা-২১ : পর্ষদ বাতিল ও পুনর্গঠন**

২১ ধারার তিন উপধারার মধ্যে মূল আইনে উল্লিখিত "কমিটি" স্থলে "পর্ষদ" (বোর্ড) হবে।

১৩। **ধারা-৩০ : পর্ষদ বাতিল ও প্রশাসক নিয়োগ**

(১) ৩০ ধারার দুই উপধারার প্রথম অনুবিধির শেষে "ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"-এর পরে "বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, যেমন প্রাসঙ্গিক হবে"—শব্দগুলি যোগ করতে হবে।

(২) উপরোক্ত অনুবিধির পর নিম্নলিখিত নতুন অনুবিধি যোগ করতে হবে—"প্রকাশ থাকে যে এক বা দুই উপধারা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা প্রশাসকগণ পর্ষদ বাতিলের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে পর্ষদ পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হবে। তারপর প্রশাসক বা প্রশাসকদের অপসারণের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিবন্ধক সমবায় আইনের ২৫ ধারার এক উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে পর্ষদ পুনর্গঠন করে দেবেন। ২৫ ধারা অনুসারে নির্বাচিত পর্ষদ দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এইভাবে পুনর্গঠিত পর্ষদ কাজ চালিয়ে যাবে।"

(৩) (ক) তিন উপধারায় বলা ছিল, নিবন্ধক কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে সমিতিকে নোটিস দেওয়ার পর রাজ্য সরকারের এমন একজন অফিসারকে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পাঠাবেন "তিনি যার নিয়োগকর্তা"। বর্তমান সংশোধনীতে "তিনি যার নিয়োগকর্তা" শব্দগুলি বাতিল হয়েছে।

(খ) তিন উপধারায় সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসারের কার্যকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যতদিন পর্যন্ত "এক উপধারা মোতাবেক নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিস প্রত্যাহৃত না হচ্ছে বা" এক বা একাধিক প্রশাসক নিযুক্ত না হচ্ছেন। বর্তমান সংশোধনীর দ্বারায় "এক উপধারা মোতাবেক নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিস প্রত্যাহৃত না হচ্ছে বা" শব্দগুলি লোপ করা হয়েছে।

(গ) তিন উপধারার মধ্যে উপরোক্ত সংযোজিত শব্দগুলির পরে আরো যোগ করতে হবে "যেমনটি প্রযোজ্য হবে" অর্থাৎ নোটিস প্রত্যাহৃত হতে পারে অথবা প্রশাসক নিয়োগ হতে পারে যেমনটি প্রযোজ্য হবে সেই সময়কাল পর্যন্তই নিবন্ধক কর্তৃক প্রেরিত সরকারি অফিসার সংশ্লিষ্ট সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করবেন।

১৪। **ধারা ৩১ : কতকগুলি ক্ষেত্রে পর্ষদ বাতিল ও প্রাধিকারিক নিয়োগ**

৩১ ধারার (সি) প্রকরণের অনুবিধির পরে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় অনুবিধিটি যোগ করতে হবে :

"প্রারও প্রকাশ থাকে যে, পর্ষদ বাতিলের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে পর্ষদ পুনর্গঠনে যদি প্রাধিকারিক ব্যর্থ হন তাহলে নিবন্ধক তাকে পদ থেকে অপসারিত করবেন। তারপর নিবন্ধক সমবায় আইনের ২৫ ধারার এক উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে পর্ষদ পুনর্গঠন করে দেবেন। ২৫ ধারা অনুসারে নির্বাচিত পর্ষদ দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এইভাবে পুনর্গঠিত পর্ষদ কাজ চালিয়ে যাবে।

১৫। **ধারা ৩৩ : সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ**

(১) এক উপধারার "সভাপতির" পরে এবং "একজন সম্পাদক" যোগ করতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের দ্বারায় সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সম্পাদককেও নিয়োগ করবেন। আগে শুধু সভাপতি নিয়োগের কথা বলা ছিল।

(২) দুই উপধারার পরে (২এ) সংখ্যক নিম্নলিখিত নতুন আর একটি উপধারা যোগ করতে হবে।—"রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের সমবায় সমিতিসমূহের সহকারি নিবন্ধক হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন আধিকারিকের নিম্নপদমর্যাদাসম্পন্ন নন এমন একজন আধিকারিক সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সম্পাদক হবেন।"

১৬। **ধারা ৩৮ : সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার**

(১) (এক) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বা কর্মরত বিচারক অথবা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন বা কর্মরত সচিবের নিম্ন পদমর্যাদা-সম্পন্ন নন এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়োগের কথা মূল আইনে বলা ছিল। কিন্তু কোন্ পদে নিয়োগ করা হবে তা বলা হয় নাই। এক উপধারার সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে "সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সভাপতি হিসাবে" নিয়োগ করা হবে।

(দুই) এক উপধারার পরে সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সম্পাদকের নিয়োগ সংক্রান্ত (১এ) সংখ্যক নিম্নলিখিত নতুন একটি উপধারা যোগ করা হয়েছে—(১এ) সমবায় সমিতিসমূহের অতিরিক্ত নিবন্ধকের নিম্নপদমর্যাদাসম্পন্ন নন রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের এমন একজন আধিকারিককে রাজ্য সরকার সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করবেন।

(২) পাঁচ উপধারার মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতি ও সম্পাদকের উল্লিখিত "মূল মাসিক বেতন" সংক্রান্ত শব্দগুলির পরিবর্তে নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিষয়গুলি স্থির করার কথা সংশোধনীতে বলা হয়েছে।

(৩) সাত উপধারার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে—

(এক) ইংরাজী শব্দের "দি"-র পরিবর্তে 'এ' বসিয়ে অনুবিধিতে নির্দিষ্ট রাজ্য পর্যায়ের সমিতির পরিবর্তে সাধারণভাবে সমস্ত রাজ্য পর্যায়ের সমিতির কথা বলা হয়েছে।

(দুই) অনুবিধির (বি) প্রকরণে বলা

হয়েছে, রাজ্য পর্যায়ের সমবায় সমিতির কর্মীদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচক কমিটির মধ্যে "যে সমিতির জন্য কর্মচারি নির্বাচন করা হবে" তারই প্রতিনিধি থাকবে। মূল আইনে সাধারণভাবে রাজ্য পর্যায়ের সমবায় সমিতির কথাই বলা ছিল। এমন নির্দিষ্ট করে বলা ছিল না।

(তিন) সি প্রকল্পের সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে সমিতির জন্য কর্মচারি নির্বাচন করা হবে রাজ্য পর্যায়ের সেই নির্দিষ্ট (মেড) সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন ব্যক্তিকেই নিবন্ধক রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের কর্মচারিদের মধ্যে থেকে নির্বাচক কমিটিতে নিয়োগ করবেন। শুধু "নির্দিষ্ট (মেড)" শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।

১৭। ধারা ৪১ : রাজ্য ও আঞ্চলিক সমবায় ইউনিয়নে সদস্যপদ

মূল আইনের এক উপধারার পরিবর্তে নীচের উপধারাটি পরিবর্ত হিসাবে ধারণত হবে :

"(১) নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সদস্যপদ ফি, পর্যায়ক্রমিক ফি চাঁদা বা অংশগত মূলধনে অংশ রূপ বাবদ অর্থ যেমনটি প্রয়োজন হবে, সেইরূপ দেওয়ার পর প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বা জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতিতে সদস্যভুক্ত হতে হবে এবং প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে তারা সদস্যভুক্ত (ফেডারেল) সমবায় সমিতিসমূহের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।"

আগের এক নং উপধারায় কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতি সম্পর্কে এবং সদস্যভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কিছু বলা ছিল না।

১৮। ধারা-৪৭ : কর্মধারণের উপর বিধি-নিষেধ

(১) এক উপধারায় বলা ছিল সমবায় সমিতি কেবল তার সদস্যদেরই ঋণ দেবে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে নামিক (নমিনাল) সদস্যরা সদস্য হলেও তাদের ঋণ দেওয়া যাবে না।

(২) এক উপধারার অনুবিধির নীচে নতুন দুটি অনুবিধি যুক্ত হয়েছে। সংশোধনী সহ এক উপধারার মোট অনুবিধির সংখ্যা দাঁড়ালো তিন। তার মধ্যে দ্বিতীয় অনুবিধিতে বলা হয়েছে—

"আরও প্রকাশ থাকে যে একটি সমবায় সমিতি তার সদস্য বহির্ভূত আমানতকারী থেকে আমানতের জামিনে (সিকিউরিটি) অগ্রিম দিতে পারে।"

(৩) তৃতীয় অনুবিধিতে বলা হয়েছে—

"আরও প্রকাশ থাকে যে, একটি সমবায় সমিতি নামিক সদস্যকে যে-কোন সুরক্ষিত জামিনে (টাঙ্গিবল সিকিউরিটি) অগ্রিম মঞ্জুর করতে পারে।"

১৯। ধারা-৫২ : কতকগুলি সমবায় সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণকারি সদস্যদের ঋণের সম্পত্তির উপর প্রভার :

কোন সদস্য ঋণ বাবদ পাওনার একটি অংশ পরিশোধ করে সুরক্ষিত প্রভার (চার্জ) থেকে জমি মুক্ত করতে চাইলে সমিতি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ইউনিটের অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। মূল আইনে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পর "বা" ছিল না, "এবং" জাতীয় যে সংশয় ছিল তা সংশোধনীর মাধ্যমে "বা" বসানোর ফলে দূর করা হয়েছে।

২০। ধারা-৫৩ : সোহান অথরা ঋণ

দুই উপধারায় বলা ছিল, ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, সোহান নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে সোহান নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না।

২১। ধারা-৫৪। সদস্য ও অধিমারদের কাছ থেকে সমিতির পাওনা টাকা আদায় :

দুই উপধারার বিধান অনুসারে দুই মোতাবেক সমিতির অবেদনের ভিত্তিতে ঋণী কর্মচারির বেতন থেকে নিয়োগকর্তা সমিতির পাওনা বাবদ টাকা কেটে নেবে। কেটে রাখা টাকা কতদিনের মধ্যে সমিতির কাছে পাঠাবে তা মূল আইনে বলা ছিল না। সংশোধনীতে বলা হয়েছে টাকা বেতন থেকে কাটার তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে সমিতির কাছে পাঠাবে।

২২। ধারা-৬১। সমবায় সমিতির সদস্য-পদের যোগ্যতা।

১৯৮১ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর সংশোধনের মাধ্যমে ৬১ ধারার দুই উপধারার পরে নতুন দুটি অর্থাৎ তিন ও চার উপধারা যোগ করা হয়েছিল।

সংশোধনীর দ্বারা চার উপধারার নিম্নলিখিত নতুন উপধারা ও অনুবিধি সংযুক্ত হয়েছে :

"(৫) এক উপধারায় যা-ই বলা থাকুক না কেন কোন কেন্দ্রীয় সমিতি তিন উপধারা মতে নামিক (নমিনাল) সদস্য ব্যতিরেকে কোন এমন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। ধারা ইতিপূর্বে এমন সদস্য হিসাবে গৃহীত হয়েছেন তাঁরা এই আইনের প্রয়োজনে নামিক সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

তবে কেন্দ্রীয় সমিতির কর্তমান নামিক সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট সমিতিকে প্রথম তিন মাসের নোটিসের ভিত্তিতে তাঁদের দেওয়া অংশগত মূলধন সমিতির কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। অনুরূপ প্রত্যাহার মঞ্জুরের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অংশগত মূলধনের টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে ঋণ বাবদ সমিতির কিছু পাওনা থাকলে তা পাওনা অংশগত মূলধন থেকে সমিতি কেটে রাখবে।"

২৩। ধারা-৭৭ : অংশগত মূলধন ও সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট সমবায় সমিতি

সদস্যদের স্বার্থের উপর বিধি-নিষেধ।

ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে (এ) প্রকল্পে বলা ছিল নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমার উর্দ্ধে কেউ শেয়ার কিনতে পারবে না। আরও বলা ছিল নিয়মাবলীতে এই সীমা অবশ্যই মূলধনের সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশে অতিক্রম করবে না। অবশেষে মূলধনের প্রকৃতি সম্পর্কে মূল আইনে কিছু বলা ছিল না। নতুন সংশোধনীতে অবশেষে মূলধনের আগে "আদায়ীকৃত" শব্দ বসানোর ফলে এ বিষয়ে যে বিতর্ক ও সংশয়ের অবকাশ ছিল তা দূর হয়েছে। এখন থেকে সমিতির মোট আদায়ীকৃত অবশেষে মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের বেশি কোন সংস্থা (রাজ্য সরকার বা অন্য কোন সমবায় সমিতি বাদ দিয়ে) সংশ্লিষ্ট সমিতির শেয়ার কিনতে পারবেন না।

২৩। ধারা-৪৩ : মৃত সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের নিষ্পত্তি :

সমবায় সমিতিতে মৃত সদস্যের যে শেয়ার বা স্বার্থ আছে তার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এক উপধারার কেন্দ্রীয় সমিতি ছাড়া অন্যান্য সমবায় সমিতির মৃত সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে "কেন্দ্রীয় সমিতি ছাড়া অন্যান্য" শব্দগুলি বসানো হয়েছে।

২৫। ধারা-৪১ : বাতিলকৃত, পদত্যাগী বা বিকৃত মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের নিষ্পত্তি :

প্রকল্প বাদ দিয়ে এই ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে "সমবায় সমিতির কোন সদস্য নিয়মাবলী বা সমবায় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী যখন বিতাড়িত হন বা পদত্যাগ করেন বা বিকৃত মস্তিষ্ক হন তখন সমবায় সমিতির মূলধনে তাঁর শেয়ার বা স্বার্থ ৭৮ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তর গ্রহণে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নামে হস্তান্তরিত হবে। অন্যরূপভাবে প্রাপ্ত শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য সদস্যকে বা মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন অনুসারে সম্পত্তি দেখাশুনোর জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। সদস্যের বিতাড়ন বা পদত্যাগ বা সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য ব্যক্তির নিয়োগ নিয়োগপ্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য দেওয়া হবে। 'পুরানো' উপধারার 'নগদ অর্থে' "শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে আর ১৯১২ সালের ভারতীয় মস্তিষ্ক বিকৃতি আইনের" পরিবর্তে '১৯৮৭ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন' সংশোধনীতে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য বক্তব্য বিষয়ের দিক থেকে সমবায় আইনের মূল ৪১ ধারার সাথে সংশোধিত ৪১ ধারার কোন তফাৎ নেই।

২৬। ধারা-৪৭-৪৮ ও ৪৯ (১)।

আবাসন সমবায় সংক্রান্ত সমবায় আইনের নবম অধ্যায়ের ৪৭, ৪৮ ও ৪৯(১) ধারার মধ্যে স্থিত "বহুতলবিশিষ্ট (মাল্টি-স্টোরিড)" শব্দটি ৪৭ ধারার চার জায়গা, ৪৮ ধারার দু' জায়গা ও ৪৯(১) উপধারার এক জায়গা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। "বাড়ি"র আগে থেকে "বহুতল-বিশিষ্ট" শব্দ তুলে দিয়ে আবাসন সমবায় সমিতির আওতায় নির্মিত বাড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োগগত ব্যাপকতা প্রদান করেছিল ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর সংশোধনীর মাধ্যমে। তখন ৮৩ ধারায় উল্লিখিত "বহুতলবিশিষ্ট" শব্দটি সাতটি স্থান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

২৭। ধারা-৯০ : সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষা :

(১) এক উপধারা অনুসারে নিরীক্ষা অধিকর্তা নিরীক্ষকদের যে তালিকা প্রস্তুত করবেন সেই সম্পর্কে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই তালিকার অন্যান্যদের মধ্যে থাকবেন ১৯৪৯ সালের কস্ট এন্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ আইন অনুসারে গঠিত ইন্সটিটিউট অফ্ কস্ট এন্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অফ্ ইন্ডিয়ার সদস্যগণ (এই ধারায় অতঃপর ইন্সটিটিউট বলা হবে)।

(২) এক উপধারার পরে নিম্নলিখিত দুটি উপধারা যোগ করতে হবে।

"(১এ) জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় কোন বিশেষ সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ব্যবসায়িক নীতি বা প্রয়োজনে বাণিজ্যিক প্রয়োগ বিধি নিশ্চিত করার জন্য কস্ট অডিট বা পারফরমান্স অডিট বা দুই-ই করা দরকার তাহলে সমবায় বছর শেষ হওয়ার অন্যূন একমাস আগে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে নির্দেশে উল্লিখিতভাবে অডিট করার আদেশ রাজ্য সরকার দেবেন।

(১বি) উপধারা (১এ) অনুসারে কোন নির্দেশ দেওয়া হলে নিরীক্ষা অধিকর্তা এক উপধারায় বর্ণিত নিরীক্ষকদের তালিকা থেকে দুই উপধারার (এ) প্রকল্প অনুসারে ইন্সটিটিউটের এক বা একাধিক সদস্যকে কোন সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমিতিসমূহের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক বা একাধিক নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক বা নিরীক্ষকগণ দুই উপধারার বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিরীক্ষা কাজ শেষ করবেন এবং ১১ ধারার এক উপধারা অনুসারে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবেন।"

২৮। ধারা-১১ : সমবায় সমিতির কারবার গোটানো :

(১) দুই উপধারার (এ) প্রকল্পে নিবন্ধককে ক্ষমতা দিয়ে বলা ছিল নিবন্ধের তারিখ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে কাজ শুরু না করলে বা বিগত ১৮ মাসের মধ্যে সমিতি কোন কাজ না করলে তিনি সেই সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ দিতে পারবেন। (এ) প্রকল্পের পর নিম্নলিখিত অনুবিধি সংযুক্ত করে কতকগুলি সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধকের এই ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

"প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক

বা কেন্দ্রীয় সমবায় কৃষি ঋণদান ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জাতীয় ব্যাঙ্ক, বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, পরিষ্কার পরামর্শ না করে এক বা দুই উপধারা অনুসারে নিবন্ধক কোন নির্দেশ দেবেন না।"

(২) তিন উপধারা মতে নিবন্ধন বাতিল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এক ও দুই উপধারা মতে প্রদত্ত নির্দেশ জারির পরে অবসায়কের প্রতিবেদন পাঠ করে নিবন্ধক কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করতে পারেন। সংশোধনীর মাধ্যমে "নির্দেশ বলে বাতিল করবেন" (by order cancel) শব্দগুলির "এবং নির্দেশ বলে বাতিল করতে পারেন (may by order cancel)" শব্দগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ফলে নিবন্ধন বাতিলের বিষয়টি কিছুটা নিবন্ধকের ইচ্ছাধীন এসেছে।

২১। ধারা-১১২। আদালতের হস্তক্ষেপ নাকচকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় ও দখল হস্তান্তরের ক্ষমতা।

১১২ ধারার মধ্যে কোন উপধারা না থাকার বর্ণনাসহ "(১)" সংখ্যাটি সঙ্গত কারণেই সংশোধনী দ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

৩০। ধারা—১২৭। শর্তমূলক ক্রোক নির্দেশের ক্ষমতা।

নিবন্ধক কর্তৃক শর্তমূলক ক্রোক নির্দেশের ক্ষমতা প্রসঙ্গে এক উপধারার যে উল্লেখ আছে তা সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। কারণ ১২৭ ধারার কোন উপধারা নেই। কাজেই "এক উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশে" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "উক্ত নির্দেশে।"

৩১। ধারা-১২৯। প্রত্যয় ও অধিকার:

এক উপধারার "যে-কোন সময় (এ্যানি টাইম)" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "যে কোন সময়ে (এ্যাট এ্যানি টাইম)।" এটুকু সংশোধনের দ্বারা এই উপধারায় কোন নতুন পরিবর্তন আনা হয় নি।

৩২। ধারা-১৩০: কতকগুলি আইন-বিরুদ্ধ কাজের জরিমানা।

(১) (বি) প্রকরণে বলা ছিল কোন সমিতির আধিকারিক হিসাবে বহাল থাকার পক্ষে অযোগ্যতা অর্জন করেও আধিকারিক (অফিসার) হিসাবে থাকলে তিনি আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। সংশোধনের দ্বারা "আধিকারিকের" (অফিসার) পরে বা কর্মকর্তা (অফিস-বেয়ারার) বসানোর ফলে কর্মকর্তাদেরও সরাসরি আইন বিরুদ্ধ কাজের জন্য জরিমানার আওতায় আনা হয়েছে।

(২) (এক) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত নতুন প্রকরণটি যুক্ত হয়েছে—"(জি) ৪৫ ধারার (১) উপধারা বিধান লঙ্ঘন করে জমির স্বত্ব বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেছেন।"

(৩) ১৩০ ধারার শেষে বলা আছে আইন বিরুদ্ধ প্রতিটি কাজের শাস্তিস্বরূপ আর্থিক জরিমানা প্রদানের বিষয়ে সাধারণ নির্দেশ নিয়মাবলী অনুসারে নিবন্ধক দেবেন। অবশ্য তার আগে সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে তিনি বক্তব্য বলার সুযোগ দেবেন। আর্থিক শাস্তি সম্পর্কে সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তাদি আরোপিত হয়েছে "এবং সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি যদি পর্ষদের পরিচালক হন তাহলে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছর পর্যন্ত পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন না।"

৩৩। ধারা-১৩৩: ন্যায়পীঠ।

এক উপধারার (এ) প্রকরণে বলা আছে একজন বা তিন নিয়ে ন্যায়পীঠ গঠিত হবে তা নিয়মাবলীতে বলা থাকবে। প্রকরণের মধ্যে সংশোধন করে "সভাপতি সহ" শব্দগুলি যোগ করা হয়েছে। মূল আইনের এক উপধারার (এ) প্রকরণে ন্যায়পীঠের সভাপতি নিয়োগ সম্পর্কে আগে কিছু বলা ছিল না।

৩৪। প্রথম তফসিল-নিবন্ধকের অনন্যভাবে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা।

এই তফসিলের মধ্যে উল্লিখিত "সমবায় সমিতি" শব্দগুলির পরিবর্তে হবে "সমবায়ের এক উপধারা দ্রষ্টব্য"। পূর্বে দশ ধারার মধ্যে কেবলমাত্র নিবন্ধকের ক্ষমতা ও কর্তব্য বর্ণন সম্পর্কেই বলা ছিল। ১৯৮১ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর সংশোধনের দ্বারা দশ ধারার এক উপধারায় নিবন্ধকের আর দুই উপধারায় নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই এই সংশোধন।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিল—পাওনা টাকা আদায়:

(১) দ্বিতীয় তফসিলের প্রথম ঢালির সংখ্যার নিরীক্ষা ফি আদায়ের ক্ষমতা সম্পর্কে তৃতীয়স্তম্ভে উল্লিখিত "নিবন্ধকের" পরিবর্তে হবে "নিরীক্ষা অধিকর্তার"। কারণ ১৯৮৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিবন্ধকের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তব্য নিরীক্ষা অধিকর্তার ওপর অর্পিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে সমবায় আইনের যথাসঙ্গত সংশোধন ও কার্যকর হয়েছে। দ্বিতীয় তফসিলের আবশ্যিক সংশোধনটি এমন হ'ল।

(২) দ্বিতীয় তফসিলের পঞ্চম ঢালির সংখ্যার প্রথমস্তম্ভে অবসায়ক কর্তৃক বার্ষ অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সংশোধনের মাধ্যমে "১১ ধারার" পরিবর্তে "১০১ ধারার চার উপধারার (এইচ) প্রকরণ" বসানো হয়েছে। কারণ ১১ ধারার সাধারণভাবে সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর কথা বলা হয়েছে। আর ১০১ ধারার চার উপধারার (এইচ) প্রকরণেই অবসায়ক কর্তৃক বার্ষ দেয় সম্পর্কে বলা আছে। সংশোধনের দ্বারা মূল আইনে যে ত্রুটি ছিল তা দূর করা হয়েছে।

০৮। তৃতীয় তফসিল : উত্তরাধিকার (আপীল) :

(১) সমবায় সমিতির বিভাজন, পরিসম্পদ ও দায়িত্বের হস্তান্তর এবং সমবায় সমিতিসমূহের সংযোজন বা পুনর্গঠন সম্পর্কিত নিবন্ধকের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল প্রসঙ্গে তৃতীয় তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমিক সংখ্যার দ্বিতীয়স্তম্ভের উত্তরস্থানে "চূড়ান্ত নির্দেশ" শব্দ দুটির পরিবর্তে হবে শুধু "নির্দেশ"। ১৯৭৩ সালের আইনে চূড়ান্ত নির্দেশের প্রাসঙ্গিকতা ছিল। ১৯৮৩ সালের আইনের ১১ ও ২০ ধারায় কোথাও "চূড়ান্ত" শব্দটির প্রয়োগ না থাকায় তৃতীয় তফসিল থেকে সাম্প্রতিক সংশোধনে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

(২) সমবায় নিয়মাবলীর ১৪২ নিয়মে বলা আছে নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন ও আবাসন সমবায় সমিতির লিখিত অনুমতি নিয়ে প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাট বিক্রি করার অধিকার সদস্যের আছে। সমিতি অনুমতি না দিলে ৪৩(১) ধারা ও ১৩৫(৩)(বি) নিয়ম অনুসারে নিবন্ধকের কাছে আপীল করা যাবে। আপীলের নির্দেশে প্রার্থিত অনুমোদন না পেলে তৃতীয় তফসিলের নবম ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে নিবন্ধকের নির্দেশের বিরুদ্ধেও সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে আপীল করা যাবে। আপীলের সময়সীমা সম্পর্কে তৃতীয় তফসিলের নবম ক্রমিক সংখ্যার পঞ্চমস্তম্ভে বলা আছে নিবন্ধকের নির্দেশের তারিখ বা যেদিন আপীল প্রার্থী উপরোক্ত নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন, এই দুই তারিখের মধ্যে যেটি আগে আসবে, সেই তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সমবায় ন্যায়পীঠে আপীল করতে পারবে। এক্ষেত্রে "যে তারিখ আগে আসবে" শব্দগুলি বাদ যাবে। কারণ এক্ষেত্রে শব্দগুলির বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই।

(৩) নিয়মাবলীর ১৪২ নিয়মে বলা আছে নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন ও আবাসন সমবায় সমিতির লিখিত অনুমতি নিয়ে কোন সদস্য জমির প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে পারে। ৮১ ধারার দুই উপধারায় বলা আছে সমিতির অনুমতি না পেলে সংশ্লিষ্ট সদস্য নিবন্ধকের কাছে আপীল করতে পারবে। অথচ মূল আইনের তৃতীয় তফসিলের দশম ক্রমিক সংখ্যার চতুর্থস্তম্ভে এতদিন ভুলক্রমে বলা ছিল সংশ্লিষ্ট আপীল ন্যায়পীঠের কাছে করতে হবে। বর্তমানে সংশোধনীর মাধ্যমে "ন্যায়পীঠের" পরিবর্তে হিসাবে "নিবন্ধকের" পড়তে হবে।

ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

ফোন নং
২২৫৭, ২১৫৭

নদীয়া কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া
শাখা অফিস : রাণাঘাট, বেথুয়াডহরি, তেহট্ট, করিমপুর, কৃষ্ণনগর।

কৃষি ও কৃষিজাত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নদীয়া জেলার কৃষকভাইদের দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণ দানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান জেলার কৃষি নির্ভরশীল পরিবারগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ঋণ নিন, ঋণ কাজে লাগান
ঋণ সময়মত পরিশোধ করুন

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

Regd Head Office G. T. ROAD, BURDWAN
WEST BENGAL ● PIN-713 101

Becoming the biggest District
Central Co operative Bank in
the Eastern Region of India

The Bank at a glance (Rupees in Lac)

OWNED FUND	714.00
WORKING CAPITAL	12000.00
DEPOSIT	7500.00
LOANS & ADVANCES	7000.00
NO. OF BRANCHES	34

A Bank by the People and for the People of Burdwan
District since 1917 in Service to the Nation

74 Year service to the Nation
•• in the field of Co-operation

YOUR DEPOSIT WITH US IS FULLY SAFE LIKE THAT
OF NATIONALISED BANKS COVERED UNDER
DEPOSIT INSURANCE SCHEME.

... ...
WE PAY INTEREST ½% HIGHER AT EVERY STAGE
OF DEPOSITS THAN THAT OF OTHER BANKS

● একমাত্র সমবায় প্রেরণাই আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জনকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশে বিশ্বাস যে, অতিদুর্গত বাংলা দেশে সমবায় প্রেরণা কেমন করে কাজ করতে পারে তার দেখাবার সম্ভাবনা এখন হয়ে আছে। গ্রামে গ্রামে গ্রামে যুক্তিই বিশ্বাস সঞ্চিত আছে, তাকে বের করতে, জাগ্রত করতে চেষ্টা করা উৎপাদন ও অন্যের কাজে সে লাগাবে না।.....

সমবায় প্রেরণাতে আর নিজে নয়, সেবায় কর্মে করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে একত্র প্রবল করে তুলতে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব। ●

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এন্ড্রুজ

আমাদের ঠাকুরের কাপড়

১৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৬৯

সঞ্চয়ী

মহাশ্বেতা দেবী

অনেকদিন অবধি মণিকাকা ছিলেন বাইভূলে এবং সকলের কাছে সন্ত্রাস বিশেষ। কেননা অত্যন্ত মন দিয়ে চাকরি করতেন। ছুটি জমাতেন। ওভারটাইম খাটতেন। বাড়ি যেবার সময়ে শেয়ালদা থেকে বাজার করে ফিরতেন বারাকপুরে। এটা ওঁর সুসময়। সুসময়ে কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতেন না।

মণি কাকীমা ছিলেন নেটোপেটা গেরস্ত মানুষ। সংসার, স্বামী, দুই মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত।

সুসময়ে ওঁদের দেখা যেত না।

কিন্তু নিয়ম বেঁধে, বছর ২/৩ বাদে মণিকাকা আর বাড়ি ফিরতেন না। উধাও হয়ে যেতেন ৩/৪ মাস। মণি কাকীমা মেয়েদের নিয়ে কেঁদেকেটে এসে পড়তেন। খোঁজ করো, খোঁজ করো, জলজ্যান্ত মানুষটা গেলেন কোথায়?

মণিকাকা কিন্তু যেখানে সেখানে ঘুরতেন না। আমরা "মণিকাকা" বলতাম, আসলে উনি আমাদের কেউই নন। সে সময়ে ভারত স্বাধীন নয়। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত ও বর্মার রেঙ্গুন থেকে সেলোয়ার, দিল্লী থেকে কন্যাকুমারিকা ওঁদের নাকি আত্মীয় ছিল সর্বত্র। অবশ্য এটাও সত্যি, যে তখন দিদির শ্বশুরকুল, মামীর পিতৃকুল, মাসতুত পিসতুত ভাই-বোনের বাপের বাড়ির জ্ঞাতিগুষ্টি, সকলকেই "আত্মীয়" মনে করা হত।

মণিকাকা চিঠি লিখতেন ফৈজাবাদ থেকে, "সুরেশের বড় মামার বাড়ি আসিয়াছি, চিন্তা করিবা না।"

মণি কাকীমা ফৈজাবাদে চিঠি লিখতে লিখতে আরেকটা চিঠি আসত, "জব্বলপুরে লাবণ্য মাসীমার কাছে না আসিলে নর্মদার অপূর্ব শোভা দেখিতে পাইতাম না।"

পরবর্তী চিঠি আসত বাঙ্গালোর, বা বেজওয়াড়া, বা গয়া থেকে।

মণি কাকীমার কান্নাকাটি শুনলে মনে হত, মণিকাকা ওঁদের জলে ভাসিয়ে গেছেন।

—টাকা-পয়সা রেখে যায় নি কিছু?

—মাইনের টাকা থেকে কি মাসে পঞ্চাশ টাকা আমার নামে ডাকঘরে খাতায় জেমত। টাকা..... চলে যাবে কতদিন। হিসেবী মানুষের কি যে অসুখ।

আবগারী আফিসে কাজ। মাইনে ছিল। উপরি ছিল।

—তোমার বাপ ভাই আসছে না?

মণি কাকীমার বাবাও বারাকপুরেই থাকতেন।

—তারা তো বাজার এসে থাকতে পারে না। খোঁজখবর নেয়। কিন্তু কোথায় গেলে পড়ে থাকবে, খবরটা পায় না।

ওঁর বাবা বলতেন, উচিত হচ্ছে বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে থাক।

মণি কাকীমা মণিকাকার ছক নিয়ে জ্যোতিষীর কাছে যেতেন। সেখানে হত্যে দিতেন।

আর মণিকাকা হঠাৎ ফিরে আসতেন সহাস্যবদনে। কিছুমাত্র অনুতপ্ত নন। কেন এমন হঠাৎ উধাও হন, তার কোনো উত্তর নেই।

আপিসে কি করে চাকরি থাকত, তা কেউ জানে না।

মেয়েরা যখন বড় হল, তখন তো ঘোল আর খাটানো অনেক ঝক্কর। মণি কাকীমা বললেন, এবার বিয়ে দিয়ে হবে নিশ্চিন্দ হবে। তার আগে বেরিয়েছে, কি আমি ঘাঁটি দিয়ে ওদের গলা কাটব, নিজে আত্মহত্যা করব, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। ছি ছি ছি! মেয়েদের ওপরেও টান নেই একটু?

—বিয়ে কি শুধু দিতে হবে?

—সে আমি জানি? আবগারীতে কাজ করো! কি পাও তাতো কিছু জানি না।

আমার সবার বুদ্ধিশুদ্ধি আবগারীর দারোগা। সে ঘাড়ি করেছে, তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে ঘটা করে, ছেলেদের মানুষ করেছে, বউকে না হোক, পঞ্চাশ ভরি সোনা দিচ্ছে, তুমি কি করেছ?

—আমি কি তার মত বড় চাকরি করি?

—অরো না যখন, তখন নিজের ভবিষ্যতের জন্যে বছরে চারশো টাকা ওড়াও কেন? চাকরি! ওই বদখেয়ালীর জন্যেই উন্নতি হয় না। আমি সব শুনেছি।

মণিকাকা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যেন মেয়েদের বিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, বিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি যাও। তখন আর আমারও কোনো দায় থাকবে না, তোমার বাড়ি আসলে থাকবার।

—তার মানে?

—মানে বুঝবে না?

—তুমি...তুমি যাবে কোথায়?

—যেখা ইচ্ছে যাব। তুমি যেতে পার, আমি পারি না?

—না না, আমি আর যাব না তোমাকে।

সহর থানেক মণিকাকাদের ঘরে নেই। শুনলাম, খুব সংসারী হয়েছেন, ভদ্রলোক। সত্যিই মানুষ এখন!

আর মেয়েদের বিয়েও দিলেন।

মণি কাকীমার বড়াই নাকি সংসার জুটিয়ে দেন। একদিনে দুই মেয়ের বিয়ে হয়। সে বিয়েতে মণিকাকা দুই বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। তখনকার দিনকাল বলে অবশ্যকার্য, কাপড়-চোপড়, বাক্সা-পাঁওরা বরাবর হাতেই ধরেছিলেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে পাঁচ হাজার টাকা অনেক টাকা।

—এত টাকা এল কোত্থেকে?

মণিকাকা বললেন, মন দিলে না পারি কি?

—তা হলে এত টাকা?

তখন জানা গেল, মণিকাকার নিজস্ব একটি তেজারতী কারবার ছিল। সুদে টাকা ধার দিতেন, খাটাতেন, জমাতেন।

সে জন্যেই বছর বছর না হোক, ক'বছর বাদে বাদে বেরোতে পারতেন।

মেয়েদের বিয়ের পর মণি কাকীমা বললেন, তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমিও তোমার মুখ রেখে দিলাম।

—এ সব কি বলছ? বলেছি তো আর যাব না।

—সে বলেছ বটে, কিন্তু বিশ বছর বিয়ে হয়েছে। ন'বার চলে গেছ। বাঁধন থাকলে তুমি পারবে না। মন হাঁপিয়ে উঠবে। তাই আমার কথাও ফিরিয়ে নিলাম।

—না না, সত্যি বলছি।

—আচ্ছা, যাও যখন, আগে-ভাগে ঠিক করে যাও?

—সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি, হঠাৎ মনে হল, আর চলে যাই।

—আপিস থেকে বা যাও কেন? বাড়ি থেকে তো যাও না একবারও?

—ওই অন্ধকার আপিস ঘরে বসে বসে……

—তাই! তুমিও জান না, আমিও জানি না।

—তাই তো বলছি আর যাব না।

মণি কাকীমা বললেন, আর কি! মেয়েরা ছোট ছিল, বাইরের জগৎ জানতাম না। একেকবার চলে গেছ, লোক করে এখানে ওখানে দৌড়েছি, অনেক মানত করেছি, পুজো দিয়েছি। লাভ তো হয় নি কিছু। আজ মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি, আমার আর মনে কোন চিন্তা নেই। কতবার মনে হয়েছে, এর চে' বরঞ্চ ভালো। কিন্তু ওদের রেখে তো মরতেও পারি নি।

—ওগো! আমি যাব না আর। এখন থেকে সংসারী হব, টাকা জমাব।

—কার জন্যে?

—চন্দ্রনাথে আছে, নাতি-নাতনি হবে।

—দেখো! এত সুখ আমার সইবে তো?

সোজা কথা নয়, পাঁচটি বছর মণিকাকা কথা রেখেছিলেন। মণি কাকীমার জীবনে এ সময়টি সবচেয়ে সুখের।

সেই জন্যেই বোধহয় নাতি-নাতনির মুখে দেখে, সংসারের সব সাধ ষোল আনা পূর্ণ করে, মণি কাকীমা মণি কাকাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

একেবারে হঠাৎ। মণিকাকা ডাক্তার ডাকার সময়ও পান নি। মণিকাকা বললেন, আমার কথা ফুরোতে দিল না। আমি ঘরে আছি, দেখে জেনে তবে গেল।

মেয়েরা, জামাইরা, কাকীমার গাঙ্গের বাড়ির খোকাখুকু বাড়ি ভরে গেল।

মণি কাকা বড় জামাইকে বললেন, চিরকাল আমি চলে যেতাম। ও থাকত। ও যে এমন না বলে, না করে…এ কি ব্যবহার বল তো?

বড় জামাই বয়স আন্দাজে বেশ শিক্ষা। সে বলল, এর পরে তো হাত নেই কারো। সময় হবে, যেতে হবে। আর…এমন নয় অকালে গেছেন…আপনিও তো আসছে বছর রিটায়ার করবেন। মায়েরও…

—পঁয়তাল্লিশ হয়েছিল। পঁয়তাল্লিশ?

মণিকাকা কোনদিন ভাবেন নি, মণি কাকীমার বয়স হচ্ছে।

কাকীমা থাকা বলেন, ওই যে চলে চলে যেতে…উপোসে উপোসে দেহ পাত করেছে তো!

মণিকাকা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠেন।

—ভালো খাট আনো। খুব সাজিয়ে গুজিয়ে…সসম্মানে…

খুব সেজেগুজে আলতা-সিঁদুর-চন্দনে আরেকবার বউ সেজে মণি কাকীমা চলে যান।

শ্রাদ্ধও হয় ঘটা করে। মণিকাকাকে ধন্য ধন্য করে সবাই। একরাশ অবহেলা করেছে। কিন্তু শেষের দিকে দেখ! কোনো কাজে ত্রুটি রাখল না মোটে।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে মণিকাকা মেয়েদের বলেন, মায়ের আলমারি খোল্। কি আছে, সব তো তোদেরই। তোরাই ভাগবাঁটোয়ারা করে নে।

—তুমিই তো পরে দিতে পারতে বাবা।

—না না, কাজে দেরি করতে নেই। কি আছে আমিও জানি না, কোনদিন জিজ্ঞেসও করিনি।

আলমারির তাঁজ থেকে একটি লাল শালু জড়ানো কাঠের ছোট বাক্স বের করে বড় মেয়ে।

আস্তে বলে, মা বলত, আমি যদি মরেই যাই, এটা তোর বাবাকে দিস্। আর কেউ যেন না খোলে। আমার দিব্যি রইল।

মণিকাকা বাক্সটি সযত্নে রাখেন নিজের বাক্সে।

—কাপড়-চোপড়, গয়না-গাঁটি, কি আছে না আছে সব ভাগ করে নিস্।

গয়না-গাঁটি তো তেমন কিছু ছিল না। কাপড়-চোপড় বলতে বিয়ের বেনারসী, একটি তাকাই, একটি পাড় বসানো পাশী শাড়ি, মেয়েরাও মাকে সাজতে দেখেনি।

সব ভাগ-বোখ হয়ে যায়। মেয়েরা বলে, তুমি যেন চলে যেও না বাবা। মা নেই, তোমার কাছেই আসব।

—তাই তো আসবি মা।

—কাল থেকে তো বাড়ি খালি হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, কালই তো যাবি তোরা। সংসার ফেলে এতদিন যে থাকলি, এই অনেক।

নাতি-নাতনিকে আদর করে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে মণিকাকা শুতে যান।

দরজা বন্ধ করে মহামূল্যবান বাক্সটি খোলেন। চেনা বাক্স।

বিয়ের পর কিনে এনেছিলেন প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে। আখরোট কাঠের কারুকোজ করা বাক্স।

কর্পূর, নিমপাতার সুরক্ষিত এ বাক্সে কি জমিয়ে রেখেছিলেন মণি কাকীমা? যা শুধু মণিকাকার জন্যই?

পোস্টকার্ড। তাঁর নানা জায়গা থেকে লেখা পোস্টকার্ড। গুণে গুণে দেখলেন ত্রিশখানা পোস্টকার্ড। সবচেয়ে নিচে একটি বিয়ের চিঠি। তাদের বিয়ের চিঠি, বোভাতের চিঠি।

সারাজীবন ধরে এগুলো সঞ্চয় করে রেখেছিলেন? মণিকাকা তো কোনদিন খুঁজ

চিঠিও লেখেন নি। শুধু চিঠি আসলে বলে কোথাও বেশিদিন বসেও থাকেন নি।

চিঠিগুলো লাল শালুতে জড়িয়ে নেন মণিকাকা।

সকালে দেখা গিয়েছিল মণিকাকা ঘরে নেই, বিছানার বাক্সটি পড়ে আছে। সবই রেখে গেছেন। নেই শুধু চোখের চশমা আর পায়ের চটি।

এই সকালই শেষ সকাল। আর তিনি ফিরে আসেন নি।

কার কাছে ফিরবেন? যাঁর কাছে ফিরবেন, তিনিই তো ছিলেন না। মেয়েরা আবার পোস্টকার্ডের জন্যে অপেক্ষা করত। কিন্তু পোস্টকার্ড সঙ্গে করে রাখবার লোক না থাকলে বোধহয় তাও লেখা হয় না।

মহিলাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার :

কালনা মহিলা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : শালীপুর পোঃ নিভৃজীবাজার জেঃ বর্ধমান

জানাচ্ছে সকলকে শারদীয়ার অভিনন্দন।

জ্যোৎস্না হালদার	পরিমল দেবনাথ	আলোরাণী মণ্ডল
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

কালনা তন্তুবায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

গ্রাঃ শালিপুর, পোঃ নিভৃজিবাজার, জেঃ বর্ধমান।

জনতা ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, এবং সাধারণ ১০'×১০' ও ৮০'×৮০' মানের কাপড় প্রস্তুতকারক।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবনাথ	শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ	শ্রীবিবেকানন্দ দেবনাথ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আমরা ধার দিই

কৃষকের হাতে আর হাতিয়ারে।

কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পে এবং অকৃষি-ভিত্তিক উদ্যোগে

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দানের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি. সেক্সপীয়র সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৭

শাখা অফিস : দার্জিলিং ও পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুমাস্তরের সমস্ত
ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক।

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি।

মিসেস নবকুমার হালদারের বাড়িতে অনেককেই অনেক প্রয়োজনে যেতে হয়, কেউ যান কবিরাজ বইয়ের জন্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে, কেউ চাকরির উমেদারিতে, আর কেউ বা গভীরতর কোনো প্রয়োজনে। কবি অমিতকেও যেতে হয়েছিলো, গিয়েছিলো ঠিক বিশেষ কোনো প্রয়োজনে নয়, চায়ের নিমন্ত্রণে।

অমিতের ধারণা হয়েছিলো মিসেস হালদারি সম্ভবত তাকে ছাড়াও আরো কাউকে কাউকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাধারণত এই রকম ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যক্তির ওখানে নিমন্ত্রণ থাকলে অমিত নির্দিষ্ট গৃহের কাছাকাছি পদচারণ করতে থাকে যতক্ষণ না পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন সুযোগ হয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রবেশ করে।

আজ কিন্তু মিসেস হালদারের বাড়ির সামনে ফুটপাথে বহুক্ষণ পায়চারি করেও কোন লাভ হলো না, আর যাদের নিমন্ত্রণ আছে—যদি অবশ্য তেমন সৌভাগ্য আর কারো হয়ে থাকে তারা হয় আসে এসে গেছে, না হয় আসবে না। অমিত ঘড়িতে দেখলো সন্ধ্যা সাতটায় আসার কথা, এখন সাতটা বেজে দশ মিনিট হয়ে চললো, এর চেয়ে বেশি দেরি করা অভদ্রতা হবে।

গুটি গুটি বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। মিসেস হালদার একটা খ্যাতিমতী একটা বিদুষী নন। কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট একলো বাড়ি। গেটে দারোয়ান বা পাহারোলা বলতে কিছু নেই। ঠিক গেটও নয়, বাইরের ঘর আর রাস্তার মধ্যে হাত চারেক জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা, নিলমোচ্চই এবং নিজেই ঐ চারহাত ভূমি অধিকার করেছিলো সে। তার বাইরের ঘরের দরজার ওপরে নজরে এলো একটি বহু পরিচিত ঘোষণা, ঠিক কলিংবেলের তোতানের নিচেই।

বাঙলা, ইংরেজী, হিন্দী তিন ভাষায় লেখা।

'কুকুর হইতে সাবধান'

'Beware of dog.'

এবং হিন্দীতে 'কুত্তিয়ার কুত্তা হ্যায়' সাইন বোর্ড লাগানো আছে। বোধহয় নিরক্ষকদের সুবিধার্থেই একটি অতি হিংস্র কুকুরের ছবি আঁকা, অমিত অবশ্য লিখতে-পড়তে একেবারে জানে না তা নয়, কিন্তু লিখিত অনুশাসনের চেয়ে চিত্রিত ভয়াবহতাই তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠলো।

অতি বৈশবকালে দুটো নেড়িকুকুর ভীষণ কলহ করে অমিতের অতি প্রিয় একটা এক নম্বর ফুটবল ফালির টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলেছিলো, তারো কিছুকাল পরে অমিতের পাঠশালার হেডপণ্ডিতমশাই প্রথম মহিলাদিবস প্রতিষ্ঠানী মাস্টারকে যখন কুকুরে কামড়ির একমাস শয্যাশায়ী করে রেখেছিল, তখন থেকেই কুকুরের সম্বন্ধে সাবধানে অমিত যথেষ্ট সচেতন। লোকে কোথাও বাড়ি ভাড়া করতে গেলে বা রাত্রিবাস করতে গেলে প্রশ্ন করে, 'ওখানে মশা কি রকম?' অমিত প্রশ্ন করে, 'ওখানে কুকুর কি রকম?'

তবু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা আর অমিতের ভাষায় যেখানে সন্ধ্যা সেখানেই বাঘের ভয়। যত কুকুরের মধ্যে সাহসের খুটো পা থেকে সে বেড়িয়েছে তত বেশি করে কুকুরের পাল্লায় পড়েছে। মাস তিনেক আগে সে একটা আনুমানিক হোম করে দেখেছে যে, চৌদ্দো সাড়ে সাত মাইল রাস্তা কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়েছে। এই সাড়ে সাত মাইলের মধ্যে অনেকের বেশি কাঁচা রাস্তা, বুনো কোপ-ঝাড়, গাঁয়ে-গঞ্জে, একবার দুই কিংবা চার গাঁয়ের বেড়ার মধ্যে একটুও দেখা যায় এমনটা হলো। পিচের রাস্তা বা ভালো বাঁধানো রাস্তায় দৌড়ানোর সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে। কুকুরের তাড়াও এক হিসাবে সার্কাস—যাকে বলে বিনোদন বিশেষ। দৌড়লেই কুকুর তাড়া করবে, আর তাড়া যদি করে কুকুরকে তাহলে দৌড়তেই হবে। এমনিতেই চার পায়ের আর একটি কুকুরকে বিসর্জনের আহ্বান করা।

গাঁয়ে অমিত একলো দশ ঘণ্টা পানা-পুকুরে ডোবার মধ্যে কাটিয়েছে কুকুরের তাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার অভিজ্ঞতা এই রকম যে, সাধারণত দৌড়ে চার ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা ডোবার পাড়ে অবিরত করে আক্রমণকারী কুকুর সরে যায় তারো অর্ধ ঘণ্টা খানেক পরে নিঃশব্দে ডোবা পুকুর পরিত্যাগ করতে পারলে পুনরায় কোন দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

গাছে উঠতে পারলে অবশ্য সবচেয়ে সুবিধে হয়। যে-কোনো কারণেই হোক কুকুরেরা গাছের নিচে এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করে না। গাছে উঠেও পরে

না। কিন্তু হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে গাছ পাওয়া যায় না সব সময়। আর সব সময় ওঠাও যায় না। তবে বিপদের সময় আরোহণ বা পরবর্তী অবতরণেও অসুবিধা বা অসম্ভাবাতার কথা কে আর বিবেচনা করে। একবার এক ফ্রেঞ্চ টেরিয়ার কুলগাছে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অমিত ভাল চেঞ্জে আক্রমণকারী কুকুরের পিঠে পড়ে যায়। ঐ একবার ছাড়া আর কখনো কোনো কুকুরকে সে ভয় করতে পারেনি। অমন সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে যে এক মিনিট আগের চরম্বর দুঃশমন অন্তর্হিত হতে পারে সে কল্পনারও অতীত।

কুকুরের আক্রমণে সে সবসুদ্ধ গাছে কাটিয়েছে তিন ঘণ্টা। অপরিচিত-পরিচিত গৃহের ভিতরে বা ছাদে উঠে গেছে অসংখ্যবার। রাস্তার ধারে পার্ক করানো গাড়ির ছাদে শুয়ে, একবার এক আইসক্রিমওয়ালার বাক্সের ওপরে। তাও তার ওপরে দাঁড়ানো খুব কঠিন, খুব ব্যালান্স দরকার। আর ঐ অবস্থায়, বিরাট আইসক্রিমওয়ালার প্রতিবাদ আর মারমুখী কুকুরের ঘেউ, ঐ অবস্থায় ব্যালান্স!

মিসেস হালদারের বাড়ির বেল টিপতে গিয়ে হাতটা আটকে গেলো, যেন উঠতে চাইলো না। আবার সেই ব্যালান্সের খেলার কথা মনে পড়লো অমিতের 'কুকুর হইতে সাবধান' সব বীভৎস স্মৃতি মনের মধ্যে তোলপাড় করে এলো।

তবে কুকুর তাড়া করে বেড়া টপকিয়ে লেডিস পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, তবে দৌড়ে পালাতে গিয়ে অপোসেলেন অফিসে ঢুকে পড়ে বাধ্য হয়ে প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও কালাজ্বরের টিকা নিতে হয়েছিলো। আরো সেই কবে, সেই বুক-টনটন-করা দুঃসহ সন্ধ্যা সেদিন কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় প্রিয়তমা বান্ধবীকে ল্যান্সডাউন রোডে একটি খেঁকি কুকুরের সম্মুখে পরিত্যাগ করে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হয়েছিলাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন কুকুর তাকে এত তাড়া করে? সে কি তার অজ্ঞাতসারে কণ্ঠস্বরের জন্য, নাকি হাঁটার সময় তার বাঁ পা যে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরে যায় সেই বৈচিত্র্যের জন্য? যার জন্যেই হোক না কেন, এখন কি করবে সে?

অমিত চারিদিকে সন্তর্পণে তাকাতে থাকে, না বেড়ার ফাঁক দিয়ে দরজার মধ্যে কোন কুকুর নেই, কুকুর বাড়ির মধ্যেই। তাহলে কি বাড়ির মধ্যে ঢোকার জন্যে বেল দেবে। অবশ্য অমিত অনাহূত বা অবাঞ্ছিত নয়। গৃহকর্তার উচিত তার হিতে কুকুরকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা। কিন্তু অনেক সময়, অনেক সময় মানে অধিকাংশ সময়েই এর উল্টোটা ঘটে থাকে, অন্তত তার এই অভিজ্ঞতা।

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ ইতিউতি করলো সে, তারপর মরিয়া হয়েই যেন বেকার যেভাবে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ঢুকে যায় সেভাবেই কলিং বেল টিপলো সে।

একটু পরে একটি বালক-ভৃত্য বেরিয়ে এলো। তাকে কিছু বোঝানোর আগেই মিসেস হালদারের দেখা পাওয়া গেলো। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে বললেন, আসুন। তারপর একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আগে একটু দাঁড়ান।' তারপর বালক-ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লছমন, টাইগার কাঁহাপর হ্যায়?'

অমিত বুঝতে পারলো বহিদ্বারে প্রদর্শিত বীভৎস সারমেয়টিরই নাম টাইগার। হাঁটু কাঁপতে লাগলো। হাঁটু কাঁপা থেমে গেলো যখন লছমন এসে জানালো যে টাইগার কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টাইগার কত বড়, কি তার রঙের কে জানে বাবা, কিন্তু এইটুকু একটা একতলা বাড়িতে একটা কুকুর কোথায় লুকোতে পারে? নিশ্চয় লছমন ভালো করে খোঁজেনি, এই অজুহাতগুলো সব ভাঁওবাজ হয়!

মিসেস হালদার বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ডটা! তা আপনি কুকুর দেখে ভয় পান না তো? অবশ্য আপনার কবিতা পড়লে খুব ভীতু বলেই মনে হয়।'

ভীতু কি সাহসী বলা কঠিন। অমিত চিরদিনের পলাতক। আজ কি হলো সে বলে বসলো, 'না কুকুরকে আর ভয় কি?'

'অত সাহসেরও কিছু নেই।' মিসেস হালদার জানালেন, 'আর তাছাড়া টাইগার বড় রাগী আর বদমায়েস। আপনি একটু সাবধানে আসুন। আমি কাছে রয়েছি, ভয়ের কিছু নেই।'

কম্পিত কণ্ঠস্বরে, 'ভয় কি, ভয় কি' করতে করতে অমিত বাড়ির ভিতরে ঢুকলো।

সাহিত্য রাজনীতি ইত্যাদি খুচরো ব্যাপার-বিষয় নিয়ে দু-একটা কথাবার্তা হলো। এরই মধ্যে মিসেস হালদার একাধিকবার বললেন, যদি টাইগার এসে পড়ে সে যেন দৌড়াদৌড়ি না করে ভয়টয় পেয়ে। ভয়ের কোনো কারণই নেই। আর তাছাড়া তিনি তো পাশে রয়েছেন।

ভয়ে ভয়ে অমিত বত সিনেমা, সাহিত্য, সুচারু শিল্পের দিকে আলোচনা নিয়ে যেতে চায় তিনি ততো টাইগারের বীরত্বের গল্প করেন। কবে টাইগার ডাকপিয়নকে তাড়া করে গিয়েছিলো, হাতে পায়রা ধরতে গিয়ে লাফ দিয়ে একতলায় পড়ে গিয়েছিলো।

কথায় কথায় সময় যায়, চা আসে নীট অমিতও উঠতে পারে না। অত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় সময় কাটন যোবনের বিরের রাত্রিতেও তাকে করতে হয় নি।

অবশেষে চা এলো। এক দরজা দিয়ে লছমন চায়ের সরঞ্জাম আর খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকলো, আর অন্য দরজা দিয়ে টাইগার। মিসেস হালদার লাফিয়ে উঠলেন, 'এই যে রয়েছে। দেখবেন, ভয়ের কিছু নেই।' এই বলে লছমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ উল্লুকে, ক্যা দেখতা, যাও জলদি কুত্তকে চেন লে আও।'

লছমন দৌড়ে গিয়ে চেন নিয়ে এলো।

গুহেদের মিঃ হালদার ডকে না জেটিতে কোথায় কাজ করেন। বোধহয় জাহাজ ঝাঁধবারই হবে একটা ভারি লোহার সিলিন্ডার খুব কষ্ট করে লছমন ধরে নিয়ে এলো।

এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে টাইগার দরজার চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলো অনিতাকে, শিবুকে দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু পালাবে কোথায়, লছমন ধরে গলায় চেন পরিয়ে দিলো। প্রতি নির্ভীব, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা আমরা মাত্র একটা বিদেশী কুকুর। গলায় চেন পরাতে নেড়েতে বলিয়ে কাবু হয়ে পড়ে গেলো সুন্দর টাইগার।

কৈশোরে এই প্রথম অনিত কুকুর দেখে ভয় পেলো না।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ—

মধুপুর-ছাতনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম+পো: ছাতনী, বর্ধমান

সুলভে কাপড়, সার পাওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
এলাকার বিশেষ সুবিধার ব্যাংক বিভাগ কাজ করিতেছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

শ্রীকৃষ্ণকমল দত্ত
ম্যানেজার

খোন্দেকার রহমত আলি

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই :

নওয়াপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

পোঃ দাঁইহাট, জেলা ঃ বর্ধমান

আমরা প্রস্তুত করি উন্নত মানের ১০০"×১০০" টাপাইল শাড়ি।
সাধারণ তন্তুজীবীদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন আমাদের উদ্দেশ্য।

অনুশিলা দাস
সভাপতি

রামপ্রসাদ প্রামাণিক
ম্যানেজার

সুভাষ প্রধান
হিসাব রক্ষক

রবি প্রধান
সম্পাদক

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেন্‌স্‌ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা

পি ১৬১ ১, ডি আই পি রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০৪৪

দূরভাষ : ৩৫-৪১৩১ ৩৭-৩৬১৬

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৮৭৩ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা—১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ☐ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ☐ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ☐ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ☐ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বীমা প্রকল্প ☐ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ ☐ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় সুলভ মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ইহা, BENFISH বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক পরিবেশিত সমবায়মূলক পুস্তকরাজির নবতম সংযোজন

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ ল

বইটিতে পাবেন :

- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতিসমূহের আইন—১৯৮৩
- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতিসমূহের নিয়মাবলী—১৯৮৭
- মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ আইন—১৯৮৪ এবং নিয়মাবলী—১৯৮৫
- বিভিন্ন ধারার বিশদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন
- বিভিন্ন কেস লজ, সরকারি সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ

মূল্য : ৮৫·০০

বিঃ দ্রঃ বর্তমানে বইটির উপর শতকরা ২০ টাকা এবং পাঁচ ও তার বেশি সংখ্যক বইয়ের জন্য ঐ হারে শতকরা ৩০ টাকা বিশেষ কমিশন দেওয়া হচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অষ্টম তল)

কলিকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২০-৮১২৮

ব্যোম বুড়ো ও বহেরা মাতা ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভদ্রলোকের নাম ব্যোমকেশ বিশ্বাস।

চোখে ভাল দেখেন না, কিন্তু প্রখর তাঁর অনুভূতি ইন্দ্রিয়। ফ্ল্যাট বাড়ির নিচের এক তলায় থাকেন ছেলের সঙ্গে। চোখের জন্যই অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রেটিনার ক্ষয় হয়েছিল। কিন্তু চোখে দেখতে পেলেও কানে শুনতে পান, ঘ্রাণও পান এবং যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদের দেখতে না পেলেও গলার স্বর শুনে জানেন। কে কখন আসছে, আর কে যাচ্ছে, তাঁর নখদর্পণে। কথা বলেন সবার সঙ্গে এবং অল্পতেই বেশি কৌতূহল প্রকাশ করেন। ফ্ল্যাট বাড়ির অনেকেই ব্যোম বুড়ো বলে।

কিন্তু ব্যোম বুড়ো বা ব্যোম বুড়োর সঙ্গে আলাপ জমাবে কে। সে বুড়োরা নির্বিকার চিত্তে বসে থাকেন সজাগ দৃষ্টিতে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও বিষয়ে কোনও কৌতূহল নেই, তাদেরই ব্যোম বুড়ো বলে। চোখের নেই।

কিন্তু নাম

অনেকেই তাঁকে ব্যোম বুড়ো বলে ডা এবং তাঁকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করে।

ব্যোমকেশবাবুর ছেলে প্রতিদি ব্যাঙ্কের পর ছেলের বউ ছবি একটু, তাড়াতাড়ি বেড়াতে। পায়ের চটির শব্দ যাতে না হয় তার জন্য চটি হাতে করে

কিন্তু ব্যোমকেশবাবু ডেকে বললেন :

কোথায় যাচ্ছ ?

বলুন চোখে দেখতে পান

সবরে বাড়িতেই পাবে বলে আশা করছ কেন—এই সব প্রশ্ন। মন্নরী যেন কোন পাপ কাজ করতে যাচ্ছে। আমাকে সে কী বলেছে জানো?

কি?

বুড়োকে বাইরে না বসিয়ে ঘরের মধ্যে বসাতে।

কিন্তু উনি তো ঘরে বসতে চান না!

তাই বলে অন্যেও তো ওঁকে বাইরে বসা দেখতে চায় না! এই জন্যেই তো বলছি যে, বাবাকে কোনও আশ্রমে রেখে এসো। ওঁরও ভাল লাগবে, প্রতিবেশীরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

কিন্তু ওঁর দেখাশুনো করবে কে বল? সবার খোঁজ-খবর রাখতে চান, এটাই ওঁর দোষ ভাবছ তোমরা। আজকাল ক'জনে পরের জন্যে ভাবে বল!

ছবি চুপ করে যায়। গভীর চোখে চেয়েও ঠিক করতে পারে না, কী ভাবে বুড়োকে এড়িয়ে বাড়ি থেকে বার হওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে যে সংসারের কাজের নামেই বেরোবে এবং সাহস সঞ্চয়েই যাবে।

পরদিন সে নিজেই বলল: বাবা, আমি একটু বেরোচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা আনতে হবে।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, কেন, আজ সকালেই তো সঙ্কর বাজার করে আনল! কাঁচা লঙ্কা আনেনি?

না বাবা, বোধহয় ভুলে গেছে।

না বউমা, ভুলে যাওয়া তো ভাল কথা নয়। ওর কোনও দুর্ভাবনা নেই তো? আর বউমা, তোমাকেও একটা কথা বলি। বাজার বহু নোংরা জায়গা। ওখানে ভাল কাপড় জামা বা সুগন্ধ মেখে যাওয়া ঠিক নয়।

ছবি বলল, ভাল কাপড়-জামা পরিনি তো!

ব্যোমকেশবাবু সহাস্যে বললেন। তোমার পায়ের ঐ সেন্টটা মেখেছ কিনা, তাই ভেবেছিলাম যে, ভাল কাপড়-জামা পরেছ। একটু সাবধানে যেও, চোখ কান খোলা রেখে। তোমার তো বাজারে যাবার অভ্যেস নেই, তাই জানানো হচ্ছে।

ছবি বুঝতে পারল যে, পারফিউম মেখে বেরোনো ঠিক হয় নি। এবার থেকে ওটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে বেরোতে হবে। পরে মাখলেই চলবে। কিন্তু এই কাঁচা লঙ্কা নিয়ে যে সঙ্কর কেলায় ভুলকালাম লাগাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

সঙ্কর অফিস থেকে ফিরে রোজই তার বাবার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে। আর ব্যোমকেশবাবুও তার অফিসের খোঁজ-খবর নেন খুঁটিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অফিসে কি কোনও গোলমাল চলছে?

সঙ্কর বলল, কেন এ কথা ভাবছ বল তো?

ভাবছি এই জন্যেই যে, আজ সকালে বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা আনতে ভুলে গেছ!

সঙ্কর বলল: না তো, একশো গ্রাম কাঁচা লঙ্কা এনেছি। দিন কয়েক বেশ চলে যাবে।

ব্যোমকেশবাবু হেসে বললেন, এই জন্যেই তো ভাবছি যে, কোনও কারণে তোমার ভুল হচ্ছে। বউমাকে জিজ্ঞেস কোরো, কাঁচা লঙ্কা এনেছ কিনা!

সঙ্কর আর দেরি না করে ভেতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ির পাশেই ছাদের দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে গিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করল, কী গো, আজ আমি কাঁচা লঙ্কা আনিনি বাজার থেকে? বাবার কাছে নালিশ করেছ বুঝি?

এই নিয়েই তুলকালাম ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত ছবি বলল, কাঁচা লঙ্কা আমাদের জন্যে নয়, মন্নরীর জন্যে। বাবাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে মন্নরীর নাম করিনি। ও চায়না যে উনি ওদের সংসারেও মাথা গলান।

শেষ পর্যন্ত সঙ্করকেই হার স্বীকার করতে হ'ল সংসারের শান্তি রক্ষার জন্য। নিজের বাবার কাছে মিথ্যে বলতে হল যে, অফিসের বাবার তাড়া ছিল বলেই ভুলে গেছে। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু বললেন, তাড়া ছিল! তা বাবার সময়ে আমার সঙ্গে অতক্ষণে কথা বলে গেলে কেন!

একদিন এই বিরাট বাড়িটায় উৎসবের চেহারা দেখা গেল। এক জনের শ্রাদ্ধে আসছেন ঋত্বিকেদের আশ্রম থেকে বহেরা মাতা। কানে শোনেন না ঠিকই। কিন্তু চোখ খুঁজে সবই বুঝতে পারেন। কে আসছে, যে যাচ্ছে, কে কী জানতে এসেছে তা জিজ্ঞেস করবার আগেই বলে দিতে পারেন। দিন কয়েক থাকবেন সঙ্করের বাড়িতে, সঙ্গে দু-চার জন শিষ্য-শিষ্যাও আসছেন। ছবি বলে, বাক, কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত। বহেরা মাতাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকবেন। বাবার কথা কেউ শুনবে না।

কিন্তু গোলমাল বাধল বহেরা মাতার সঙ্গেই। তিনি উপরে উঠবার সময়ে ব্যোমকেশবাবুর দিকে চেয়েই বললেন, ঐ বুড়োটা অমন করে চেয়ে আছে কেন?

ভক্ত শিষ্যা বহেরা মাতার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন: উনি চোখে দেখতে পান না।

বহেরা মাতা বলেন, এই বয়সে ও অভ্যেসটা তো ভাল নয়! তোমরা ওকে বোঝাও না কেন?

ভক্ত শিষ্যা বললেন, এই বয়সের মানুষকে কি কিছু বলা যায়!

তাহলে তার ফলও ভুগতে হবে।

বহেরা মাতার হঠাৎ মনে হ'ল যে, ঐ বুড়োর চোখের দৃষ্টিটা যেন চেনা মনে হচ্ছে। বললেন: ওই বুড়োটা আগেও কি পাড়ি রাখত? কবে থেকে পাড়ি রাখে জিজ্ঞেস করে এসো তো?

একজন ছুটে গেল ব্যোমকেশবাবুর কাছে। উত্তর জেনে এসে বলল। চোখের দৃষ্টি হারাবার পর থেকে পাড়ি রাখছেন।

বহেরা মাতা বললেন। প্রথম স্ত্রী পালিয়ে যাবার পর থেকে?

না না, উনি পাড়ি রাখছেন—

ভক্ত শিষ্যা বললেন: না না, ওঁকে বোঝাতে হবে না। তুমি জিজ্ঞেস করে এসো, ওঁর প্রথম স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিল কি না।

জেনে এসে সে বলল। ঠিক বলেছেন তো!

ভক্ত শিল্পী বললেন : শুনতে না পেলেও উনি দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখতে পান।

বহেরা মাতা বললেন : বুঝেছি। বউ-এর সঙ্গে সারা দিন খিটিমিটি করত ঐ লোকটা! বিয়ের কিছুদিন পরেই বউ পালিয়ে গিয়েছিল।

এ কথাও জেনে আসা হল। ব্যোমকেশবাবু বললেন, খিটিমিটি করার জন্যে কিনা জানিনা, তবে তাঁর স্ত্রী যে আর একজনের সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করত তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর সেই জন্যেই চোখে চোখে রাখতেন বউকে।

বহেরা মাতা এই উত্তর শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু ভক্ত শিল্পী সবাইকে বললেন, দেখলেন তো! কী অসাধারণ ক্ষমতা। যেভাবে অতীতের কথা বলছেন, সেইভাবে ভবিষ্যতও বলতে পারেন।

বলে বহেরা মাতার দিকে তাকাতে তিনি বললেন। এখন কি দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের সঙ্গে আছেন?

একজন এই প্রশ্নের উত্তর জেনে এসে বলল, ঠিক কথা।

বহেরা মাতা বললেন : লোকটার সন্দেহ বাতিক। সবাইকে সন্দেহ করে।

ফ্ল্যাট বাড়ির যারা উপস্থিত ছিল, তারা সবাই একবাক্যে বলল, ঠিক বলেছেন। ব্যোম বুড়ো বাড়ির সামনে বসে জেরা করেন সবাইকে, যেন উনিই সবার অভিভাবক।

বহেরা মাতা বললেন, বুড়োর নাম কি ব্যোমকেশ বিশ্বাস?

ব্যোমকেশবাবুর পদবী তা' বিশ্বাস! তাই না?

বলে ভক্ত শিল্পী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললেন। মা একেবারে সাক্ষাৎ অন্তর্যামী!

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহিলারাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন বহেরা মাতাকে।

এদিকে মঞ্জরী ডেকে এনেছিল ছবিকে। বলল, তোমার শ্বশুরকে আর এখানে রাখা চলবে না।

ছবি বলল, কেন, উনি কী করেছেন?

মঞ্জরী বলল, এখনও কিছু করেন নি, তবে করতে কতক্ষণ! ওঁর খটাখটা, তো শুনলাম! নিজের বউকে সন্দেহ করতেন বলে বউ পালিয়ে গিয়েছিল। উনি এখনও বোধহয় সবাইকে সন্দেহ করেন।

ছবি চুপি চুপি বলল, উনি বহেরা মাতাকেও সন্দেহ করছেন। ওঁর গুরুর আশ্রমের নামটা কী ছিল জানতে বলেছেন।

কেন বল তো?

বহেরা মাতার গলাটা ওঁর চেনা-চেনা লেগেছে।

কিন্তু কে এ কথা জানতে চাইবে? উনি তো কানে শোনেন না?

ছবি বলল, অনেকে তো লিখে প্রশ্ন করে ওঁকে, উনি উত্তর দেন।

মঞ্জরী বলল, তা দেন। কিন্তু কোঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো!

তুমি কী সন্দেহ করছ?

ওঁরা পরস্পরকে চিনতেন শুনলে আশ্চর্য হব না।

কেন

বৈব শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। উনি বোধহয় চিনতে পেরেছেন তোমার শ্বশুরকে। এখন চুপ করে থাকো। নাটকটা জমুক।

ছবি বলল, কিন্তু সবাই যে বলছে যে, উনি দৈব শক্তির অধিকারী। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন সবারই।

মঞ্জরী বলল। অপেক্ষা করলেই জানা যাবে। তুমি বরং তোমার শ্বশুরকে সামলাও।

কী সামলাব?

ওঁর যদি মনে পড়ে থাকে কারও কথা তো সেটা জানতে হবে।

ছবি বলল, আমি এর মধ্যে নেই।

কেন?

শেষে আমার সম্বন্ধেও কিছু বলবেন বিপদে পড়ে যাব।

তাহলে আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমি যাচ্ছি তোমার শ্বশুরের কাছে।

মঞ্জরী সত্যিই এল ব্যোমকেশবাবুর কাছে। বলল, নমস্কার মেসোমশাই।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, এসো মা মঞ্জরী। আজ বেরোচ্ছ না তুমি?

না মেসোমশাই, আজ বহেরা মাতাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি।

বহেরা মাতা নাম হল কেন? কানে কম শোনে বুঝি। কানে জল ঢুকে গেলে যেমন এই রকম হয়। বুড়ো কানই নষ্ট হয়েছে?

আপনি চেনেন বহেরা মাতাকে?

চিনি বলব কি করে মা! চোখে তো দেখতে পাইনে। তবে গলার স্বরটা চেনা চেনা লেগেছে। ওঁর নাম কি নীলাঞ্জনা ছিল নীলাঞ্জনার গলার স্বর ছিল এই রকম।

নীলাঞ্জনা কে মেসোমশাই?

এখন ওসব কথা থাক মা। নীলাঞ্জনা তো সংসারী হয়েছিল। দুজনের এক রকম কণ্ঠস্বর হতেই পারে।

মঞ্জরী জিজ্ঞেস করল :

সঙ্গে দেখা করবেন না?

ব্যোমকেশবাবু বললেন : আমার যে জানবার কিছু নেই। নিজের অতীত আমি আর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার হাতে আমি চোখের চিকিৎসা বন্ধ করাই নি। লোকে কথায় ব্যাবসায় পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। আর কিছু করার নেই। এই যে এখন ঘর থেকে বাইরে এসে বসতে পারছি, এই সন্তোষ এই ক্ষমতাটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তবে মনের ক্ষমতাটা বেড়েছে। আমি কিছু কিছু দেখতে পাই আড়ালের জিনিস

মঞ্জরী বলল : তাহলে দেখতেই পাচ্ছি পায়ের শব্দেই আমাদের চিনতে পারেন।

ব্যোমকেশবাবু বললেন : কিন্তু তোমরা তো নিঃশব্দে চলাফেরা কর। তোমাদের গতিবিধি জানবার জন্যে অন্য শক্তি দরকার। শুনেছি, অন্ধদের জন্য ইন্দ্রিয়গুলো খুবই প্রখর হয়ে ওঠে—নাক-কানের শক্তি বেড়ে যায়। আমারও তাই হয়েছে সব কথা মনেও রাখতে হয়।

কী রকম?

আজ এ সব কথা থাক মা, ওপর কী দেখে এসে তাই বল।

মঞ্জরী বলল : বহেরা মাতাকে সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে।

কেন ?

আপনার সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, সব মিলে গেছে।

তাই নাকি ?

তাহলে ওঁর নামটাও জেনে . আমাকে জানিয়ে যেও। ওঁর নামটা জানতে পারলে কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু কী মেসোমশাই ?

বলে মঞ্জরী কৌতূহল প্রকাশ করতেই ব্যোমকেশবাবু বললেন : কণ্ঠস্বর শুনে আমার নীলাঞ্জনা বলেই সন্দেহ হচ্ছে। চোখের দৃষ্টি দেখে যেমন মানুষ চেনা সহজ, তেমনি কণ্ঠস্বরেও মানুষ চেনা কঠিন নয়। যদি প্রবঞ্চনা করার স্বপ্ন বলানোর চেষ্টা না করে। সেটা সম্ভব।

মঞ্জরী বলল : আপনার বিশ্রামের সময় হয়েছে মেসোমশাই, আমি এখন আসি। আমি গেলেই বোধহয় ছবি এসে পড়বে।

বলে ব্যোমকেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মঞ্জরী ঠিক করে ফেলল যে, যেভাবেই হোক বহেরা মাতার নামটা জেনে নিতে হবে, সেই সঙ্গে নীলাঞ্জনার পরিচয়ও। তাতে এক ঢিলে দু'পাখি মারা সম্ভব হবে। প্রকৃতই বহেরা মাতা যে অসাধারণ কেউ নন, সেটা জানা যাবে। আর তাহলেই সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুকে বিদায় করতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই বহেরা মাতার সঙ্গে তো শিষ্যও আছে। তাঁর আশ্রমে ব্যোমকেশবাবুর ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হবে না। ইনি তাঁর পরিচিত হলে হয়তো দু'জনের কারও আপত্তি হবে না।

বিকেলে তার স্বামী ঈশ্বর অফিস থেকে ফিরতেই তাকে তার পরিকল্পনার কথা জানাল। ঈশ্বর বলল, পরের ব্যাপারে মাথা গলানোটা কি ভাল হবে ?

মঞ্জরী বলল : পরের ব্যাপার ঠিক নয়। ছবি তার স্বপ্নকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই উপকার করা হবে। তুমি সঞ্জয়বাবুকে বলে ব্যবস্থা কোরো। বহেরা মাতাকে আমি সামলার সঙ্গে রেখার।

কেমন বয়ে ?

বয়স্কা ক্ষমা হবেন তো ! তাদের প্রশ্নগুলো লিখে বহেরা মাতার হাতে দেওয়া হবে। তিনি এক একটা কাগজ পড়ে উত্তর দেবেন। আমার প্রশ্নটাও দিয়ে দেব লিখে।

তারপর কোনও বিপদ হবে না তো ?

বিপদ কিসের ! হয় উনি উত্তর দেবেন, নয় দেবেন না। তুমি চেষ্টা করবে যে সঞ্জয়বাবু যেন তাঁর বাবাকে আশ্রমে পাঠাতে রাজী হন। ছবি অনেক চেষ্টা করেও রাজী করাতে পারে নি।

ঈশ্বর বলল, নতুন পয়েন্ট কিছু আছে ?

আছেই তো ! বহেরা মাতার আশ্রমে উনি ভাল থাকবেন। জঙ্গলেশে শরীরও ভাল থাকবে, মনও ভাল।

কিন্তু বহেরা মাতা রাজী হবেন কেন ?

আমি সে ব্যবস্থা করব। কারও নাম দিয়ে লিখে দেব কিছু। বহেরা মাতা বুঝতে পারবেন যে, আমরা ওঁকে সরাতে চাইছি।

কিন্তু উনি তো সবার ভাল ছাড়া কারও মন্দ চান না !

মঞ্জরী বলল : সবার ব্যাপারে নাক গলানোটাও সবাই পছন্দ করে না। ছবিও না।

অগত্যা ঈশ্বরকে সঞ্জয়ের কাছে যেতে হল। ঘনিষ্ঠতা নেই। নিচে নামলেই সিঁড়ির পাশে তাদের বসবার। বাইরে বেরোতে হয় না বলে ব্যোমকেশবাবু জানতেও পারবেন না যে, সে তাঁদের বাড়ি এসেছে। ওপর থেকে সে নজর রেখেছিল সঞ্জয়ের ফেরার। তারপর কিছুক্ষণ সময় দিয়ে নেমে গেল।

এদিকে মঞ্জরী বহেরা মাতার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে পাঠাল সারাদিন ভাববার পর। প্রশ্নটা হল, আপনার নাম কি নীলাঞ্জনা ? যথাসময়ে তার উত্তরটাও আসবে, এই আশায় বসে রইল উৎসুক হয়ে। কিন্তু আর একটি কাজ করতে পারে নি। ব্যোমকেশবাবুর নামে কিছু লিখতে কেউই রাজী হয়নি। ছেলেমেয়েরা তাঁর ওপর ভারি খুশি। তিনি কে বেরোলে, আর কে ফিরল না, সবই বলতে পারেন। তাঁর কাছেই ছেলেমেয়েদের খবর পাওয়া যায় বলে তারা ব্যোমকেশবাবুকে পাহারায় রাখতে চান। মঞ্জরী ভাবল যে, এ কাজটা পরেই করা যাবে। বহেরা মাতা তো আজই চলে যাচ্ছেন না ! কাল কাউকে বাইরে থেকে ধরে আনা যাবে।

প্রথম প্রশ্নটি বহেরা মাতা মনে মনে পড়লেন। কিন্তু প্রশ্নকারিণীর নাম পড়ে তাঁকে দেখতে চাইলেন। মুখখানি দেখে বললেন, সংসারে কি শান্তি আছে ! নানা ব্যাপারেই অশান্তি। সে-সব মেনে নিয়েই চলতে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নকারীকে দেখে বললেন, মন দুর্বলতামুক্ত রাখতে হলে একটা নেশার দরকার। মদ বা জুয়ার মতো ক্ষতিকর নেশা নয়। ধর্মের মতো পবিত্র নেশা। ধর্ম কাজে মন বসলেই দুর্ভাবনা দূর হবে।

তৃতীয় প্রশ্নকারিণীকে দেখে বললেন, গুরুর কাছে ধর্ম নেবার প্রয়োজন হয় তখনই, যখন নিজের মন কোনও বিশ্বাসে স্থির হয় নি। বিশ্বাস বা ভক্তিই সার কথা।

এইবারে মঞ্জরীর ডাক পড়ল। সে মুখ তুলতেই বহেরা মাতা বললেন, অকারণ কৌতূহল দমন করাই ভাল।

বলে পরের প্রশ্নে চলে গেলেন। কিন্তু মঞ্জরীর মনে হল যে, উত্তরটা তিনি এঁড়িয়ে গেলেও একটু যেন বিচলিত হয়েছিলেন। এবং তাকে চিনবার চেষ্টা করেছিলেন। উপস্থিত অনেকেই তার দিকে পুনরায় তাকাল উত্তর শোনবার পর। ভাগ্যশ্রীও আড়চোখে দেখলেন মঞ্জরীকে।

সবাই চলে যাবার পর ভাগ্যশ্রী মঞ্জরীকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী জানতে চেয়েছিলে তুমি ?

মঞ্জরী বলল, বহেরা মাতার নাম !

ভদ্রমহিলা বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস

করলেই জানতে পারতে যে এ সব প্রশ্নের উত্তর উনি দেন না।

হারাধন বললেন, তোমার যদি নিজের সম্বন্ধে কিছু জানবার থাকে তো আর একটা প্রশ্ন লিখে আমাকে দিও।

মন্দরী বলল: না মাসিমা, আমার নিজের কিছু জানবার নেই।

কিছুক্ষণ পরেই মন্দার ফিরে এল সন্তরের ফ্ল্যাট থেকে। বলল। হেরে গেলাম।

মন্দরী বলল: কেন বলতো!

সন্তর ঠিকই বলছে। বুড়োকে সরালে ওর খুব ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কেন?

বুড়ো অনেক টাকা করেছেন শেষ বয়সে। এক অ্যাটর্নির কাছে তাঁর সব হিসেব-পত্র আছে। মাঝে মাঝে সে ভদ্রলোক এসে পরামর্শ নিয়ে যান। সন্তর এ-সবের কিছুই জানে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে, বাপকে খুশি রাখতে পারলে সে-ই সব কিছু পাবে।

আর ছবি কি এ কথা জানে না?

জানে। সন্তর তাকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু সে টাকা-পয়সার পরোয়া করে না। তাই মাঝে মাঝেই বুড়োকে তাড়াবার বায়না তোলে। সন্তর আমাকে বলেছে তোমাকে বলবার জন্যে, তার স্ত্রীকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। বেশিদিন তো নয়। কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই বুড়োর বিষয়-সম্পত্তি তাদেরই হস্তগত হবে।

মন্দরী বলল, কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু বুড়োর প্রথম স্ত্রী ওঁকে ত্যাগ করে গেলেন কেন?

মন্দার আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমাকে এ কথা কে বলল?

কেন? বহেরা মাতাই তো বললেন, আর মেসোমশাই তা মেনে নিয়েছেন।

এ বোধহয় বুড়োর প্রথম জীবনের কথা। কারণ সন্তরের বয়েস তো কম হয় নি। সে তার মায়ের কাছেই মানুষ হয়েছে। তার মায়ের ছবি দেখেছি ওর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো। তিনি মারা গেছেন বলেই জানি। সন্তরও এর বেশি কিছু জানে বলে মনে হয় না।

পরদিন একটা খবর শুনে সবাই আশ্চর্য হল। বহেরা মাতার শিষ্যরা নাকি বলেছে যে, যোমকেশবাবু তাঁদের আশ্রমে যাচ্ছেন। মন্দরীর বিশ্বাস হল না এ কথা, তাই ছবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। ছবি বলল, তাই তো শুনেছি। তুমি কল-কাটি নাড়োনি তো?

মন্দরী বলল, আমি তো উল্টো কথা শুনেছিলাম!

কী কথা?

মেসোমশাই-এর অনেক টাকা আছে বলে তোমরা তাঁকে ছাড়তে চাও না!

ছবি বলে উঠল, কে বলেছে এই কথা? সন্তর?

কেন, মিথ্যে কথা বললে দোষ কী?

হ্যাঁ, ঐ অলার স্বভাবকে বোঝাচ্ছে যে, এই বয়সে কোন আশ্রমে গিয়ে থাকা ঠিক হবে না। সেখানে যত্ন-আত্তির অভাব হবে। কিন্তু উনি কী বলছেন জানো?

না।

বলছেন, এখানে তো তোমরা দু'জন। সেখানে অনেক মানুষ। শিষ্য-শিষ্যারা আমাকে মাথায় করে রাখবে।

মন্দরী বলল, এ কথা কেন বলছেন বল তো! উনি কি ওর টাকা-পয়সা আশ্রমকে দান করবেন বলেছেন? না, ওরা সেই আশায় ওঁকে নিয়ে যেতে চাইছে?

বুঝতে পারছি না কিছু।

তাহলে খোঁজ নিয়ে জানতে হয়।

বলে ভবানীপুরীর কাছে গিয়ে মন্দরী জিজ্ঞেস করল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব মাসিমা?

কী কথা মা?

যোমকেশ মেসোমশাই নাকি বহেরা মাতার আশ্রমে যাচ্ছেন?

তাই তো শুনেছি।

কার কাছে শুনেছেন?

কাল রাতে বহেরা মাতা বুড়োকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বন্ধ ঘরে দু'জনের কথাবার্তা হয়েছে। বুড়ো বোধহয় উকিল লিখে দিয়েছে ওঁকে। ওঁর সঙ্গে একটা ছেলে থাকে শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

কী কথা হয়েছে দু'জনের?

তাতো জানিনা মা। তার শিষ্যরা বলছে যে, বুড়ো তাদের আশ্রমে যাচ্ছে। তারাই নিয়ে যাচ্ছে।

সন্তর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেও যোমকেশবাবুকে ধরে রাখতে পারল না। কাউকে কাঁদিয়ে, কাউকে হাসিয়ে বহেরা মাতার সঙ্গে যোমকেশ যাত্রা করলেন।

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

হাট শিমলা টাঙ্গাইল তন্তুবায় উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম: হাট শিমলা

পোঃ সমুদ্রগড়, জেলা: বর্ধমান

টাঙ্গাইল, সিল্ক, সুতী ও তসর কাপড় প্রস্তুতকারক।

অনিলচন্দ্র বসাক
সভাপতি

সুধাকান্ত বসাক
সম্পাদক

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন লিমিটেড

হেড অফিস : সি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন (চারতলা)
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩
ফোন : ২৭-৬১৭৫, ২৭-৬১৮০

আবাসন সমস্যার মোকাবিলায় সমবায় আবাসন সমিতি গঠন করাই হ'ল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সহজ পথ।

বর্তমানে প্রাথমিক আবাসন সমবায় সমিতির সভ্যগণ নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী গৃহনির্মাণে ঋণ পেতে পারেন।

সভ্যের ছক হিসাবে শ্রেণী বিভাগ	প্রয়োজনীয় কার্পেট এরিয়া সীমা	প্রতি বাড়ি/ফ্লাটে ডিপোজিট সীমা (কার্পেট হিসাবে)	ঋণ দানের সর্বোচ্চ সীমা ঋণ ছাড়া বাড়ির/ফ্লাটের দামের শতাংশ হিসাবে	মাসিক আয়ের পরিমাণ হিসাবে	টাকার পরিমাণ হিসাবে	পেয়ার ভ্যালুর সীমা (অংশের পরিমাণ হিসাবে কিন্তু ৫০০ টাকার গুণিতকে)
			ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ঋণ			
অনগ্রসর	৭,২০০ টাঃ পর্যন্ত	৪০০ বর্গফুট	১০ শতাংশ	৪৮ মাসের আয়	১৭০০০ টাকা	৪ শতাংশ
নিম্নবিত্ত	৭,২০০	৬০০	১০	৪৮	২১০০০	৫
মধ্যবিত্ত-২ শ্রেণী	১২,০০০	৮০০	৮৫	৪৮	৪৮০০০	৬
মধ্যবিত্ত-১ শ্রেণী	১৮,০০০	১০০০	৮০	৬৮	৭০০০০	৮
উচ্চবিত্ত-২ শ্রেণী	৪২,০০০	১২০০	৮০	৬৮	৮০০০০	১০ ,,
উচ্চবিত্ত-১ শ্রেণী	৮০,০০০ ,, ,,	১২০০	৭০ -	৩০	১২০০০০	১২ ,,

কিস্তি :—নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে সুদের হারে রিবেট দেওয়া হয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন :

শাখা অফিস :	দুর্গাপুর	মেদিনীপুর	শিলিগুড়ি	মালদহ
রাণাঘাট.	সিটি সেন্টার)	শহীদ ক্ষুদিরাম বোস রোড	৫০ জগদীশ বসু রোড	মালদহ
দেবনাথ মার্কেট.	দুর্গাপুর ১৬	ফোন : ৭৫৬	হাকিমপাড়া	ষ্টেশন রোড,
পো: রাণাঘাট	ফোন : ৫৮৬২		ফোন : ২৩২১১	সর্বমঙ্গলা পল্লী
জেলা : নদীয়া				পো: ও জেলা : মালদহ

আসানসোল	কলিকাতা	শ্রীরামপুর	বহরমপুর
৭৩, বাবলা রোড,	(হেড অফিস সংলগ্ন)	২১/১, এ জে এম পা সিট	৬৬, সিলখানা রোড
আসানসোল-১	মালদহ ষ্টেশন রোড (সর্বমঙ্গলাপল্লী)	শ্রীরামপুর, হুগলি রোড,	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
বর্ধমান	পো: ও জেলা—মালদহ	ফোন : ৬২-১৬১১	

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

নোহাচুর বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম—বড়গাছি পোঃ—মোরাল জেলা—বর্ধমান

কৃষকের স্বার্থে কৃষি ঋণ, কাপড়ের ব্যবসা, বন্ধকি ঋণ (কাঁসা, পিতল) ফসল বন্ধকি ঋণ, গুল্ম সেচ ব্যবস্থা, সেভিংস প্রভৃতির কারবার করা হয়।
কৃষকের সেবা আমাদের মূলধন।

দি সিউড়ী স্ক্রেডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাপ্ত লাইসেন্স নং U. B. D. W. B. S O P
বীরভূম জেলার শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত
ফোন নং: সিউড়ী ৫১৭, স্থাপিত: ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমপ্রকার আমানতের উপর ১ শতাংশ বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, লাঙ্গলাদি গরু, বলদ চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহু প্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমবায় আমানত বীমাকরণ স্কীমের সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়। ৫। বৈদেশিক ভ্রমণ প্রবলেমের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কর্ম দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

ভাণ্ডারের বর্তমান গ্রাহক চাঁদা

প্রতি সংখ্যার মূল্য		৩.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা (সডাক)		১৫.০০ „
বার্ষিক চাঁদা (শারদীয় সংখ্যাসহ)		৩০.০০ „
আজীবন চাঁদা (সডাক)		৫০০.০০ „
শারদীয় ভাণ্ডার '৯১	:	২৫.০০ „

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

—a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise books, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative oil mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-opreative Societies.

Smt. CHHAYA GHOSH
Chairperson
Board of Administrators
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সংস্থার অন্যতম অংশীদার]

হেড অফিস : পোস্ট : তমলুক, জেলা : মেদিনীপুর

(বর্তমানে ১৭টি শাখার মাধ্যমে কর্মরত)

সুযোগ-সুবিধা :

আমানতের উপর সুদের হার ½ শতাংশ বেশি।

আমানতের এই টাকা তমলুক, ঘাটাল মহকুমার স্বার্থে নিয়োজিত।

স্বল্প ব্যয়কারী ঋণ ও সরকারের সুযোগ।

আমানত বীমা প্রকল্পের দ্বারা সুরক্ষিত।

স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ বিনিয়োগ জেলার অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

আগামী দিনের লক্ষ্য :

পানচাষের উন্নয়নে মধ্যমেয়াদি ঋণ দান।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নীকরণ।

নাবার্ড অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নে অর্থ লগ্নীকরণ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস
চেয়ারম্যান

শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তি
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

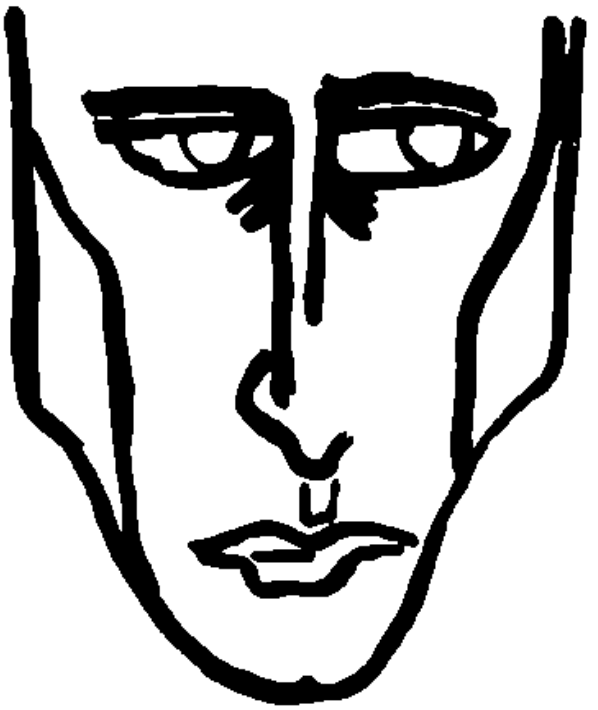

আশাবরী

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মশারির বাইরে চারদিক জুড়ে ঘোর রেখে সেছনের তিরিশটা বছর দেখেছে ইন্দ্রনাথকে সারাটা রাত। আর মশারির ভেতো ইন্দ্রনাথ এবার মন-দেহ-সমাসহ নোতুন একটি জীবনের দিকে পা বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে দেখেছে। এক্ষেত্র, ইন্দ্রনাথের পক্ষে নিজেকে দেখা একটি পূর্ণতার সামনে রেখে দেখা বলে নিশ্চয় মনে হয়নি। এবং মনে হচ্ছে—অতীতের তিরিশ বছর জীবনকাল অসম্ভব কতগুলি দিনের সমষ্টি মাত্র এবং আজ, আজ যে দিনটির সূচনা হতে চলেছে তার এই সন্ধিকাল জুড়ে অন্তিত্বে অন্ধকার এখনও জড়িয়ে রয়েছে; কয়েকালের মধ্যেই যে অন্ধকারের অবসান ঘটবে; একটি ঝলমলে দিনের জন্ম হবে,

সেই
চন্দ্রবেলার
অপূর্ণতা যার কিছু পরিচয়ে বলে গেছে,
কিন্তু
করতে পারেনি ইন্দ্রনাথ।
বিশ্বাসের কাছে নতি স্বীকার করেছি না,
অথবা বিশ্বাস এর মনে হয়েছে আত্মবিশ্বাসের
অবলম্বন।
বিশ্বাস। বিশ্বাস এই
ইঙ্গিত দিয়েছে অন্তরে, এবং তার স্ত্রী
তাকে অস্তিত্বের অবিশ্বাসে অন্ধকারের
বড় অংশ ঘুচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়ে।
'কীসের আয়োজন?' প্রশ্ন
নিজে জিজ্ঞেস করেছে ইন্দ্রনাথ।
রাত যখন কাউকে ভালোবাসে তখন
সেই প্রিয়জনের মধ্যে একটি রহস্যময় সন্তানের

হয়ে; সারাজীবন ধরে মানুষ সেই রহস্যের
মধ্যে ডুবে থাকে আর কাটাবার চেষ্টা করে থাকে।
এইসব কারণেই পূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
কি না, মানুষ এবং তাদের
প্রাত্যহিকতার পরিচয়ে মানুষ সে যে
মনগড়া হোক, প্রায় সেখানেই
থেমেছে, পরিবর্তনের মধ্যে যতটুকু যা সাড়া
দিয়েছে হয়তো একলাপে
রহস্যের গা ছোঁয়া, তুল বিনয়ের নয়।
এর পরই ইন্দ্রনাথ
শয্যা নিয়েছে আর সাড়া পাবার
পর মুহূর্তে, পরিচয়ের মধ্যে আর শব্দ
সাড়ানো ছাড়া বাকী

ওঠে এবং বলেছে।
ওইরি ভাকে, 'ওঠো... ওঠো
ঘুমিয়ো না ভাই, পরিবর্তনের
ছোঁয়া ইচ্ছাকৃত

বেড়িতে কাটাতে হয় বলে ইন্দ্রনাথ ডান পাশ থেকে বাঁ পাশ ফেরে। পাশ বালিশের মধ্যে সোপনীয়তা খুঁজে পায়।

'তোরের দিকে ঘুম আসে, আজ এমনিই হয়, কিন্তু ওঠো ভাই, লক্ষ্মী সোনা, আর দেরি করো না : সবাই উঠে গেছে দাখো···' বড় বউদি তাগিদ দেয়।

লম্বা, সুপুরুষ, ঘাড় কুঁজো, ব্যাকব্রাস করা ঘাড়ায়ি পাকাচুল, চশমা চোখে পিতার মুখখানি দরজার বাইরে।

'ওঠে নি এখনও···ও বউমা, ডাকো, শুভকাজ তো দিনভর থাকবে না!' বাস্ত পিতা উষ্মা প্রকাশ করেন।

'হ্যাঁ, বাবা, উঠেছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' বড় বউদি আশ্বাস দেয়।

এবং এই আশ্বাসবাণী যদিও অতি সাধারণ, এ হলো একটা কথার কথা মাত্র, তবু এই ব্যস্ত, প্রকারণ উষ্মিল বৃদ্ধ এতেই নির্ভর করেন। বৃদ্ধ একা নন, গোটা সংসারই এই একটি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

দরজার কাছ থেকে সরে যান বৃদ্ধ।

কাল সন্ধে থেকেই বৃদ্ধের তৎপরতা শুরু হয়েছে। ভোরে পঞ্জিকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যাতে শুভকাজ—গাত্রহলুদ সম্পন্ন হয়, সময় অতিক্রম করে একটা মুহূর্তও না গড়িয়ে পড়ে সে জন্যে তাঁর সতর্কতার অন্ত নেই। রাত আটটার মধ্যেই ছেলে মেয়ে শুয়ে পড়তে নির্দেশ ছিল ইন্দ্রনাথের প্রতি। হালকা লুচো ভাত, মাংসের ঝোল, দুধ কলা,—এই ছিল তাঁর নির্বাচিত খাদ্যতালিকা। কারণটাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এইভাবে : শরীরের ওপর দিয়ে কাল ধকল যাবে কম না। পাকা খাদ্য সবচেয়ে বেশি শক্তি ও ধৈর্য যোগায়; মন শুদ্ধ থাকে। '···গুরুত্ব হলো সবচেয়ে বড় সাধনা কী বলো বড়বউমা,' কথাটা বড়বউদির প্রতি নির্দিষ্ট হলেও সেখানে ডেরেছিলেন গোটা সংসারকে। এবং বড়-বউদি যেন বৃদ্ধের মূল যেখানে জল বা সার যা-ই ঢালা হোক না কেন, তাঁর সংসারবৃক্ষে তা ছড়িয়ে পড়ে, এটাই অভিজ্ঞতা।

'ভ্রন্‌কাটলেটটা তোর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মেজদা, এর পর দেখবি আলপনা আর ছোট ঘামী কেড়ে নিয়েছে···ও বড় বউদি, বাবাকে কাটলেট দাওনি!' ছোটভাই চন্দ্রনাথ বিপরীতমুখো জীবনযাত্রার উজবাসী ঘোষণা করে।

রেখে যান বৃদ্ধ। কথা মুখে রক্তের ঝলক দেখা দেয়। 'উজবে গেছে···দেবে সব নষ্ট করে দেবে···' মনে মনে আগুনের ঝলা গেলেন। বিজ্ঞতাও সেই আগুনের সঙ্গে।

'ওরা এসব একটু করে এমন দিনে। ও নিয়ে আপনি উদ্বাস্ত হবেন না.' পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বড়বউদি বাবাকে শান্ত করে।

সংসারের মধ্যে আর একটি সংসারের জন্ম ঘিরে উৎসব। বৃদ্ধ পিতা জানেন যে অনুশাসন এখানে খাটাতে যাওয়ার অর্থ ধাতাসকে শাসিত করার চেষ্টা। কিন্তু ভুলে গেছেন। নিজের জীবনকেই মানুষ সবচেয়ে বেশি ভোলে। এক একটা দিন যায় আর মানুষ নিজেকে ভোলে। এ যদি না হতো তাহলে এ সংসার কেবলই বিশৃঙ্খলার স্থান হয়ে থাকতো।

তাই, শুতে শুতে সেই রাত ঘরে ফেরে দেড়টারও বেশি। অভিমান করে বাবা শুতে গেছেন রাত দশটায়। অবশ্য অন্যদিন রাতে রাতে যেমন অভিমানে অগ্নিজল ত্যাগ করেন, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দেন শুভের বইপত্তর নিয়ে : পায়জামা পাঞ্জাবিটা পর্যন্ত ছাড়েন না সারাদিন; সারাদিন নির্বাক, সারাদিন মৌন পাহাড়; অবশেষে একমাত্র বড়বউদির কাছে দু-চার ফোঁটা অশ্রুসহ আত্মসমর্পণান্তে একটু একটু করে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসেন, কাল ওতদূর গড়ায় নি ব্যাপারটা। শুধু একটু কম কথা বলেছেন রাত ন'টার পর থেকে এবং পরবর্তী নির্দেশ দান থেকে বিরত থেকেছেন।

'সুপর্ণারা যে আজও এল না বাবা।' বড়বউদি একটু চাপ সরাতে জিজ্ঞাসা করেছিল।

'যার যা খুশি করুক!'

এই সামান্য উদাসীনতায় বিজ্ঞতা ঢেলে দিয়েছিলেন।

'আশীর্বাদের থালা দিয়ে গেছে সুরেন-বাবু, দেখলেন তো না, কী সুন্দর গুছিয়ে!'

'থাখো তোমরা তাতেই হবে আমার!'

এই স্বরে একটু খুশি হয়েছেন যে থালাটা খুব ভালো গড়া হয়েছে তা এই কথার দ্বারা দিয়ে বুঝিয়ে দেন। তার মনের ভার একটু হালকা হয়ে আসে।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধার একটা জোর সম্ভাবনা ছিল সকালের দিকে। গণ্ডগোল মতাদর্শ নিয়ে। পাকাকথার সময় ঠিক হয়েছে বরযাত্রী যাবে পঞ্চাশ জন। ছোট ছেলে চন্দ্রনাথের যে যে বন্ধুরা এ বাড়িতে নিয়মিত আসে, আসতে আসতে সংসারেরই একজন হয়ে উঠেছে তাদের সংখ্যা জন পনের। তাদের ধরেই পঞ্চাশ। এক্ষেত্রে আত্মীয়দের কাউকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা করা হয়নি। সকালে সে তার মত ব্যক্ত করেছে, বরযাত্রীর সংখ্যা দশ অতিক্রম করাটা অসভ্যতা। তোমার প্রিয়জন যারা তাদের তুমি খাওয়াতে নিজের খরচায় যত খুশি খাওয়াও, অন্যের কাঁধে তোমার প্রিয়জনের ভার চাপাতে যাওয়া শোষণমূলক কাজ।'

'আমার ছেলের বিয়ে কি নিঃশব্দে হবে?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও বাবা—তোমার প্রিয়জনের ভার অন্যে নেবে কেন?'

'সবাইকে সামনে রেখে একটা শুভকাজ, এতে ঘরে থা-দাদের কি আছে?'

খাওয়াতে খরচা নেই? খরচা অন্ত তা চাপিয়ে দেওয়া, একে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে বাবা? সামন্ততান্ত্রিক অন্ধতা ছেড়ে খোলা মনে একটু বিচার করো তো।'

'তুমি নিঃশব্দে তোমার শ্বশুরে শাশুড়িকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করো, আমি কিছু বলতে যাবো না, তোমাকে ঘিরে আমার কোন আশা নেই।'

'ছেলে ছেলে তো! সবটাতেই রাগ তোমার!'

'আমি সামন্ততান্ত্রিক আর তুই মহা-বিপ্লবী—হুঁ, ছেড়ে তো টুকরো হচ্ছিস সব, স্বার্থপরতাও কম দেখিনি তোর কখনের, পারবি সব কিছু ত্যাগ করতে দেশের জন্যে ?'

'প্রাণ পর্যন্ত !'

'দিতে না নিতে ?'

'দুটোই।'

'মূল্যায়ন করেছিস কোন্‌টার জন্যে কোন্‌টা করেছিস ?'

'থামবে তোমরা, সত্যি, এর কি মীমাংসা কিছু আছে ! আজ থাক বাবা !' ইন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করে।

'খেয়েই তো আছি। একেবারে থামতেই তো চাই বাবা। কিন্তু আমি চাইলেও তো হচ্ছে না তা !'

'সত্যি সত্যি তুমি চাও অথবা সেন্টিমেন্ট !' হা-হা হাসতে হাসতে চন্দ্রনাথ উড়িয়ে দিতে চায় পিতার ভাবাবেগ।

'আমি মরলে তোরা যে খুশি হোস··· এত খুশি জানতাম না, হে ঈশ্বর !'

'বাবা !' বড়বউদির চোখ ছলছলায়।

দ্রুত স্নান ত্যাগ করে চন্দ্রনাথ। কয়েক মিনিট বাদে বেরিয়ে আসে। কালো প্যান্টের ওপর কাজ করা খদ্দরের পাঞ্জাবি। পেছনের দিকে চুল একটু দীর্ঘ। বেশ লম্বা, সুঠাম স্বাস্থ্য। চোখে চশমা। টানা দুটো চোখ। মুখের গড়ন প্রায় বাবার মতো। সুপুরুষ বলা যায় একবাক্যে। সঙ্গে আভিজাত্যের দীপ্তি বাড়িয়েছে।

'বড়বউদি, ফিরতে দেরি', বলেই সে পৌরুষবন্ত পায়ে হেঁটে যায়। এতক্ষণের এইসব কগড়াঝাঁটির সামান্য দাগও পড়েনি যে কোথাও, তা স্পষ্ট।

শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন সম্পূর্ণ করেই বড়বউদি ইন্দ্রনাথকে ঘুম থেকে তুলতে এসেছিল। এতক্ষণে বড়বউদির সঙ্গে একত্রিত হয়েছে মায়ের মতো বোন আলপনা, বড়দির মেয়ে কাকলি, ছোটমামী এবং পাশের বাড়ির বৃদ্ধিবউদি। সবাই মিলে ইন্দ্রনাথকে ঘিরে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে। কাকলির বর সুমিতকে এরা ঘরে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। সে ছোরা একটু শান্ত প্রকৃতির। এতসব বাস্তিষ্ঠাত্রীর মধ্যে বেসামাল অবস্থা তার। বৃদ্ধি বউদি তীক্ষ্ণ সূচের খোঁজকে তীব্র ঠাট্টা করতে পারে। তার কথার উত্তর দিতে কূটনীতিকেরা হিমসিম খাবে। ছোটমামী সম্পর্কে মাতৃস্থানীয়া হলেও বয়স কম বলে এর মধ্যে মিশে গেছে। আলপনা ও কাকলি সমবয়সী হলেও আলপনার ঘিয়ে ভাজা এখনও। বোন হিসেবে আলপনা যত দূর যেতে পারে ভাগ্নী হিসেবে কাকলি সেখানে যেতে পারে না। তবু সবাই মিলিয়ে একটা খুশির বাতাবরণ। ইন্দ্রনাথ আজ কার মুখ দেখে উঠবে, চোখ খুলেই কার মুখ দেখবে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। বস্তুত এ একটা স্পর্শকাতর বিষয়। যেন ভবিষ্যতের অনেকটা যাচ্ছে এই মুহূর্তে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

বুদ্ধি করে আলপনা একখানা আয়না চোখ বুজে থাকা ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'আত্মদর্শনই শ্রেষ্ঠদর্শন।'

'প্রকৃতি দর্শন শ্রেষ্ঠতর দর্শন !' বৃদ্ধি বউদি সুর যোগায়।

'একটি তো তাকে পাওয়া যাচ্ছে না যে !' ছোটমামী যোগ দেয়।

টেবিলের ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট ছবিটা তুলে এনে কাকলি বলে, 'বোধহয় এর কোন বিকল্প নেই, কি বলো !'

চোখ মেলে ইন্দ্রনাথ এবং খাট থেকে নেমে সামনেই দেখতে পায় আলতা রাঙানো একজোড়া পা। একটু ওপরে জরির পাড়। ঘরের টিউবলাইটের সামান্য আলো ঠিকরে পড়েছে সেই পায়ে। এই পা ইন্দ্রনাথের বহু পরিচিত। ইন্দ্রনাথের নিষেধিত সত্তার সঙ্গে তার যোগ বহুদিনের।

আকুল প্রণাম করে ইন্দ্রনাথ।

'করো কি···করো কি···যা সবার আগে, বাবা, তারপর তো অন্য সব', বড়বউদি বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। চোখ বুজে আসে। ঘোলা যায় অন্তরের পাপড়িগুলি একত্রিত করে আশীর্বাদ করছেন।

'সুদূর আকাশে থাকলেও পাখি তার বাসা চেনে', বৃদ্ধিবউদি খুব সংক্ষেপে উচ্চারণ করে।

আলপনা যে ঘরতে পেরেছে ব্যাপারটা এটা তার চোখে ফুটে ওঠে।

এক লাইনে চারখানা ঘর পরপর। প্রথম ঘর বৈঠকখানা। বইয়ে ঠাসা। ক্লাসিক গ্রন্থের সম্ভার শিল্পের। এর সঙ্গে মিলেছে চন্দ্রনাথের সংগ্রহ মার্কুইস, হোলমে, সার্তর, মাও-জে-দং, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন ইত্যাদি। ইন্দ্রনাথের বুক কেসটি ভিন্ন। সেখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, তারাশঙ্কর, সুধীর চক্রবর্তী ইত্যাদি। বড়টান টিভি। সোফা। কিছু সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি মস্ত বড় আর্কাইভ বাঁধানো ছবি বেরালে। একটিমাত্র সুদৃশ্যসম্পন্ন ক্যালেন্ডার ঝুলছে। বিদ্যুতের ফোকাটি স্থির। এ ঘর ইন্দ্রনাথের সাজানো। সঙ্গে বড়বউদির হাতের স্পর্শ। পরের ঘর চন্দ্রনাথের। খানিকটা বিশৃঙ্খল। তৃতীয় ঘর বড়বউদির। চতুর্থ ঘর রান্নাঘরের। মুখোমুখি সবচেয়ে বড় ঘরখানা ইন্দ্রনাথের। পাশে স্নানাঘর, পর পর দুটো বাথরুম। মধ্যে দীর্ঘ ডাইনিং।

শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন হয়েছে মায়ের ঘরে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কাচাবৃত্তি ও নোকুন ধুতি গায়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ সেই ঘরের দিকে হেঁটে যায়। মুখে কোন কথা নেই। যেন একটা সংকোচের পুরু আস্তর কাটিয়ে কাটিয়ে সে চলেছে। হাত ধরে আছে বড়বউদি। পেছনে অন্য সবাই। শঙ্খ বাজছে। কথায় ভুলভ্রান্তি। মাথা নত ইন্দ্রনাথের।

ইন্দ্রনাথের এই অবনত মস্তক ও সংকোচের পরত যে কি তা জানে দু'জন—ইন্দ্রনাথ

নিজে আর বড়বউদি। আর জানে একজন। তবে তার জানা অন্য রকমের। সে চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ বলে, 'পৃথিবী একটা বিচিত্র স্থান, এখানে যা চিরদিনের জন্য শয্যাশায়ী বলে জীবন কারো ফেলে থাকে না। যা তো মেজদা, বিয়ে যা কর; তুই তো আর পৃথিবীটাকে বদলাতে আসিস নি!'

'পৃথিবীটা বদলাতে তুই আই এ এস পরীক্ষা দিয়েছিস! আমাকে দেখাস না তো!' ইন্দ্রনাথ ঘা দেয়।

'মেজদা, তুই বাবার মতো হয়ে উঠেছিস, সব সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ করছিস! তুই তো জানিস, তা হলে—'

'তুইও তো জানিস—মা কোনদিন আর উঠে দাঁড়াবে না, বড়বউদি চিরকাল একা থাকবে, এর মধ্যে আমি পূর্ণ সংসার করবো, —বিবেক নেই আমার!'

'সংসারের পূর্ণ বার্থতার মধ্যেই তো আর একটা সংসারের জন্ম, এই তো নিয়ম মেজদা!'

'তোর আদর্শানুযায়ী কথা হলো এটা?'

'আমার আদর্শ সম্বন্ধে তোদের ধারণাটা বস্তুমূল থেকেই গেল।'

'ও, মার্কস আর ভারতীয় দর্শন মিলিয়ে নিচ্ছিস আজকাল···বেশ! বেশ! তাই, সেদিন তোর টেবিলে দেখলাম গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের চেতনার আরোহিণী বইখানা; এসব পড়ছিস!'

'ওটা কি মার্কস আর ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় নাকি?'

'না, মার্কস তো তোর মধ্যে আছেই।'

'যাক, তুই বিয়ে তা করবি না কি?'

করতেও পারি নাও করতে পারি, ঠিক করিনি।'

কান্তির সঙ্গে তোর সম্পর্কটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না, বুঝলি?'

'বিয়ে হতে পারে হয়তো!'

'তো, বিয়ের আগে ওর ধূমপানের অভ্যাসটা যদি ছাড়াতে পারিস, দেখিস।'

'কেন যে?'

'বাবা বেঁচে থাকতে তার বউমা সিগারেট খাবে—'

'তুই আহত হবি কি?'

'তা-লো সাধবে না, এইটুকু বলতে পারি, আর কি বলবো বল?'

'বড়বউদি কি বলে জানিস···সন্তোষের মূল্যায়নের কাছে সে নাকি স্বীকার করেছে!'

'বিশ্বাসের স্বাধীনতাটা বড়বউদির এত কড়াকড়ির মধ্যেও যায়নি, না!'

বড়বউদির বিশ্বাস, স্বাধীনতা ইত্যাদি খাঁটি ভারতীয়।'

'বড়দা ছিল অথচ ফরাসী জীবন চর্যার মানুষ, কী আশ্চর্য না!'

বিয়ে ঠিক হবার আগে বাবার সঙ্গে ইন্দ্রনাথ খোলাখুলি আলোচনা করেছে এ বিষয়ে। বলেছে, 'বাবা, মা হো কোনদিন আর উঠে বসবে না: আমার বউ এসে এই চিররুগ্না শাশুড়ির সেবা করতে কতদিন পছন্দ করবে? এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত মা একটা মানসিক আঘাত পাবে না তো?'

'যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি ঠিক করেছি, সে তোমার মাকে আঘাত দেবার মেয়ে নয়।' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বাবা বলেছিল।

'কি করে সুনিশ্চিত হলে?'

'অভিজ্ঞতা!'

'অভিজ্ঞতার সাপারটা ঠিক এসময়ে সবটা মিলছে কি?'

'রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাটা গোলমাল করছে, এ-কথা বলতে চাইছো তো?'

'ওটা কি বিচ্ছিন্ন, বাবা?'

'যদি বলি, আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন ওটা, মানবে?'

'আমাদের জীবন তার ভিত্তিতেই ঠিক ঠিক বাঁচিয়ে আছে, বলছো?'

অনেকটা! সামান্য যে পরিবর্তনটুকু তা মূলে স্পর্শ করেনি।

'যেমন?'

'যেমন—তুমি পাঁচ বছর ইংল্যাণ্ডে থেকে এসে অন্ধ মায়ের কথা ভাবছো, আমার কথাও ভাবো, তবে বলো না আমার সামনে, তোমার বউদির কথা ভাবো, ছোট ভাইয়ের কথাও—'

হাসে ইন্দ্রনাথ। এমন স্পষ্ট মূল্যায়ন ভাবা যায় না। ছোটভাই চন্দ্রনাথও ঠিকই বলে তবে তার বয়সের এবং তাকে ঘিরে সদ্যোস্নাত একটা ইতিহাসের প্রভাব যা এখন ফের আর একটা উপলব্ধির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে,—সবই ঠিক, সবই সত্যি, বড়বউদির বিশ্বাস ও মমতাও ঠিক, মায়ের ক্লিষ্ট অন্ধ যন্ত্রণা বেঁচে থাকাটুকুও ঠিক,—কেমন যেন একটা নক্ষত্ররা আকাশ, সোনালা, বাতাস, বৃষ্টি, কান্না, কী কী কী বিচিত্র পৃথিবী। এই পৃথিবী, ইন্দ্রনাথের এই পৃথিবীতে প্রকৃতি আসছে, বড়বউদির পাশে মেজবউদি হবে সে চন্দ্রনাথের, মেজ-বউমা হবে সে বাবা ও মায়ের,—ইন্দ্রনাথের হবে—তুমি!

তুমি সরা! তুমি সরা···হো—হো—'তুমি বেদবাদিনী ধরের ঘরণী / তুমি সে নয়নের তারা···' চণ্ডীদাস উদ্ধৃত করে ইন্দ্রনাথ।

মনে পড়ে যায় এক ঝলক দেখা তার ভাবী স্ত্রী প্রকৃতিকে। দেখতে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, বড়বউদি আর বন্ধু চৈতনা। বাবার ইচ্ছে ছিল, চন্দ্রনাথও যাক। বলে-ছিলেন, 'ওটা বাইরে যা-ই হোক, আসলে সতাখীর বাস্তবতার প্রতিরূপও। পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রনাথ, বাবা, আমার একটা কথা শোন, যা, দেখে আয়, তুই একটা মতামত দিলে ভা—'

'পাশাড়ির ওপর থেকে হাত সরাও, নিজে ফুটতে যাও বাবা!'

মুচকি হেসে বড়বউদি বলেছিল, 'থাক বাবা, ওর বেত্রে কাজ নেই।'

'থা-ক্, তা হলে।'

পৃথিবী সমস্ত ভাষা কোরকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল বলে ইন্দ্রনাথ নামক একটা

সম্ভার জানিয়েছিল, আর কিছু নয়। দেখে ছিল বিনা প্রকৃতিকে তা সে নিজেই জানে। ঘর জানিয়েছিল ইতিবাচক।

দক্ষিণজলের জন্যে এখন ঘরে যে আয়োজন তা শুশ্রূষার সীমায়। মঙ্গলদীপ জ্বলছে ঘরে। চন্দন রয়েছে রেকাবিতে। সামনে বরণডালা তার আনুষঙ্গিক উপচারে পরিপূর্ণ; কার্তালি ও বৃত্তিবউদির মুখের কাছে লণ্ঠন; পিঁড়িতে আলপনা; মেঝেতে চওড়া আলপনা; পাশেই শয্যায় অনেকগুলি বালিশ দিয়ে মা'কে একটু বসানোর আয়োজন; তাঁর চুল আঁচড়ানো; চওড়া লালপেড়ে শাড়ি; গলায় নারকেল ফুল সোনার হার; কপালে সিঁদুর; চন্দনের কাছে সিঁদুরের সানানো গুঁড়ো; ঠোঁট একটু একটু কাঁপছে বাসনার অথবা শুভানুধ্যানের শুনোতায়; চাদরের প্রান্তে দু'খানি আলতা মোপানো পা; চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে ধূপ।

পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ইন্দ্রনাথ মায়ের ডান পাশে এসে দাঁড়ায়। এখনও সেই নতমুখ। দু'চোখ ছেয়ে তার জল গড়িয়ে নামে। বড়-বউদি প্রথমে নিজের আঁচলে তার চোখ মোছাতে গিয়ে ভুল সংশোধন করে নেয়, —মায়ের আঁচল টেনে নিয়ে তাই দিয়ে চোখ দু'খানি মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'কষ্ট হচ্ছে কি ভাই?'

'মঙ্গল হোক···মঙ্গল হোক···' বাবা পেছন থেকে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে।

মা যা বলে, হয়তো বলেও না, উপলব্ধি করে, তা শোনা যায় না বটে, তবে তা সকলেই জানে।

দক্ষিণজল মায়ের সামনেই সম্প্রদান হয়। সম্প্রদানেই বলা উচিত তাকে।

'শেষ ভরে দই খৈ খাইয়ে দাও বউ মা, সারাদিন উপবাস, খেয়াল রেখো,' বাবা স্মরণ করিয়ে দেয়।

র-সিল্কের পাঞ্জাবি, কাচানো ধুতি, আঁচড়ানো চুল,—এসব সাজসজ্জা কোন্ ফাঁকে বড়বউদি করিয়ে নিয়েছে, তা কেউ জানে না।

'দাদু, তোমাকে যা দেখাচ্ছে না!' নাতনি কার্তালি আচার চাটার মতো শব্দ করে।

'আচার চাইলে যেন মনে হলো!' বৃত্তি-বউদি টুক করে মন্তব্য করে।

অন্য কেউ তো এর রেশ টানতে পারে না, সম্পর্কের জটিলতা এখানেই, তাই এমন ব্যাপারটা জমবার শেষ হলো। এবং বাবাও ছেলেমেয়েদের সামনে নাতনির এই ঠাট্টার জবাবটা দিতে সক্ষম হলেন না।

বললেন, 'চন্দনাথটা উঠলো না, এল না একবার!'

'উঠেছে', আলপনা জানায়।

'কি করছে উঠে?'

'হি-হি-হি—ইংরেজ পদাবলী পড়ছে সারারাত।'

'বাবার কিরে, ছোট ভাই পড়ছে পদাবলী, সত্যি!' বৃত্তিবউদি কিছু বলতে চায়।

'পূর্বাচার্য!' ও ঘর থেকে চন্দ্রনাথ নিজেই জানায়।

দক্ষিণজলের পাট চুকতে ভোর দিনের আভাস পায়। মঙ্গলদীপ জ্বলতে থাকে। ধূপের ধোঁয়া, শাঁখ, উলু রাতের শেষ অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে যেন। হঠাৎ শান্ত একটা পরিবেশ নেমে আসে। মায়ের পেছন থেকে বালিশ নামিয়ে নেওয়া হয়। মা ফের শয্যায় শায়িতা হন। পাখিরা যে যেমন পারে ডাকে। রাতের বাতাস সরে গিয়ে দিনের বাতাস জোর রাশিনীতে বইতে থাকে।

বিছানায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না ইন্দ্রনাথের। ঘামে উঠে আসে। বড় ভালো লাগে ভোরের হাওয়া। ভোরের হাওয়া যেন পূর্ণিমার চাঁদ। নরম, নরম, নরম, রসে, স্নিগ্ধতায়, অফুরন্ত তার আবেদন।

কিন্তু, ভোরের এই শুভ্র স্নিগ্ধ আভাসে ছাদের এককোণে যাকে স্থির মেঘাঙ্গের বরণবেদিতে টিলার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ইন্দ্রনাথ দেখতে পায়, সে বড় বউদি। মঙ্গলাচরণের পর এই বিষাদাচরণের আয়োজনটুকু তার নিজের জন্যে কেন এই নিভৃতে রচিত হয়েছে, তার আভাসমাত্র ইন্দ্রনাথের জানা, বাকিটুকু চির অজানা। ইন্দ্রনাথের আগমন যে টের পায় নি তা বুঝতে পারে ইন্দ্রনাথ। এ ধ্যান কি ভাঙা যায়? ভাঙা উচিত? এই শুভদিনের পক্ষে এই বিষাদধ্যান সহ্য করা যায়? প্রকৃতির আগমন পথে এর ভূমিকা কি? একটি সন্তোষের গর্ভে আর একটি সন্তোষ যে আজ ভূমিষ্ঠ হবে, যে হাত এই আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে, সেই হাত তার নিজের অশ্রু দেখে সিক্ত হয়ে উঠেছে,—এও কি দক্ষিণজলের উপচার! এর মধ্যে কি ইন্দ্রনাথের জীবনে সুখের প্রার্থনা হয়ে গেছে?

'ওমাগো বড়বউদি!'

'ওদিকে যে বেলা!'

যেন ছাদে উঠে এসেছে।

'এমনি একটু—' বড়বউদির গভীর জলমগ্ন।

'কেন?'

'সবকিছু বুঝবে এমন দাবি কেন করো ভাই? এই তো আমি···আমি সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করছি, কিন্তু ছেবো না।'

বড়বউদি বলেনি একথা। তবে বাস্তবে তার সেই আয়োজনই।

নদীয়াবাসীর সেবায় ৭৪ বৎসর

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৯টি শাখা কার্য করিতেছে

কার্যকরী মূলধন :	২২২২৮০ লক্ষ টাকা
কৃষিতে লগ্নি	২৮৬০৩
আমানত	১৭২১০৩
শেয়ার	২১১৯৮

প্রদেয় সুদের হার : অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি।
ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আমানত প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় বিনিয়োগ করুন।
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বীমা প্রকল্পের অধীন ●

(এখন এক বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে)

প্রস্তর যুগের অস্ত্র

দিব্যেশ লাহিড়ী

টেবলের ওপর পাথরটা রাখা ছিল।

একটা এবড়ো-খেবড়ো হলদে রঙের ছোট নুড়ি পাথর। অতি সাধা-মাটা। কৌলিন্য ও বিশেষত্বহীন।

—বলুন তো এটা কি পাথর?

—কি আবার, একটা সাধারণ পাথর, যে-কোন পাহাড়ি এলাকার রাস্তায় কিংবা নদীর ধারে পড়ে থাকে।

কথাটা উচ্চারণ শুনে ওঁরা তিনজনই হেসে উঠলেন। আমি একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। বোকার মত উল্টো-পাল্টা কিছু বলে ফেললাম নাকি! নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে। নইলে ওঁরা হাসবেন কেন?

—সাধারণ পাথরই যদি হবে তাহলে আমাদের টেবলে আসবে কেন

আমি একটু থতমত খেলাম। সত্যিই তো! ওঁরা তিনজনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রবীণতা প্রবীণ বাড়ি। এক মাথা সাদা চুল। কপালে ভাঁজ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। অপর দুজনও প্রৌঢ়। তাঁর মধ্যে একজন আমার পরিচিত। একটু হেসে তিনি এবার মুখ খুললেন,—ঠিকই বলেছেন, না চিনলে সাধারণ পাথর বলেই ভুল হবে।

কিন্তু অসাধারণের কোন লক্ষণই তো যে. অসাধারণ হলে এইসব যন্ত্রপাতি ফিল্ডগিনেসের টেবলে ওরকম একটা পাথর আসবে কেন দুটো আন্দাজই। পেপার ওয়েট বানানোর কিংবা গিয়ারিংয়ের পা ধরবার পাথর নিশ্চয়ই এখানে থাকে না। তাহলে ওটা কি চাঁদের। না ঠোঁট জোড়া ওটা কোন জলজন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে টেবলে নানান আকৃতির পাথর। হাতির চোয়াল, তুষারের মাথা থেকে শুরু করে শিরদাঁড়া টিকটিকির প্রস্তরীভূত রেণু। ছোট বড় বিচিত্র রঙের পাথরের নমুনা প্রায় চল্লিশটা। যেন মানুষ দেখে ঘরটি সাজিয়ে রেখেছে। পরেই চলতে শুরু করবে। এছাড়া লম্বা র‍্যাকে কাচের ওপর রাখা বেঁটে, রোগা, ধারালো, ছটালো, চওড়া, ত্রিভুজাকৃতি অসংখ্য পাথর।

হাতের সামনেই টেবলের ওপর সেই হলদেটে পাথরটা। সত্যিই ওটার কোন মূল্য বা গুরুত্ব আছে কি

ভাবনার ধরনটা আঁচ করেই বোধহয় পুরু-লেন্স চোখে চোখ রাখলেন। —এটা হচ্ছে প্রস্তর যুগের একটা অস্ত্র। জানোয়ারদের চামড়া ছাড়ানোর জন্যে আদিম মানুষ পাথর ঘষে তৈরি করেছিল। সামনের ঐ ছুঁচলো দিকটা ছুরির ফলার মত ব্যবহার করত, আর বাকিটা যা

আর একটি

আগেকার যুগ

নাও কি?

—ওটা আপনার জন্যেই রেখেছি। ইচ্ছে

কোটাবার চেষ্টা করলাম। নিশ্চয়ই নেব। পুরনো জিনিসে আমার ভয়ানক শখ। আচ্ছা, এটার বয়েস কত হবে বলুন তো?

—বেশি না, থ্রেভিক্সের কার্বন—১৪, আই মিন সি-ফোরটিন টেস্টে জানা গেছে লাখ দেড়েক বছরের, প্যালিয়লিথিক পিরিয়ডের। প্রস্তর যুগের মানুষেরা এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত। তারা যুগেরও বহু আগে।

পাথরটা আবার হাতে নিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম।—রীতিমত শক্ত। পাশটা বেশ ধার। কারো ঘাড়ে আঁচড় দিলেই নির্ঘাৎ কেটে যাবে। সাদা চর্বি হু-ফাঁক হয়ে গলগল করে রক্ত বেরুবে। ছুঁচলো ডগাটা যদি জায়গা বুঝে বিঁধিয়ে দেওয়া যায় তো তৎক্ষণাৎ সে ছটফটিয়ে মারা যাবে। কে বানিয়েছে এ অস্ত্রটা? পাথরে পাথর ঘষে কতদিন সময় লেগেছে এটা বানাতে? শুধু কি জানোয়ার হত্যা বা তার ছাল ছাড়ানোর জন্যেই তৈরি হয়েছিল, না প্রতিশোধ নিতে শত্রুকে ঘায়েল করতে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ করা হয়েছিল এটাকে? প্রতিশোধের কারণে হয়ে থাকলে কতজন খতম হয়েছে? আদি পুরুষ সেই গুহা-মানবের বুকে প্রতিশোধের আগুন কেন জ্বলেছিল? শত্রুরা কি খাবার কেড়েছিল, না লালসা চরিতার্থে সঙ্গিনীকে দখল করেছিল?

ঘড়িতে চোখ পড়তেই চিন্তা ছুটে গেল। ব্যাগে পাথরটা ভরে উঠে দাঁড়ালাম।—অনেক ধন্যবাদ, আজ আর বসতে পারছি না।

—একটু চা খেয়ে যান।

—আরেক দিন। একুণি কর্পোরেশন অফিসে না গেলে কাজটা হবে না, অনুপমা দি'র দোহাই দিয়ে হয়ত আরো সাত-আট মাস ঘোরাবে।

কর্পোরেশন অফিসের সামনে এসে পাথরটার কথা মোলায়েম ভুলে গেলাম। চারটে বেজে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বেরিয়ে আসছে। এখন সবাই ব্যস্তমুখো। তাহলে কি অফিস বন্ধ হয়ে গেছে? গলাটা শুকনো, বুকটা ঢেঁকো ঢেঁকো লাগল। ডেথ সার্টিফিকেটটা না পেলে কামেলা যে আরো বাড়বে। কিন্তু স্রোড় সেই ভদ্রলোকটি তো কথা দিয়েছেন—আজই দেবেন। যদি না দেন কিংবা বাড়ি চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে? নিজের ওপরেই রাগ হ'ল। সামান্য একটা পাথর নিয়ে জি-এস-আই অফিসে এতক্ষণ সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত হয় নি।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতেই আশ্বস্ত হলাম। না, ভদ্রলোক যান নি। চেয়ারে গা এলিয়ে একা বসে আছেন। টেবিলের এধারে দাঁড়াতেই একবার তাকালেন। তারপরে চোখ বুঁজে একটা ক্লিপ দিয়ে কান খুঁটতে লাগলেন। একটু পরে আবার তাকালেন। এইবার নিশ্চয়ই সার্টিফিকেটটা বের করে দেবেন। ওটা পেলেই খুব আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে হবে।—আপনি যে কি উপকার করলেন—বিশ্বাস করুন।

—না না, এ তো আমাদের কর্তব্য।

—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব—এই ডেথ সার্টিফিকেটটার অভাবে বাবার রেখে যাওয়া সামান্য টাকা ক'টাও তুলতে পারছি না, খেতেও দেটতে পারছি না। আপনার সাহায্য আমি জীবনে ভুলব না। নমস্কার।

ভদ্রলোক চোখে চোখ রাখলেন।—কি চাই?

—মানে—আপনি তখন যে বললেন বিকেলে আসুন।

—ও, বলেছিলাম!—একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন।—চেষ্টা করেছিলাম। হয় নি।

—সে কি!—আঁৎকে উঠলাম আমি।—আপনি কথা দিলেন আর এখন বলছেন—

হাত তুলে থামালেন।—মার্কিং স্লাটের রিপোর্টই আসে নি। অনেক গোলমাল আছে। এ দেশের শালা কিস্যু হবে না। মাসখানেক পরে আসুন।

আমি টেনে দেলাম আমার হস্তকাল ভ্রমণ বাড়ছে। মুহূর্মুহু আপনা-আপনি কুঁচকে উঠছে। পর মুহূর্তেই সামলে নিলাম।—তার আগে হয় না? বহু দূর থেকে বার বার আসা—

ইচ্ছে করে কি ঘোরাই? যা কমপ্লিকেটেড তা তো মানতেই হবে।

চোখে মুখে আরো করুণভাবে কোটালাম।—ওটা যে খুবই দরকার। একটু তাড়াতাড়ি না হলে—ধরা করুন।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করলেন।—তাড়াতাড়ি তো সবাই চায়। কেউ বোঝে না মোটা সিস্টেমেরই পরের ঘুনে আমাদের মত কিছু বোকা লোক আছে বলে এখনও—ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখলেন।—খুব দরকার? গোটা পঞ্চাশেক টাকা খরচ করতে পারবেন? যদি পারেন তো সামনের মঙ্গলবার আসুন।

রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল। বলে কি! ঘুষ চাইছে? একুণি ওর গলা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে যদি সারা মুখে ঘুষি মেরে দিই তো কেমন হয়? তবে একটা লাথ মারলেই বা কি হয়? চাপা উত্তেজনায় মুখ দিয়ে কোন কথা বের হ'ল না।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন।—ঠিক আছে, পাঁচ টাকা না হয় কমই দেবেন। এদিন আসুন, ঠিক করে দেব।

একরাশ ক্লান্তি আর হতাশা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে যখন পৌঁছলাম তখন ট্রেন ছাড়তে কয়েক মিনিট বাকি। ভিড় ঠেলে একটা কামরার ভেতরে গিয়ে কোনরকমে দাঁড়াতেই পাশের সিটে বসা এক ভোকরা উঠে দাঁড়ায়।—দাদা, সিট লাগবে নাকি? মাত্র পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকায় সিঙ্গল সিট।

ও কথা শোনা মাত্রই মাথার মধ্যে আবার আগুনটা জ্বলে উঠল। মস্তান মাফিয়া আর শয়তানের জাল কি সবখানেই পাতা? এদের হাত থেকে কি কারো রেহাই নেই? ঘুঁষি মেরে ভোকরাটাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে কি করতে পারে ও? একা ও এর জন্যে

কতটুকু। কিন্তু সঙ্গে যদি বল থাকে, জোর থাকে, শিক্ষা থাকে—তাহলে? অবশ্য বাজেলা পাকিয়ে বিপদ বাড়ানোর কোন মানেই হয় না। সময়টা খারাপ যাচ্ছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। আসলে ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে অনেক শস্ত্র-শোস্ত্র হাতিয়ার দরকার। কিন্তু কোন্ হাতিয়ার? বাহু-বল না বুদ্ধি? প্রতিরোধ না প্রশাসন? অর্থ না আদর্শ? আইন না অস্ত্র। একটা যদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের আণ্ডেরাস্ত্র পেলে সব কন্যাইশ্কে জব্দ করা যেত। কিন্তু সে অস্ত্র ধরে কিভাবে। ছোড়ে কেমন করে সেই কায়দাই তো জানা নেই! ব্যবহার করবার কানুন-কৌশল না জেনে হাতে পিস্তল পেয়ে লাভ কি? আর ভাবতে পারলাম না।

ঘণ্টাখানেক বাদে বসবার জায়গা পেলাম। বসে অবাক হয়ে দেখি পাশের ভদ্রলোক নাকে চশমা এঁটে ঐ স্বল্প আলোয় একমনে পরীক্ষার খাতা দেখছেন! লাল পেন্সিলে ঘন-ঘন দাগ মারছেন, আর ফচ্‌ফচ্ করে নম্বর বসাচ্ছেন। এরপরে হয়ত নামার সময় খাতা ফেলে যাবেন, তারপরে খানার ডাইরি করবেন। কতগুলো নিরাপরাধ ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য ভবিষ্যৎ মুদির দোকানের ঠোঙার চাপা পড়ে থাকবে। খুব ইচ্ছে হ'ল দু'কথা শুনিয়ে দিই, কিন্তু না—গায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধানোর কোন মানে হয় না।

গন্তব্যে পৌঁছতে যখন অনেক দেরি তখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ভেবে চোখ বুজলাম। কিন্তু ঘুম এল না। সমস্যার মেঘ ঘন হয়ে জমতে শুরু করল। কলকাতায় বাবার চিকিৎসায় অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি শোধ করা দরকার। এদিকে কাকা এজমালি বাড়ির নতুন অংশটা দাবি করেছেন। ও অংশটা ছেড়ে আর থাকল কি? খসে পড়া স্যাতসেঁতে সেঁতসেঁতে ঘর। বাবা যারা যেতে না যেতেই কাকার ব্যবহার কেমন যেন বদলে গেছে। রেখার ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি যেন আরো দূরে সরে গেছেন। বিপদে পাশে না দাঁড়ানোই কি মানুষের চরিত্র? তাই যদি হয় তাহলে আর কার ভরসায় বাঁচা! রেখা সম্পর্কে আড়ালে-আবডালে কাকা-কাকীমার ফালতু টিপ্পনি, কুৎসিত কটূক্তি প্রায়ই কানে আসে। শুনে রাগ হয় ঠিকই, কিন্তু সামনা-সামনি কিছু বলেন না বলে প্রতিবাদও করা যায় না।

কাঁদিন আগেই রেখা বলছিল,—আর সহ্য হচ্ছে না, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চল।

—কেন, কি হ'ল কি?

রেখার গলা কাঁপছিল! চোখে মুখে ঘৃণা ও ক্ষোভ। জান, কাল কাকীমা পাশের বাড়ির বৌদির কাছে বলছিল। বাপ-মা'র শিক্ষাই ওরকম। মেয়ের আর কি দোষ?

—ওসব কথায় কান দিও না।

—না, দেব না। তুলো গুঁজে বসে থাকব।

—পাঁচ পড়েছি। তাই—কি আর করবে বল? ধৈর্য হারিও না। তুমি ভেঙে পড়লে মেয়েটা যে আরো ভেঙে পড়বে।

আমার কথায় রেখা কতটুকু সাহস বা ভরসা পেল জানি না। মুখ দেখে মনে হ'ল যেন ভাবছে, দুর্বলের সঙ্গে ধাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

উপায় একটা বের করতেই হবে। ছোট্ট একটা ভুলের মাশুল তো চিরদিন দেওয়া যায় না। রেখার এখন যা বয়েস তাতে সে ভুল করতেই পারে। কিন্তু সেই অপরাধে শাসনের হুকুটি দেখিয়ে তাকে দূরে ঠেলে রাখা কি আরো অন্যায় নয়? মেয়েটার চেহারা এমনিতেই খারাপ হয়ে গেছে। সোজাসুজি কারো দিকে তাকাতে পারে না। সহজ হয়ে কারো সঙ্গে মেশে না। অনুতাপ আর পাপবোধে কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে। চোখে মুখে সর্বদাই শঙ্কার ছায়া। ওকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? টাকা দিয়ে রক্ষা করে, না সামনা-সামনি লড়াই করে? শয়তানকে পাল্টা মার না দিলে তার থাবা আরো চেপে বসবে। কিন্তু ওরা যদি বোমা ছুড়ে খতম করে দেয়? কিংবা যদি জোর করে রেখাকে তুলে নিয়ে যায়—তাহলে? মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার ওরা এখন আক্রোশে ফুঁসছে। যে কোনদিন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আচ্ছা, ওদের হাতে-পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করলে কেমন হয়?

ছিঃ, এ আমি কি ভাবছি! ধ্যোৎ নিজেকেই গাল দিতে ইচ্ছে করল। পর মুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেলাম। এছাড়া কি-ই বা করতে পারি? আমার ক্ষমতা কতটুকু? একটার পর একটা সমস্যা আর বিপদ যদি আসতেই থাকে তবে তার মোকাবিলা করব কি করে? আমি তো অতিমানব নই। একটা ঘটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ি। গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে নানা স্তরের স্বার্থ বেঁচে সংসার সমুদ্রে কোন রকম ভেসে থাকাই আমার কর্তব্য। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকার মানে কি? তবে কি আমি একটা মেরুদণ্ডহীন পুরুষ? মেয়ে ভুল করেছে বলে কি বাবাও ভুল করবে? জানোয়ারের হাত থেকে রেখাকে কি তার বাবা রক্ষা করতে পারবে না? পাঁচে পাঁচ বললাম। পরীক্ষার বেল কিছুটা বলে দিলাম। কিন্তু একটু পরেই আবার মুষড়ে পড়লাম। রেখার বিষণ্ণ মুখটা ভেসে উঠতেই বুকের মধ্যে দু-দু করে উঠল। আজ ক'মাস যে কিভাবে কাটছে তা কেবল তিনটি মানুষই জানে। বাবার মৃত্যু, মৃত্যু, দেনা, রেখার দুর্ঘটনা, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়দের বিদ্রূপ—সবে মিলে কেমন যেন একটা দমবন্ধ টাল-মাটাল অবস্থা। বুক ভরে নিশ্বাস নেবার মত তাজা বাতাসের অভাব। এর মধ্যেই একদিন রাসুদা এসেছিলেন। অবাক হওয়ার মতই ঘটনা।

—কি ব্যাপার রাসুদা। আপনি!

—হ্যাঁ ভাই, তোমার বাবা মারা যাবার পর আসাই হয় নি। কাজের চাপে আর ফুরসৎ পাই নি।

লোকে নানান কথা বললেও আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আশ্রমবাড়ির সম্বন্ধে যেন মোটা ঘরটা ভরে গেল। মেহনতি জনতার একদা লড়াকু নেতা এখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে ঘাড়ে-গর্দানে এক এবং চকচকে। বুড়ো বন্ধুকে ঘিরে করে কেন গল্পগুজব। শোনা যাচ্ছে এবারে ভোটে নাকি দাঁড়াবেন। লোকে তাঁর সততা সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন রাসুদা তো আমের সেই রাসুদাই আছেন।

—আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কি-তু কি করবে বল?

অনেক দিন পরে রোদ উঠল। বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মত মানুষ আছে ভেবে সারা দেহে শক্তি ফিরে পেলাম। রাসুদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন। লেখাকে ডেকে চা বানাতে বললাম।

রাসুদা আরাম করে বসলেন—তুমি জেনে নাও।

—জানতেই হবে। কারো বাবাই চিরদিন থাকেন না।

পা নাচানো বন্ধ করে রাসুদা ছাদের দিকে তাকালেন। ভারস্বরে গলাটা খাটো করলেন,—আমি তোমার মেয়ের কথা বলছি।

হঠাৎ মাথায় বাড়ি লাগল।—কি বলছেন আপনি?

—ঠুপ বলছে। তাছাড়া কালি বাড়িতে ফিরে করেছে ওরা।

—মিথ্যে কথা। ও বিয়ে আমি মানি না। বেখাও স্বীকার করে না।

—কেন মাথা গরম করছ ভাই? ওদের জানাশোনা অনেক দিনের। ও তো তোমার মেয়েকে পড়াত।

—হ্যাঁ পড়াত। বাড়িতে কালসাপ আমিই ঢুকিয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারি নি যে, কত বড় শয়তান ওছোড়া। জোর করে কালিবাড়িতে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর দিলেই বিয়ে হয়ে গেল! সাক্ষী কে আছে?

—তোমার মেয়ে তো কয়েক দিন নিরুদ্দেশ ছিল।

—হ্যাঁ ছিল। তবে ঐ শয়তানের ঘরে নয়—আমারই এক বন্ধুর বাসায় ওদের ভয়ে লুকিয়ে ছিল। আপনি জানেন, ও শয়তানটার ঘর-জ্বালে-মেয়ে আছে? ওর ব্যবসাই হচ্ছে নিরীহ মেয়েদের ফাঁদে ফেলে কিছু আদায় করা।

—এখন তুমি যা খুশি বললেও লোকে কি তা মানবে?

—না মানুক, আমি কারো পরোয়া করি না।

—এটা ছেলের কথা। যা হয়ে গেছে তা মেনে নাও। তাছাড়া জানই তো থানা, পুলিশ, এম-এল-এ, মন্ত্রী ওর টাকে গোঁজা। ওর সঙ্গে বাজনা বাধিয়ে লাভ কি?

সবার জ্বলে উঠল। কার সঙ্গে কথা বলছি আমি! সুন্দর চেহারার আড়ালে এ কোন কুৎসিত জানোয়ার উঁকি মারছে! আর তো বরদাস্ত করা যায় না। রাসুদার চোখে চোখ রাখলাম।—জানা ছিল না মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ওর টাকে গোঁজা। —এতকাল ধরে আদর্শের যেসব কথা বলে এসেছেন সবই তাহলে ভেতাবী!

—বাস্তবকে মেনে নাও। ঐ মেয়েকে আর কোন দিন ফিরে পিতে পারবে?

—অপেক্ষা করে দেখুন পারি কি না। হিম্মত থাকলে আটকাবেন।

রাসুদার কর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল,—ওদের প্যাং কিন্তু বিরাট!

—তার দেখাচ্ছেন? ছোটে যখন দাঁড়াব না তখন মস্তানের পা চাটব কেন বলতে পারেন?

রাসুদা আর বসেন নি। তিনি চলে যেতেই উচিত এবং অপ্রিয় সত্যি কথা বলার চাপা আনন্দে শরীরটা বেশ ঝরঝরে ঠেকল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। একটু পরেই কেমন একটা ভয় যেন আমাকে অবশ করে ফেলল। কি দরকার ছিল ওসব বলবার? খামোখা শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি? এদের নিয়েই তো চিরকাল থাকতে হবে।

সেদিন বাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে ঘোঁচা খাওয়া সাপের মত রাসুদার মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছিল যখন তাবার চেষ্টা করছি তখন এলেন ডাকবাবু। একটা হাই তুলে টিকিটটা বের করতেই তিনি বিরক্ত হলেন,—থাক থাক।—গাট হয়ে সামনের সিটে বসে একটা সিগারেট ধরালেন।

—আপনারা কেন টিকিট কাটেন বলুন তো? পয়সা বেশি হয়েছে? ঘরে কালাধন আছে?

আমি অবাক হলাম।—ট্রেনে চড়লে টিকিট কাটব না?

ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়লেন ভদ্রলোক।—বাজেট দেখেছেন? দু-নম্বরী না করলে কেউ বাঁচবে না। মোটা দেশটাই যখন জোচ্চুরিতে চলছে তখন টিকিট কেটে সাধু সাজার কোন মানে হয় না। আপনি বলবেন আমি খুব খাচ্ছি। আমি বলব, না। কাজান কেনার খুব যদি নিরপরাধ কমিশন হয়, তাহলে আমার হাত পাতাও হবে নিঃস্বার্থ সেবা! ঠিক কি না স্যার আপনিই বলুন?

কি বলব ভেবে না পেয়ে চোখ বুজলাম। আর চোখ বুজেই মনে হল বিশাল একটা জঙ্গলের মধ্যে আমি ছুটছি। কোথাও কোন মানুষ নেই, ঘর নেই, পথ নেই। প্রতিটি গাছের নিচে, কোপ-ঝাড়ে শুধু নেকড়ে আর হায়েনা। যেখানেই পা ফেলতে যাই সেখানেই সাপ-সরীসৃপ কিলবিল করছে। গাছের ডালে ডালে বাজ আর শকুন।

বাড়ি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। লণ্ঠন হাতে লেখা দরজা খুলে দিল। এপাশ-ওপাশ দেখে দরজায় তালা দিয়ে বলল,—এত দেরি যে?

—লাইট কতক্ষণ নেই?

—দুপুর থেকে। কাল থেকে লণ্ঠনও জ্বলবে না।

—কেরোসিন পাও নি?

খাদ্যমন্ত্রী এখন আপনে। তাছাড়ের

মাটির নিচে অন্ধকূপে মিটি-কা-চেলে আছে সে বিষয়ে সৌমনারে বক্তব্য রাখবেন।

লেখার কাগজ-পড়া-জ্ঞানে চমৎকৃত হয়ে হেসে ফেললাম। হাসির শব্দে অন্ধকার ঘর থেকে রেখা বেরিয়ে এল।—বাবা, দুপুরে তুমি খেয়েছিলে?

—ঘুমোস নি এখনও?

লেখা কি বুঝল কে জানে আমার মুখের দিকে তাকাল একবার।—হাত-মুখ ধুয়ে নাও। খাবারও দেবে না?

—আগামী সপ্তাহে যেতে হবে আবার। এদিন হয়ে যাবে।

লেখা খুব একটা ভরসা পেল বলে মনে হ'ল না। বিড় বিড় করে বলল,—ধৈর্যের পরীক্ষা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতেই কারেন্ট এল। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওসব পুতে বলে সিগারেটের প্যাকেটের জন্যে ব্যাগে হাত ঢুকোতেই শক্ত মতন কি একটা ঠেকল।

বের করে দেখি সেই পাথরটা।

ভুলেই গিয়েছিলাম এটার কথা। হলদে রঙের এবড়ো-খেবড়ো পাথর। উল্টে-পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখলাম। অবিশ্বাস প্রায় সন্দেহ যুগপৎ আক্রমণ করতে লাগল। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, সামান্য এই শিলাখণ্ডটা প্রস্তর যুগের একটা অস্ত্র? শয়তানকে শায়েস্তা করার হাতিয়ার! লেখা রেখাকে বললে ওরা হয়ত মুখটিপে হাসবে। ভাববে অস্ত্র না ছাই। মজা দেখার জন্যে আজগুবি গল্প ফাঁদছে। শত্রুকে ঘায়েল ও জানোয়ারকে খতম করবার সত্যিই কি কোন ক্ষমতা ছিল এ পাথরের? দেখে তো মনে হয় না। নাড়তে নাড়তে একটু পরে হঠাৎই সারা শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ টের পেলাম। আরে একি! খাঁজে খাঁজে আঙুলগুলো ঠিক মিলে গেছে! ওপরের দিকে বুড়ো আঙুল আর নিচের দিকে বাকি চার আঙুল। প্রতি আঙুলের জন্যে আলাদা আলাদা খাঁজ। মোটা পাশটা মুঠোর। ধারালো দিকটা বাইরে। হ্যাঁ—এবারে ঘরে ঘুং হচ্ছে। এতক্ষণ ঠিকমত ধরা যায়নি বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এখন শক্ত করে ধরা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পিস্তলের বাঁটে ও ট্রিগারে আঙুলগুলো ঠিকমত চেপে বসেছে। প্রতিটি আঙুলের খাঁজ বেশ বড় বড়। লম্বাও অনেকটা। সেই গুহা মানবেরা আকৃতিতে কি বিরাট ছিল তা এই খাঁজ দেখেই বোঝা যায়। এক মাথা উস্কো-খুস্কো কাঁকড়া চুল, পরনে একখানি চামড়া, শক্ত মুঠোয় পাথরের এই অস্ত্র। যে-কোন মুহূর্তে শয়তানকে ঘায়েল করার জন্যে প্রস্তুত।

আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম দানবাকৃতি এক গুহা মানবের চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। সুযোগের অপেক্ষায় জঙ্গলের মধ্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। মুঠোর চাপে অস্ত্রটাকে যেন গুঁড়িয়ে ফেলতে চাইছে। কাকে খুঁজছে ও? ক্ষুন্নি বুড়ির জন্যে কোন শিকার, না অপমানের প্রতিশোধের জন্যে অন্য কোন প্রতিপক্ষ?

আলগোছে পাথরটা বাঁ-পায়ে একটু ঘষতেই ধন্যবাদ অনুভব করলাম। কেটেই গেল বোধহয়। বেশ ধার আছে দেখছি। ডগাটা বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ। আচ্ছা, কিছু লোক যেন নিজে তাদের বুকে যদি এটাকে বেঁধানো যায় তো কেমন হয়! কিংবা পেশের বাকাবাগীশ নেতাদের জিভগুলো যদি কেটে নেওয়া যায় তাহলেই বা কি হয়? একবার যখন পাথরটা ঠিকমত ধরতে পারা গেছে তখন হয়ে হাত না বাড়ানো পর্যন্ত নিশ্চয়ই কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যে কাজেতে আসবে জ্যান্ত অবস্থায় তাকেই ছাল ছাড়ানো হবে।

পাথরটা মুঠোর আরো শক্ত করে ধরলাম।

আলোর কাছে তুলে ধরে চেষ্টা করলাম প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। ভুলে গেলাম সারাদিনের ক্লান্তি। তার বদলে টের পেলাম রক্তে এক অনাস্বাদিত উত্তেজনা। হোমোক্রমন অভিযান প্রস্তুতির শিহরণ জাগানো আনন্দ মুহূর্তের উন্মাদনা। তীব্র ইচ্ছে হ'ল লেখাকে জাগিয়ে বলি—আর ভয় নেই, অস্ত্র ধরতে শিখেছি।

—কিসের অস্ত্র?

—শয়তানকে শেষ করার অস্ত্র। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র। কাল্পনিক নাটকীয় ভাবাবেগে এবারে নিজেই হেসে ফেললাম। টেবিলে পাথরটা রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। রাত রাতের এই আবিষ্কারে নিজেকে বেশ হাল্কা মনে হ'ল। চোখ পড়ল তপাশের বিছানায়, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে মা ও মেয়ে। দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না যে, এক আতঙ্কিত জীবনযাপন করছে ওরা। ওদের কারো মনে সুখ শান্তি স্বস্তি নেই। নেই নিরাপত্তা। এভাবে ভয়ে ভয়ে দিন কাটানোর কোন মানেই হয় না। কাল থেকে বুক ফুলিয়ে ঘুরতে হবে। রাস্তাতে দেখতে পেলেই—, দাঁতে দাঁত ঘষলাম। —খুনগুলো রাস্তা, নির্লজ্জ বাড়ি মুহূর্তেই নামান্তর। ক্ষমতা আর টাকা থাকলেই সবাইকে টাঁকে গোঁজা যায় এরকম ধারা ভাবে তারা মূর্খ—সমাজের কলঙ্ক।

বিছানায় লম্বা হয়ে মনে মনে একটুই হাসলাম। তারপর কখনও রাস্তা, কখনও কাকা, কখনও বা কর্পোরেশনের সেই লোকটা, মাস্টার, ঠেকার, রেখার জীবনের আতঙ্ক প্রধান শয়তানটা—আরো অনেকে—না দেখা ভণ্ড নেতা, খুনেখোর মন্ত্রী, আমলা, কেরানি, ভালোবাজারি, ঠগ, জোচ্চোর, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদিদের সঙ্গে হিন্দি সিনেমার নায়কের মত বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল লেখার কান্নাতে। গায়ে ধাক্কা দিয়ে কিসফিস করে ভীত কণ্ঠে ডাকছে।—শিগগির ওঠ।

—কেন, কি হ'ল?

—জানলায় দরজায় কারা যেন ধাক্কা

অনেকক্ষণ ধরে জমা,
ওরা নয় তো ?

মুহূর্তমধ্যে সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠে এল।—কোন্ শালা শুওরের বাচ্চা, দেখাচ্ছি মজা। আমার অস্ত্রটা দাও তো।

—অস্ত্র ! কি বলছ তুমি ?

—হাঁ, হাঁ, হাল ছাড়ানোর অস্ত্র।

আলোটা জ্বালাতেই দেখতে পেলাম দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে-বন্দী ভগবান বিশ্বাসের ছবিটা। ও হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলের ওপর রাখা পাথরটা দেখামাত্রই অনুভব করলাম এক লক্ষ বছর আগেকার একটা গুহামানব জেগে উঠছে। এক্ষুণি নতুন যুগে চলে আসার জন্যে ওকে শক্তিতে বাঁপিয়ে পড়বে।

চট করে পাথরটা তুলে নিয়ে ভগবান বিশ্বাসের মাথাটা উড়িয়ে-পাড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ঝাঁকগুলো গেল কোথায় ? এখন তো কেমন অনায়াসেই নষ্ট করে ফেলেছিলাম। এখন পারছি না কেন ? আমাকে যে পারতেই হবে। পারতেই হবে।

ঘামতে ঘামতে আমি আরো দ্রুত চেষ্টা করতে লাগলাম।

লেখা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

With best compliments from :

The United Commercial Bank
Staff Co-operative Stores Ltd.

Regd. Office : 16-A, Brabourne Road, 2nd. Floor
Calcutta-700 001

Bikash Mazumdar	Somnath Ghosh	Gautam Kumar Dey
Chairman	*Vice-Chairman*	*Secretary*

With the best compliments of

Calcutta State Transport Corporation Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

45, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-700 013

নদীর কিনারে ওরা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রতীক্ষার শেষ নেই, ওরা ওই নদীর কিনারে
বসে আছে উদাস। ওরা
কয়েকটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, যুবা ও যুবতী।
দু' তিনটি শিশুও ছিল। তারা কালীমন্দিরের দ্বারে
কাঠের জিরাফ, হাতি, ঘোড়া
এবং মাটির দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী
দেখে নিয়ে মন্দির-চত্বরে পেয়ে প্রসাদ-ভিক্ষার।

শুধু ওরা নদীর কিনারে প্রতীক্ষায়
স্থির বসে আছে।
ঘুরে গিয়েছিল নদী, জোয়ারে এসেছে ফিরে কাছে।
কি'কি' ডাকে, অনেকজনের মতো একা
কয়েকটি মানুষকে ঘিরে জমে ওঠে গাঢ় অন্ধকার।

নিবাক এখনও ওরা বসে আছে, অচ্ছ নৌকার
নেই দেখা।

বিদায়ের পাশে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিদায়ের পাশে একটা নীল ফুল
ঘুমের মতো ঝুঁকে পাশ ফিরলো, জেগে ওঠেনি অন্ধকার
শুধু কান্নার ফোঁটার মতন উড়ছে দু' একটা জোনাকি
কেউ জানে না, কেউ দেখছে না, বিদায়ের পাশে
একটা নীল ফুল
গন্ধমদ রাত্রি আচমকা মিলিয়ে গেল
এক সরোবরে
মোষের পিঠে চেপে বাঁশী বাজাচ্ছে একটা বাচ্চা
সূর্য আনে ফিরে
সুখ সবাইকে সাজগোজ করতে বলে
সবুজে শান্তির মতন ধান খেতে লকলক করছে
দুপুরে বেলায় উনুনের আঁচ
জল কালার কাছে একটা গাছের ছায়!

সহসা বাতাস একটা ঘাই ঘাই রব তোলে
সোনাঝুরিরা উড়তে চেয়েছে ঘাই ঘাই
মনের ডানায় ঘাই ঘাই
গোধূলি ঘনো, ছাই গালায় ঘাই ঘাই
বিন্দু বিন্দু নক্ষত্রে বিশাখ কংকারের মতন
ঘাই ঘাই
কথা শেষ হলো না, ভেঙে পড়লো একটা ডালা
ভেতে গাছের ডগায় মতন কাঁপছে ছেলেবেলার লিপসা
অনিমার হাত জোড় করে বলে, যাই
বিদায়ের পাশে দুলতে থাকে সেই নীল ফুল, তার
নাম জানা হলো না……

কোনো বিকল্প নেই

রুক্ষ ঘর

তার কোনো বিকল্প নেই
এটা জেনে নিয়ে জীবনযাপনে মগ্ন হওয়া
তাকে গতি ও ছন্দে অভিজ্ঞের সমান্তরাল করে
নিয়ে যাওয়া
যা কিছু হিংস্র কুটিল তার বিষ নির্মূল করে দিতে
প্রতিবেশী সবে মিলে হাতে হাত দেওয়া

যেহেতু কোনো বিকল্প নেই
পরিচিত মুখগুলি ঘেরে থাকে প্রত্যাশায়
এই বুঝি প্রকৃত জীবনযাপন
প্রতীক্ষারও নিজস্বতা আছে
ভোরের নিষ্পাপ আলো
গাছপাখি মানুষের নিজস্বতারই মতন
তারা সব উজ্জীবিতা চায় আবহমানের কাছে
তার স্বচ্ছতার স্রোতে

রাত্রি আছে, দিন আছে, আছে কাল প্রজন্মের
পরম্পরা আছে
তার অভিজ্ঞতা আছে
করতলে তাকে ধরে জীবনের গভীরে চলে যাওয়া
জীবনযাপনে মগ্ন হওয়া

তার কোনো বিকল্প নেই এই বেঁচে থাকার
এই সত্য জেনে ॥

ওই হাওয়া

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ওই হাওয়ায় আকাশটা সাদা হয়ে গেল
সমস্ত নীল এখন চলমান শাড়ির আঁচলে
পুকুরের হাঁস মাখা লুকোয় পুকুরের জলে
ডাক্তারখানায় সেই কাচের পুতুল
একবার মুখ ডোবায়
আর একবার উঠে দোল খায়
হাওয়াকে দেখতে হবে বলে এক তীরন্দাজ বেরোলেন
সোনার চাঁপার তীরধনুক হাতে নিয়ে
মাথার পাতায় শিরস্ত্রাণ
তারপর শিকনিকের মাঠের গাছতলায়
একটি রমণী ছিল একাকিনী
বললো—তু কথাকে পিইছিলি
উত্তর দেওয়ার আগে হাওয়ার কাঁপ দিল ওরা
খুব কাছে গায়ে গায়ে
লণ্ডভণ্ড হাওয়ায় ওরা যে
আকাশটা হাসতে হাসতে নীল হয়ে
আকাশে উঠে গেল।

□

প্রতিধ্বনি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ওই শৈলাবাসে এই প্রতিধ্বনি পকেটে দাঁড়িয়ে
আবার তোমার নাম উচ্চারণ করি

অমনি আকাশ ডেকে ওঠে
বাতাস গুমগুমে বেজে ওঠে
পাহাড়েরা ঘুম ভেঙে ওঠে
অনামা ফুলের ঠোঁটে ফোটে
আমার বালক নাম রোদ্দুরের বর্ণরেখা ধরে

ওই যে বালক যায় তার চোখে সুষমার ঢেউ
কী বিপুল দীর্ঘতায় আগামী পৃথিবী অনাময়
আমি বুদ্ধিমান বলে কবে যে এসেছি ফেলে
বালককালের সব স্বপ্ন তন্তুজাল;
চোখ খুলে যাদের মতন
এখন ঘুমোই

এখন ত্যাগের কথা নেই
এখন লোভের কথা আছে
আদর্শের মাটির উপরে
ক্যাকটাসের ফুল ফুটে থাকে
সৌজন্যের বাতাসা ও জল
রেকাবিতে সাজিয়ে রেখেছি
নগ্না জেনে সেদিন গহনায়
তাই আজ শৈলাবাসে ফিরিয়া আসা গেল

প্রতিধ্বনি পকেটে এখন
দুরন্ত বালক ছুটে গেল
তাইই ডাকনাম ধরে ডেকে ডেকে উঠি
যদি মমতার নদী মুঠো খুলে দিয়েছে সে
অপমানী খরার মাটিতে

বয়স্ক মানুষ জানে সে বালক কখনো ফেরে না
পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে নেমে গেল অন্ধকার গ্রামে……

□

দৃষ্টি

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

গা; কুয়াশার কাঁচ মাটি ফুঁড়ে ওঠে।
শূন্যের ওপারে গিয়েছে সব ছবি, স্মৃতি—
তবু তোমার হরতন মুখ খুব স্পষ্ট, দুচোখে
ছিকোন আলো, মমতার গাঢ় ছায়া তরল মণিবিন্দু;
লটানো আঙুলে দুতিকাতরতা, মায়াবী সোফেটার
উঁচুটা মাথা, স্নায়ুতে করের বিদ্ধ ফুলঝুরি—
উইণ্ড-স্ক্রীনের পাতলা কাঁচের স্বচ্ছতায় একটার পর একটা
খাড়া করা তাল এগিয়ে আসে টেরা কিংবা ট্রাম্পস্;
নখের ধারালো আঁচড়ে ছিঁড়ে দিলে শার্ট,
দুতরো নীল আকাশের বুকে শর হাসের আঁচড়ে
ক্রমশ বাড়াচ্ছো হৃদয় আলোর বলয়, শোকস্তব্ধতার
ব্রহ্মাণ্ডের পৃষ্ঠা উল্টেই চলেছ, উটের পাঁজরির আড়ালে
হাসতে হাসতে টলে যাচ্ছে মরুভূমি, আকাশ ঈগলের গ্রহ
উপগ্রহ, ভয়ে দুহাতে চোখ বন্ধ করি, চেতনা
হারাবার আগে দেখি কয়েকটা তৃণ কাঁপছে, তাকে ঘিরে
নটীর ছন্দে আমূল মরুরী। ক্রমশ দৃষ্টির পর্দা স্বচ্ছ হলে
দেখি, আচ্ছা কৌতুকে হাসছো, ভীষণ ঘামে ঠাণ্ডা আমার
দুহাত, সমুদ্রের নীল বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি,
শরীরের ক্লেদের ঘাম ঝরে আসে, জলের তোড়ের মতো
উচ্ছ্বসিত ফুটে ওঠে রক্তিম করবী……

□

ভাগাড়ে সাম্রাজ্য

অপরাজিতা গোয়ী

ঝাপিয়ে উঠেছে ঝড়—
প্রলয়ের সংকেতে—
ঘনায়মান অন্ধকার।

প্রাত্যহিক ধরপাকড়, প্রতি মুহূর্তে যারা ছিল
সন্ত্রস্ত, একনিষ্ঠ
মুক্তির লক্ষ্য পথে, দৃঢ় প্রত্যয়ে
ছিল পদাতিক।

ঝড়ের তাণ্ডবে আজ তারা
দিশেহারা। লক্ষ্যভ্রষ্ট।
নোঙরহীন নৌকায় আজ তারা
সোয়ারি।

কিন্তু চিলেরা উড়ছে
সুযোগের সন্ধানে
প্রতিনিয়ত ভাগাড়ে দৃষ্টি রেখে
তারা উড়ছে।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের অবমাননায়
পৃথিবী আজ ক্লান্ত বিশ্ব,
চারিদিকে হিংস্র দানবের
পদশব্দ।

সোনালী ধানের শিষে
ধাতাস আর বুঝি তেমনি ক'রে দোল
খেলেনা ঢেউ
জ্যোৎস্না প্লাবিত
পূর্ণিমা রাতে—

চারিদিকে দানবের পদশব্দ।
গোলাপের বাগিচা ঘিরে
ঘর হারাদের
পদচারণা।

রুদ্ধ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের রুপালী আকাশে
নক্ষত্রের উজ্জ্বল ভীড়ে
আর বুঝি তেমনি ক'রে
স্বপ্নের পরীদের নূপুর নিক্কন
যায় না শোনা।

ঘনায়মান ঘর রৌদ্র আসে
নিরাশ্রয় আকাশের বুকে
এখন শুধু চিল আর শকুনের
প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালো ঝড়।

ভাগাড়ের একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে
পরস্পর
সংগ্রামে লিপ্ত।

এখন শুধু সংগ্রাম
ভাগাড়ে সাম্রাজ্যের
একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার।

□

দাগ

বীরেন সাহা

ঘুম থেকে তারা জেগে যায় দ্বিপ্রহরে,
স্মৃতির হরিণ বনে কি যেখে খুঁজে
কিছু কি পেয়েছ খুঁজে? সাবধানে ছেঁড়ো,
কাঁটা আছে,
প্রেমের শুকনো ফুল,
অবিনাশী লতা, ঝরে পড়া পাতা,
ভুলে যাওয়া গানের তিনটি কলি,
এসবই আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।
পথের পাশেই শ্মশান
ডাক পেলে দূরের বন্ধুরাও ধথারীতি এসে যাবে,
যদিও এখন তারা ব্যস্ত নিজস্ব চলনে।
ওড়ে পাতা ঝরঝরা ঘাসে, দ্যাখো,
ঘাসাঘাসি ছোড়ো ছাওয়ার,
কচি কদমের ঘায়ে হেঁটে যায় চড়া পায়ে
ছুটে যেতে যেতে একবার ফেরাও চাহনি।
ঘাটে শুকনো জলের দাগের মত
কয়েকটি কথা কোথায় যে পড়ে আছে দেখো
একদিন তোমরা ঘরে ফিরে এলে
বুকের ভেতর তখন এইসব কথা হবিসহ ছাপা হবে।

□

প্রাত্যহিক

কিরণশঙ্কর মৈত্র

গতকাল স্টেনম্যান আর রাইফেলের গুলিতে
ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার শরীর,
দমবন্ধ পল্লীর ঘরে ঘরে গুঙিয়েছে রাত
বোমার আঘাতে,
আর একবার নিরর্থক সতীদাহে জ্বলেছে
অবগুণ্ঠিতা পল্লিবেশ।

সুবিপুল তমসাপাত্র চূর্ণ
প্রভাতের ঘাসে শুকোয়,
গাছের সবুজে পাতায় অবোধ শিশুর
অস্ফুট কাকলি,
ভেঙে দেয় যানবাহন পথের সঙ্কোচ,
রৌদ্র প্রখর যেন চৌকস প্রহরী।

অনাথা সঙ্গীত-তরঙ্গে এরই ফাঁকে পাখা মেলে
কুণ্ঠিতা অপসরা,
তারপর সে আসে প্রাণবতী মুহূর্তে দিতে
অঙ্গে বেদনা।

অবচ

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কথা ছিল। কথা আছে।

অস্ত যা হবার তা না হয়ে এবং
যা না হবার ঠিক তা-ই হয়ে
দিনগুলি দিনগুলির ঘরেই দিব্যি কেটে যায়

অস্ত কথা ছিল। এবং
কথা ছিল বলেই যতক্ষণও কথা ভেবে যায়।

কী জানি, কথা থাকাটা হয়তো
কথারই অঙ্গ।
কেন না কথা দিয়ে ইদানিং কেউই
কথা তুলে নিতে তো আসেন না!

কথা কথা-ই ভেবে যায়

ভাষা বিধাতারা কি শেষ পর্যন্ত
কথা ফেরাতে পারেন!

স্বপ্নের ভিতর

কাজী নুরুশিদুল আরেফিন

এখন পাহাড়ে যাবে, না কি সাগরে তুলবে পাল……
এই সব ভাবতে-ভাবতে কোথাও যাওয়া হ'ল না।
সবুজ নিসর্গের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছো ক্যানভাস
স্বপ্নের ভিতরে সাজিয়ে নিয়েছো চিত্রশালা
বহুবর্ণ মানুষ হাটে বালির ওপর
বড় সুখে আছো হে
বড় বেশি অস্থিরতা পায়ের তলায়।
পাল তুললেই হাওয়ার প্রতি এলোমেলো
যাবার কথা বললেই বুকের ভিতরে ঝড়,
চেতনার ক্ষয় নামে, স্মৃতির সিঁড়িতে জমে নয় ভালোবাসা।
এখন কোথাও যেতে চাইলে পথ হারাচ্ছো বারবার
আকাশের নীল মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দশীর চাঁদ
তাকে মুঠোর ভিতরে ভ'রে কোথাও যাওয়া হবেনা তোমার।

এসো, তোমারও নিমন্ত্রণ

অজিত বাইরী

হাওয়ানি দিয়ে তোমাকেও ডাকছে চিরবসন্তের দেশ—
এসো, তোমারও নিমন্ত্রণ।
নুড়ি ও পাথরে পাতা আছে আসন।

এসো, আর উন্মোচিত হও, খুলে তোলো
বুকের গোপন : মিথ্যার মোড়ক খুলে নিমোহ হও।
এই তো সময়, যখন আকাশ অনন্ত, নৈঃশব্দ্য
চিরন্তনীন, তাপিত ওষ্ঠে উচ্চারণ করো
তোমার স্বপ্নন, তোমার পতন।
এই তো সময় নীরব অনুমোচনের।

এখানে কেউ বিঘ্ন করবে না হিংস্র-বাঘে।
এখানে কেউ শানাবে না হিংস্কারের ছুরি।
যদি কান পাতো, শুনতে পাবে ঘণ্টাধ্বনি
যা আমার গভীর থেকে বেজে ওঠে।
হাজার বছরের পুরনো আরকের মতো
হৃদয়ের গভীরে নেমে যাবে স্বর্গীয় সঙ্গীত।

এসো, নিসর্গ এখানে পেতে রেখেছে আসন
নুড়ি ও পাথরে। এসো, উন্মোচিত হও।
অনুভবে অনুশোচনায়, অনুমোচনে নির্ভার হও।

□

ঘূর্ণির মাঝখানে

সৌরভ হাজরা

ব্লগার হয়েছি বলেই
আজও মাড়িয়ে যাই কাঁটা
জেনেই গিয়েছি যখন
সময় তো জোয়ার ও ভাটা
আগুনে বেঁধেছি ঘর
ভয়হারা এ জীবনে
কী হবে পিছুটানে, সর্বনাশ
বাঁচা ও মরণে।
তার চে এই ভালো বেঁচে থাই
উৎস ও পরিণামে
হাওয়া যেখানে দোলে তেমনি
এক ঘূর্ণির মাঝখানে!

□

নৈসর্গিক বেদনায়

সুজিত হালদার

জানলার কি মসৃণ আলো খুলে আছে
বাবুইয়ের বাসার মত। আন্দোলিত অদৃশ্য বাতাসে,
প্রতিবিম্ব নবাদপুরে যেন প্রথম প্রেমের ছোঁয়া লাগা—
কেঁপে-ওঠা কিশোরী;
সামান্য রোদের জন্য একদিন অনেক মাঠের সবুজতা ভিজিয়ে
মেঘেদের দেশে গিয়েছিলুম। আলো যেমন করুণার মত কোমল
—তেমনি ঘন।
সংলাপহীন জড়তার রক্তমঞ্চে পিঠ রিয়ে
আমি আজ আগামী দুপোর মুখোমুখি
সুসজ্জিতা নায়িকারা জীবিকার ধারে রাজপথে
তাই প্রথম দুপোই মবনিকা কম্পমান—
চারিদিকে যবাভূমি, ধাতকেরা মুষ্টিতে মৃত্যু নিয়ে
সারি সারি দাঁড়িয়ে
আমার ভূমিকার একান্ত অভাব।
বলে গেলো নির্দেশক ঈশ্বরের মত।

□

কবি সন্ন্যাসী

নারায়ণ সেন

ওখানেই আকাশ থেকে নেমে এসেছিল আকাশের পরীরা
মায়ামন্ত্রের মতো আরো অন্ধকারে আরো জ্যোছনায়
নেচে নেচে নিসর্গ এই গাঙের ছায়ায় সুন্দরী সীতা জয়নাব
সমুদ্রসৈকত থেকে ভেসে আসা হিমশীতল হাওয়ায় হাওয়ায়
ঘুমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, স্বপনে দেখা ভয়ঙ্কর রাতে
আবদ্ধা শরীরে হেঁটে আসা, সঠিক সময়ে মনে আছে
অবসন্ন নিদাঘ দুপুরে, ক্লান্ত বিকেলে বসে দেখা
নাকে নাকফাঁসি, সাতনরী হার
তারার মালায়; হুরীপরী এভাবেই আসে, দেখা দিয়ে যায়
কবিতার উপোবনে বসে থাকা কবি সন্ন্যাসীরা
স্বপন দেখে।

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.—204 of 20.04.1918

Regd. Office

Vill. & P.O. HAT-SRIDHARPUR,

Dist. BURDWAN. PIN—713 148.

Phone : Sat-56

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Branches	*Phone No.*
Memari	Mem.—430
Shankarpur	Mem.—533
Radhakantapur	Mem.—376 ; Sat.—168
Hohar (Gadditala)	Sat.—46
Madhyamgram	Sat.—108
Matiswer	——

SHANKARPUR.

2 Lakh Mnds.

Banking ; Fertilizer ; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ; Grocery ; Pisiculture ; Agriculture ; Dharma Gola.

Bronze utensils ; Potato.

Sanat Kumar Banerjee
Chairman

Ajoy Paul
Secretary

With Best Compliments from :

PAX : 2179
DGP : 2393

★

DSP Employees' Co-operative Credit Society Limited

(Regd. No. 3418 of 1969)

BEN CHITY HOUSE ★ DURGAPUR-713 204

Numbers Of Membership	
Number Of Regular Employees	
Working Capital	17,13,20,525.13
Net Profit	58,54,146.29
Maximum Amount Of Loan To Individual Member	20,000.00
Rate Of Interest (On Thrift & Guarantee Fund)	

Welfare Scheme For Members

* Holiday Home At Puri And Darjeeling At Nominal Rent. Rest House At Calcutta At Nominal Rent.

* Financial Assistance To The Members On The Event Of Non-Getting Salary To Long Sickness.

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কার্যালয় :

মাচানতলা, ডাক ও জিলা : বাঁকুড়া

পোঃ বক্স নং—১২ টেলিগ্রাম : ২৩০/৬৩০

সমবায় ব্যাঙ্ক আপনার,

আমার, সকলের

★ যে-কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ১½ শতাংশ বেশি সুদ পেতে হলে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপঃ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখুন।

★ সহজ ও সরল শর্তে লকার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

★ চক্রবৃদ্ধির পরিবর্তে সরল সুদের হারে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ গ্রহণের অপূর্ব সুযোগ আছে।

★ হাইপোথিকেশন, মর্টগেজ, প্লেজ-এর মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়।

★ আপনার গচ্ছিত আমানত 'আমানত বীমা' কর্তৃক সুরক্ষিত।

★ একটি পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য আপনি সমবায় ব্যাঙ্কে আসুন।

★ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণের অপূর্ব সুযোগ।

"ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ভাইদের একমাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান"

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নের শাখা অফিসগুলিতে যোগাযোগ করুন :

শাখা অফিস :

বিষ্ণুপুরে-৮৫, কোতলপুরে-৩৯, পাত্রসায়রে-৫৭, সোনামুখী-৬৭, জয়পুরে-২৩, ইন্দাস-২১, বড়জোড়া-৩৩, ছাতনা-৩০, সিমলাপাল-২৩, সারেঙ্গা-২৭, খাতড়া-৪৪ ও তালডাংরা।

এ কে ঘোষ
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

অজিতকুমার গাঙ্গুলী
সভাপতি

কলকাতা তিনশো বছরে

কলকাতাকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপ দিয়ে চলেছে ইস্পাত

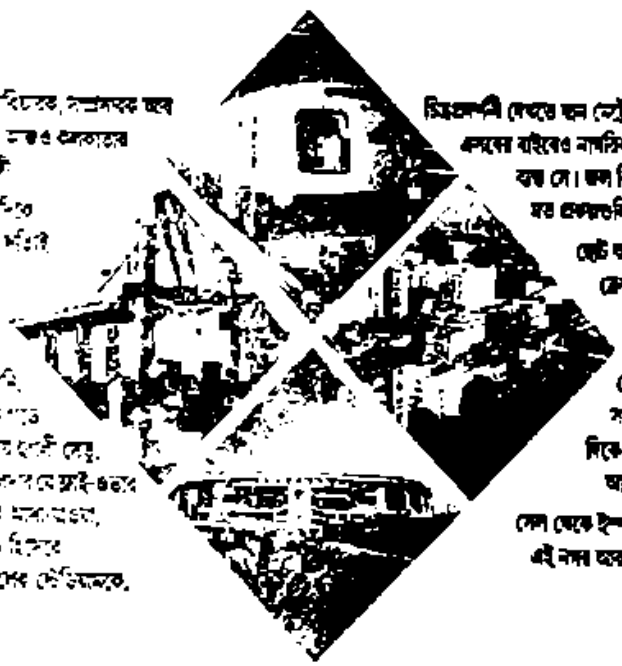

ঐতিহাসিক ইস্পাতের ঐতিহ্যকে, সভ্যতাকে আর উৎপাদন হিসেবে যেন সভ্যতা কলকাতার ঘরেঘরে সৃষ্টি-স্বপ্নের সঙ্গী

এই শহরের যে কোনো ঠিকানায় আপনি আজ শহরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন যে।

শহরের সর্বত্রই যে ফেলে আসা অতীত, সমস্যার আবার সমাধান পাওয়া যে চমকপ্রদ ভিন্নি হোটেল নেই, হোটেল থেকে আর বিমানবন্দর যে মুহূর্তে ওপরে নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি আকাশচুম্বী, এমনকি বৃহৎ এই ঐতিহ্যের হিসেবে আপনি আজকে যে সঙ্গী পেয়ে যেতে পারেন,

বিদ্যুৎশক্তি যেখানে আজ সেখানে যে চলিষ্ণু পৌঁছনে, এখনের বাইরেও নাগরিক জীবনের উন্নয়নে নিয়ত ব্যস্ত যে। জল কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ-এর মত প্রকল্পগুলি তাকে ঘন দিয়ে আসল।

ছোট বড় নির্বিশেষে সকল রকম ক্রেতার কাছে সহজেই ঘরে পৌঁছে যেতে পারে ইস্পাতের জোগান, সেল-এর কেন্দ্রীয় বিপণন সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য সেই দিকে। ক্রেতাকে সেবা করতে আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত।

সেল থেকে ইস্পাত। আর ইস্পাত থেকে এই নগর আর নাগরিক জীবনের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা।

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
সেন্ট্রাল মার্কেটিং অর্গানাইজেশন
ভারতের সেরা ইস্পাত নির্মাতা

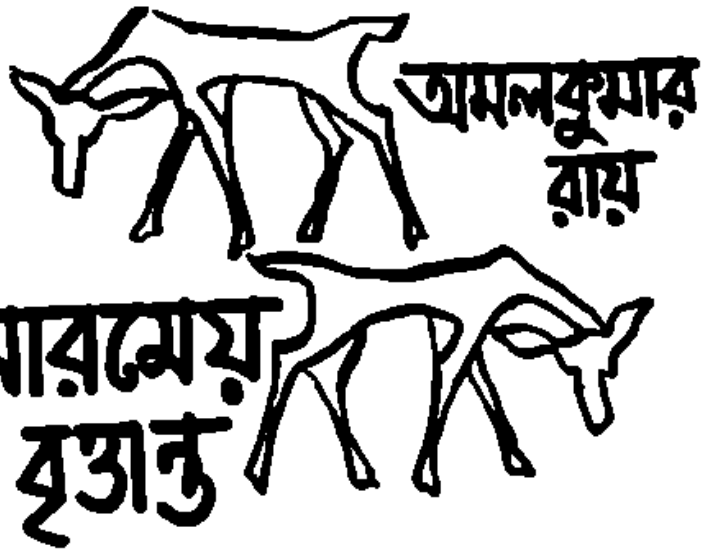

নির্মল আর বিনয় দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেল বিভাগের বিপর্যয়ে দু'জন দু'ডায়েরায় ছিটকে পড়ে। নির্মল লখনৌ আর বিনয় কলকাতায়। তারপর গোমতী ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। নির্মল এখন লখনৌর এক কলেজে অধ্যাপক, আর বিনয় ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই এখন পরস্পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

এই তিন বছর নির্মল যে কলকাতায় একেবারে আসে নি তা নয়, কিন্তু বিনয়ের সাক্ষাৎ সে পায় নি। ঘটনাটা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটল। নির্মল গিয়েছিল সিটি বুকিং অফিসে লখনৌ ফেরার টিকিট কাটতে। সেখানে দেখা হয়ে গেল কলেজ জীবনের বন্ধু সত্তার সঙ্গে। তার কাছেই সে খবর পেল বিনয়ের।

নির্মল পর দিনই সকালে গিয়ে হাজির হ'ল বিনয়ের বালিগঞ্জ ছেলের বাড়িতে। বালিগঞ্জ ছেলের বিশাল বাড়িতে। বিশাল বাড়ি দেখে বন্ধুর প্রতিষ্ঠায় যেমন সে খুশি হ'ল, তেমনি আবার সে আশংকিতও হ'ল। কে জানে, বড়লোক বিনয় কিভাবে তাকে গ্রহণ করে! যাইহোক, বাড়ির সামনে গিয়ে কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত নির্মল গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে সাদা নার্সি বিছানো একটা ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সরকার পৌঁছে বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে কলিং বেল টিপে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাফ প্যান্ট পরিহিত এক ছোকরা এসে দরজা খুলে তাকে চাই জিজ্ঞাসা করে নির্মলকে নিচের একটা ঘরে বসতে বলে তার হাতে ইংরেজিতে ছাপা একটা স্লিপ তুলে দিল। নির্মল খুব্বই এক সিনহা লিখে একটা স্লিপ সেই ছোকরার হাতে দিতেই সে সবিনয়ে জানতে চাইল নির্মল আর কিছু লিখবে কিনা। নির্মল স্থির দৃষ্টিতে একটু ক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এতেই চলবে।'

ছোকরা স্লিপ নিয়ে চলে গেলে। সে ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। এলাহি ব্যাপার! ঝকঝকে ঘরদোর। সুন্দর ছবি, দামী কার্পেট, নৌখিন আসবাব—গৃহকর্তার বৈভবের চিহ্ন সর্বত্র। একটু পরেই সেই ছোকরা আবার এল এবং নির্মলকে আর একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল, কারণ তার সাহেব স্নান করছেন।

দশ মিনিট গেল, পনের মিনিট গেল বিনয়ের আর দেখা নেই। নির্মলের কেমন ধাঁধা ধরে গেল। স্নান করতে মানুষের কত সময় লাগতে পারে!

সামনেই সুন্দর একটা সেন্টার টেবিলে কতগুলো পত্র-পত্রিকা রাখা ছিল। সময় কাটাবার সহজ পন্থা বিবেচনা করে নির্মল একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা তুলে নিয়েছে, পাতা খুলেছেও অবশ্য খানিক, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অন্য গুঞ্জন তার কানের পর্দা করে তুলতে নিয়ে একটা ভিতরের দেওয়ালের দরজা ঠেলে একটি ফুটফুটে নির্মলের উপর বয়সের মেয়ে ঢুকে পড়ল। সে মুহূর্তের মধ্যে কামড়ে ধরল। পাঁ তার কাঁধে হাত পড়ে গেল এবং একই সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদ ঘরের চারদিকে সেই মুহূর্তে ভারী পর্দা সরিয়ে এক পুরুষ এসে ঘরে ঢুকল, আর তার পেছনে একটা সুন্দরী এবং মহিলা। বাহুল্য, এই পুরুষটি হবেন গৃহকর্তা আর মহিলা তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা।

এদিকে ধা সেই ফুটফুটে তখন সে ধরেছে নির্মলের উপর বিনয়ের সঙ্গে ইন্দিরা উঠলেন এতই স্তম্ভিত হয়ে সে এক মিনিট। এসেছে, বাবলা মং কথাই জানে। পরিষ্কার হয়ে ছিঃ।'

বিনয় উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই উ তুলে নমস্কার করে সবাইকে হাসি 'দেখুন, কি লজ্জা! বন্ধুর বাড়িতে, অভ্যর্থনাই না পেলেন।'

তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'তুমিই এ জন্য দায়ী। কত দিন বলেছি, কেউ না থাকলে রাজাকে এভাবে ছেড়ে রাখতে দেবে না। কই রাণীকে তো কখনও এভাবে আমি ছেড়ে রাখতে দিই না।'

ব্যাপারটা সহজ করার জন্য নির্মল এবার কথা বলল। 'বুঝলেন বৌদি, সবই ললাট লিখন। এখন ওসব থাক। আমি হা-পোষা নির্মল। রাজা-রাণীদের ব্যাপারে আমি একেবারে নেই। কি বল, বিনু?'

নির্মলের কথা বলার ধরনে সবাই এক চোট হেসে কিছুটা সহজ হতে পারল।

বিনয়ই প্রস্তাব করল আর দেরি না করে উপরে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসা উচিত। নির্মল কিছু বলার আগেই বিনয় তার হাত ধরে একটা আলতো টান দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। নির্মল বিনা বাক্যে তাকে অনুসরণ করল। বড় ছেলে ফেলে যেমন একটা প্রশান্তি নিয়ে আসে বিনয়ের অকপট ব্যবহারে নির্মলের মনও তেমন একটা কোমল অনুভূতিতে ভরে গেল।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে নির্মলই কথা শুরু করল, 'বৌদি, ছেলেপুলে তো কাউকেই দেখছি না?'

'আমাদের তো একটিই, নাম সংযোজিত, ডাকি শান্তু বলে। সাঁতারের ক্লাবে গেছে। আজ রবিবার তাই একটু দেরি হবে ফিরতে।'

বিনয় এবার নির্মলকে লক্ষ্য করে বলল, 'আচ্ছা নিরু, তুই উর্মিকে বৌদি বলছিস কেন, বলতো? আজকাল বন্ধুর স্ত্রীকে কেউ বৌদি বলে না, সবাই নাম ধরে ডাকে।'

উর্মিলা হেসে বলল, 'তোমাকেও তো উনি 'তুমি' করে বলছেন—আর তুমি বলছ 'তুই'।

নির্মল বিনয়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে উর্মিলাকেই জিগ্যেস করল, 'বৌদি বলছি বলে আপনি রাগ করছেন না তো?'

'আরে, না না না। আপনি আপনার বন্ধুর কথা বলবেন না।'

'সত্যি কথা বলতে কি, ঠিকঠাক হিসাবে বিনয় আমার থেকে এক বছর তিন মাস এগার দিনের বড়। কি বিনু, ভুল করিনি তো?' বলেই নির্মল প্রাণখোলা হাসি হাসল।

এসব কথাবার্তা চলছে এরই মধ্যে বাক বয়েসি একটি লোক টেবিলে ব্রেকফাস্টের সব সরঞ্জাম সাজিয়ে দিয়েছে। উর্মিলা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মধু, তোমাকে আর এখানে থাকতে হবে না। তুমি ওদিকটা সামলাও। বিপিন তো আজ থেকে ছুটি নিয়েছে।'

মধু ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলে আবার আলাপ শুরু হল। বিনয় জেনে নিল, নির্মল সেদিনই রাত্রে লখনৌ চলে যাবে। তবে দুপুরে নাগাদ তাদের সঙ্গে কাটাতে তার আপত্তি তো নেইই বরং সে জানাই সে এসেছে।

'বুঝলে উর্মি, শান্তুর পড়াশুনা করে ক'বছর তো কোথাও আমরা যেতে পারছি না। এবার চল নিরুর ওখানে গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে আসি।'

'এতো স্নেহ না চাইতেই জল। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে?'

'ঠিক বলেছেন নির্মলবাবু। শান্তুর পড়া তো একটা ছুতো। ও তো কোথাও যেতে চায় না তেমন ওর কারখানার জন্য। আর চলছেও একটার পর একটা কাজেলা।'

'আরে তাই তো, আসল কথাটাই তো এখনো জিগ্যেস করা হয়নি। তোমার কিসের কারখানা? আর কাজেলাই বা কেন?'

নির্মল লক্ষ্য করল সেই ছোকরা—যে ধরজা খুলে দিয়ে তাকে নিচের ঘরে বসিয়েছিল—সে উর্মিলার কানে কানে কি বলছে। উর্মিলা স্বাভাবিকভাবে কথা বলার স্বরেই তাকে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'তুই গিয়ে গলার হাত বুলিয়ে আদর করে বল যে, মা আসছে। না খেলে মা খুব রাগ করবে।'

নির্মল কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে উর্মিলা বলল, 'রানী বলে আমাদের আর এক কুকুর আছে একথা শুনেছেন। ওটা যহা জেদি। আমি সামনে না থাকলে কিছুতেই খাবে না।'

'ও আপনার ন্যাওটা বুঝি? আর রাজা বিনুর? এখানে ওরা বেশ জাঁকিয়ে আছে দেখছি।'

'কি করব বলুন: আপনার বন্ধু তো ব্যবসা নিয়েই পড়ে আছে—তার নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। ছেলে বড় হচ্ছে, মার কাছে কতক্ষণ থাকবে? বাড়ির কর্তা বাস—ব্রেকফাস্ট আর ডিনার টেবিল ছাড়া তার সঙ্গে কথা বলাই যাবে না। আমার সময় কাটে কি করে? রাজা-রানী মূক জীব, তবে কৃতজ্ঞ।

মোক্ষম খোঁচাটা বিনয় হজম করাই সঙ্গত মনে করে বলল, 'নিরু স্রোতা ভাল, সন্দেহ নেই। তাই বলে প্রথম দর্শনেই অতো কড়া ডোজ দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

দেখো বিনু, আমাকে সামনে রেখে গৃহদ্বন্দ্ব দানা বাঁধবে—এ আমি কিছুতেই দেখতে পারব না।' হৃদ্য গাম্ভীর্যতরা গলায় উচ্চারিত এই বাক্য বিন্যাসে স্বামী স্ত্রী উভয়েই হো হো করে হেসে উঠলে নির্মলও তাতে যোগ দিল।

ওদিকে থেকে থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠছিল। সে ডাক শুনে উর্মিলাকে যেন কেমন চঞ্চল মনে হল। নির্মল ব্যাপারটা ঠিক ধরে নিয়ে উর্মিলাকে বলল, 'বৌদি, আপনার রানী মনে হচ্ছে আপনার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে আপনার সশরীর উপস্থিতি দাবি করছে। আপনি যান, আমি বিনুর সঙ্গে আছি।'

উর্মিলা সলজ্জ হাসি হেসে একটু দ্রুতই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মল এবার বিনয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বিনু পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে না? এই যেমন, অন্য কলেজের কথা, কলেজের কথা?'

'মনে পড়ে না মানে? সংক্ষেপে বলতে

ছোড়া আর আছে কী? তোর মনে আছে এস আর-এর কথা?'

'আছিও ঠিক ও'র কথা বলতে যাচ্ছিলাম। সুপ্রভাত রায়কে ভোলা যায়? উনি যখনই ক্লাসে আসতেন আমরা বলতাম গুড্ মর্নিং, স্যার। উনি হেসে বলতেন—গুড্ ডে, বয়েজ। ও'র নাম নিয়ে যার করছি বুঝেও একটু রাগ করতেন না। রেট্যোরিকের ক্লাসে কি সুন্দর বুঝাতেন।'

'অনুপ্রাস লাগিয়ে কথা বলা তো তখন আমাদের একটা মজার খেলায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।'

'হাঁ, শোন। নানা কথায় তোর প্রশ্নের উত্তরটাই দেওয়া হয় নি। তিলজলায় আমার একটা ওষুধের ফ্যাক্টরি আছে। শ'খানেকের মত লোক কাজ করে। আর ওরই অফিসে আছে জনা বারোর মত। জামির নেবে অফিস। বছর পনর ধরে চালাচ্ছি। ভালই চলছিল। এর মৌলতেই সব। বাড়ি গাড়ি লোক লস্কর আদব-কায়দা যা দেখছিস সব, সবই এর কল্যাণে। ব্যবসার কিছু জানতাম? বল, নিজু, তাই কোনদিন ভেবেছিলি আমি ওষুধের ব্যবসা করে দাঁড়াব? হাঁ, ডাক্তার হব, এরকম স্বপ্ন এক সময়ে দেখতাম। কি কণ্টটাই না করেছি? সেই যে মাঝখানে কলেজের পাট চুকিয়ে চলে এলাম। তারপর তো আর লেখাপড়াই হ'ল না। সে ব্যথা এখনও ঘুরে ঘুরে যায়। তুই তো জানিস, আর কিছু না থাক ছেলেটা বরাবর ছিল। হতাশা ফ্রাসট্রেশন—এসব ধারে কাছে ঘেঁসতে পারত না।

একটা কিছু করবই, একটা কিছু করতেই হবে, অন্তত সেই একটা কিছু তখনও কিন্তু কোনো অবয়ব ধরে সামনে এসে দাঁড়ায় নি। খাবার ভাবনা নেই, খাবার ঠিক নেই—ছিল শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। কিন্তু কি লাভ হ'ল এসব করে! সারাটা জীবনের শুধু জল করা পরিশ্রম আজ শেষ হতে বসেছে। এক-এক সময় মাথায় আগুন ধরে যায়।'

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে বিনয় যেন কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। নির্মলের নিজেকে কেমন অপরাধীর মতো মনে হ'ল। আর, সত্যি কথা বলতে কি, সে জানবেই বা কি করে বিনয় কোন্ কথায় উত্তেজিত হয়ে পড়বে! অবস্থাটা একটু সামলাবার জন্য সে বলল, 'এসব কথা এখন থাক। আমাদের পুরনো স্মৃতিচারণই ভাল।'

'না না, তোর লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। বরং তোর কাছে সব বলে মনটাকে একটু হালকা করতে পারছি। মোদ্দা কথা হ'ল, কারখানা আর চালানো যাবে না। শ্রমিকরা ধর্মঘটের ভয় দেখাচ্ছে। ওদের দাবি নাকি পুরোপুরি মানতে হবে। না হলে ওরা মালিকের কালো হাত ভেঙে দেবে, গুঁড়িয়ে দেবে।'

'দাবিগুলো কী? তুমি ওদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বল নি?'

'দাবি আশাতে একটাই—বোনাস। বারো পার্সেন্ট বোনাস দিতে হবে। অথচ ছেলো বছর দিচ্ছি এইট পয়েন্ট থ্রী থ্রী।'

'তা হলে আর এতো চিন্তা করছ কেন?'

'কি জানিস তুই? ওদের চিনিস? একবার দুর্বলতা দেখিয়েছিস কি তোকে ছিঁড়ে খাবে। সামনের বছর চাইবে আরও বেশি। খাই বেড়েই চলবে। অন্তত তোকে কিন্তু একদিন থামতেই হবে। তাই থামা আমাকে একটা দিতেই হবে।'

'তুমি এ ভাবে দেখছ কেন? জোকাররা ওষুধের মতো আচরণ করবে? যা খুশি তাই ডিমান্ড করবে, এটা ভাবছ কেন? ওরা নেগোসিয়েশন করছে। তা তো করতেই পারে। নেগোসিয়েশন করা আর জোর করা তো এক জিনিস নয়। তোমার কথায় তো মনে হচ্ছে তুমি লক্-আউটের চিন্তা করছ। আমার ভাবতে খারাপ লাগছে, তোমার সিদ্ধান্ত অতোগুলো মানুষকে কর্মহীন করে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। না না, তুমি আলোচনার পথটা বন্ধ করে দিও না।'

'আলোচনা হয়েছে। তবে ওরা আর আগের মতো নেই। ওদের কথা—ওদের ভাষাই ব্যবসার বাক্‌বাহুল্য। আশ্চর্য! আমার দেবার, আমার ক্যাপিটাল, আমার ম্যানেজারিয়েল এফিসিয়েন্সি—এসবের কোন মূল্য নেই? পারছিস তোরা এসব ছাড়া কিছু করতে শুধু তোদের শ্রম দিয়ে? শ্রম দিয়ে পুকুর কাটা যায়, কয়লিখানা পরিষ্কার করা যায়—প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না।'

'এটা তোমার রাগের কথা। সব কিছুরই প্রয়োজন। একটা ছাড়া অন্যগুলো অচল। তবে, হাঁ, সমন্বিত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তুমি কো-অর্ডিনেটিং এফেক্টস। এই কো-অর্ডিনেশন ঠিক থাকলে সব ঠিক। কি, অস্বীকার করতে পারবে?'

'কোথায় ঠিক? সব সময় টেনশন। অন্ত আমার কত পর্ব ছিল। হাজার হোক, অতোগুলো লোক তো করে খাচ্ছে। ওরাও এসব কথা আমাকে বলত। আমারও একটা বাড়তি দায়িত্ব ছিল। আমি মনে করতাম, আমি একটা বড় পরিবারের কর্তা। আর আজ? ভালই হ'ল, আমার দায়িত্ব গেল।'

'তুমি কিন্তু বুঝতে চাইছ না। একটা বোনাসের সাময়িক দাবি তাকে তুমি স্থায়ীভাবে ফেস কর। তোমার সঙ্গে ওয়াকারদের হ্যাপোর্টও ভাল। এ কাজে লাগাও। আর কারখানার সম্প্রতিতে তুলোদের দাবি মিটিয়ে দাও।'

'সম্প্রতি অসম্প্রতির প্রশ্ন নয়। আমার সম্প্রতি আছে বলেই সব দিয়ে দিতে হবে? দাবি তো দাবার করতে বসিনি। আমার অন্য পরিকল্পনা রয়েছে—নতুন প্লান্ট করার পরিকল্পনা। একেবারে মডার্নাইজড্ প্লান্ট। সহারাষ্ট্রে ওষুধের আধুনিক প্লান্ট হতে পারলে এখানে হতে দোষ কি? এতে তো স্টেটেরই ইন্টারেস্ট বাড়বে। তা, কে বুঝাবে এসব কথা ওদের!'

'দেখ বিনু, তুমি যা বলছ, যেভাবে ব্যাপারটা দেখছ তা মানা যায় না। তোমার সম্প্রতি আছে তবু তুমি দেবে না, কেন না, ওদের লোভ বেড়ে যাবে। আমি

যদি বলি, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না, লোভ তো আগেই তোমার ঘেড়ে বসে আছে। তুমি এতটার জায়গায় আরও একটা কারখানার কথা ভাবছ—যা হবে আরও ভাল, আরও আধুনিক। অর্থাৎ তোমার আরও অর্থ, আরও খ্যাতি, আরও প্রতিপত্তি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার এখানে এসে, তোমাকে দেখে আমার আনন্দ যেমন হয়েছে, গর্বও তেমনি হয়েছে। তুমি যেভাবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে সার্থক হয়েছ তা তো একটা যে সে ব্যাপার নয়। জীবনকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ তোমার হয়েছে। তাই, সাধারণ ছোট খাওয়া মানুষের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি হবে অনেক স্বচ্ছ, তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তোমার মনোভাব হবে অনেক উদার, আর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তুমি হবে অনেক সংবেদনশীল। এরকমটা আশা করাই তো স্বাভাবিক, তবে তুমি প্রভু আর তোমার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব মানুষ তোমার ভৃত্য, এই দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকলে সংঘাত অনিবার্য।'

আবেগের বশে নির্মল হয়তো তার বক্তব্য আরও দীর্ঘায়িত করত, কিন্তু উর্মিলা এসে পড়ায় সে থেমে গেল। অবশ্য একটা ভয়ও তার মনে কাজ করছিল, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না তার বক্তব্য বিনয়ের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই থামতে পেরে মনে মনে সে খুশিই হল। নির্মলের বুদ্ধি কিংবা তার আবেগে বিনয়ের বিশ্বাস আদৌ চিড় খেল কিনা তা বোঝা গেল না। সে উর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বুঝলে উর্মি, এতক্ষণ নিরু ধরে নিয়েছিল যে, আমি তার ক্লাস রুমের একটি সুবোধ ছাত্র। তুমি আর একটু আগে এলে আর একটু আগে আমার ছুটি মিলত।' কথাগুলো বলে নিজের কৌতুকে নিজেই হো হো করে হাসতে লাগল।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর উদ্দেশ্যে নির্মল উর্মিলার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি বৌদি, রানীর মান ভঞ্জন হল?'

উর্মিলা হেসে বলল, 'তা যা বলেছেন। কি জেদ ওনের? ঠিক সেই ধরে বসেছিল। আমাকে দেখে তারপর মুখের ঘাটিতে মুখ দিল।'

'রানীর ব্রেকফাস্টের মেনুটা একটু জানতে পারি?'

'যা ভাবছেন তা নয়। রাজা-রানী দুজনেই খাবার ব্যাপারে খুব লক্ষ্মী। দুধ পাউরুটি, দুধ কর্নফ্লেক্স, পরিষ্কার এই আর কি! তবে এক লিটার দুধ ওরা একেক জন লেহ নেড়েই তুলে দেয়।'

'বড্ড লোভ লাগিয়ে দিচ্ছেন, বৌদি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এখানে এসে আস্তানা গাড়লে এ আদর পাব তো?'

কারখানা সংক্রান্ত আলোচনায় নির্মলের শান্ত আত্মসমাহিত সংযত বুদ্ধিপ্রয়োগ বিনয়কে কিছুটা কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সে ধারণা করতে পারে নি যে, নির্মল এভাবে মাথা গলাবে। তাই আচমকা সে তার সমস্যা তুলে ধরতে চেয়েছিল। সমর্থন পেলে মনের জোর তার বাড়ত। এক্ষেত্রে ফল হল উল্টো। কিন্তু এ নিয়ে নির্মলের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতেও তার মন সায় দিল না। নির্মলের সঙ্গে উর্মিলার কথা-বার্তায় যে হাল্কা মেজাজটা ছিল তাকেই বিনয় আর একটু উস্কে দেবার জন্য বলল, 'নিরু তুই শুধু ব্রেকফাস্ট নিয়েই ভাবছিস। লাঞ্চ ডিনারের খবরটাও জেনে নে।'

উর্মিলাকে যেন একটু বিব্রত মনে হল। গলা একটু চড়িয়ে সে বলল, 'আপনার বন্ধুকে জিগ্যেস করুন নির্মলবাবু, এসব আমদানি করেছিল কে? জানেন, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বলে, যাও নীচে গাড়িতে তোমার দুই সহচর-সহচরী বসে আছে। অচার্চনা করে ওদের নিয়ে এসো গিয়ে। আমি তো অবাক। গিয়ে দেখি—রাজা-রানী—তখন কতো ছোট—বসে আছে। একদিনে তো আর হয় না। আস্তে আস্তে লোক যায়ার জড়ায়। আর নিজে কি করে? দুটো লোকই ফেঁসেছে এদের জন্য। ঐ ব্রেকফাস্টা দেখলেন—পরেশ—আর এক জন—ঐ পরেশেরই এক মাসি, ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত খাবার তৈরি করার সব দায়িত্ব ঐ মাসির।'

বিনয় যে এসব কথাবার্তা উপভোগ করছে তা তার মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল। সে বলল, 'নিরু, তুই-ই বল? একেবারে রিয়াল ম্যাস্টিক। ইমপোর্টেড। দামটা তো আর তোর বৌদিকে বলিই নি। এদের একটু যত্ন করতে হবে না?'

'এবার নির্মলের বিশ্মিত হবার পালা। সে প্রশ্ন করল, 'বল কি? কোত্থেকে আনিয়েছ?'

'কেন ওদের জন্মভূমি, মানে ইংল্যান্ড থেকে। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু আছে—খাণ্ডেলওয়াল—সেই এনে দিয়েছে। দামও অনেক কম পড়েছে। কলকাতার ডজ লাভারদের তালিকায় খাণ্ডেলওয়াল এক বিশিষ্ট নাম।'

'দামটা একটু শুনতে পারি? স্রেফ কৌতূহল।'

'দাম অনেক হতো, কিন্তু ওই যে বললাম খাণ্ডেলওয়াল এনে দিয়েছে। তাই কাস্টমসকেও আর গুণোগার দিতে হয়নি। চেন কেনার শুদ্ধ দশ হাজারেই হয়ে গিয়েছে।'

'দশ হাজার!' উর্মিলা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'কেন হবে না? সেভিংস দেখবে না? আর ভেবো না ওটা একটা অ্যাডিক্সাম প্রাইস। বছর খানেক আগে গুণোগাররা আনিয়েছে। তাও দেওয়ার পায় নি। একটার জন্যই দিতে হয়েছে দশ হাজার। তার উপর কাস্টমস। নিজেরা মাতব্বরি করতে গিয়েছিল খাণ্ডেলওয়ালকে বেঁকিয়ে দেবে বলে। তা, দেখাবে আর কি! উল্টে, গুণোগার।'

'মাথা খারাপ করে দেবার মতো কথাবার্তা শুরু করেছ। এখন থামো। দেখছ না, নির্মলবাবু কেমন নীরব হয়ে গেছেন।' উর্মিলার দৃষ্টিকে নির্মল মনে মনে তারিফ

না করে পারল না। সে ওদের কোথায় থামতে হবে।

সেই মুহূর্তে সুদেষ্ণ সপ্রতিভ সদা কৈশোরোত্তীর্ণ একটি ছেলে দ্রুত ঘরে ঢুকে নির্মলকে দেখেই থেমে গেল। ঊর্মিলা বুঝতে পেরে পরিচয় করিয়ে দিল, 'তোমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। লখ্‌নৌ থেকে এসেছেন।'

আর কিছু বলার আগেই শানু নির্মলকে প্রণাম করতে গিয়ে নিচু হতেই নির্মল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কখন থেকে তোমাকে দেখব বলে অপেক্ষা করছি। কতো বড় হয়ে গিয়েছ, এরই মধ্যে বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছ দেখছি।' তারপর শানুকে কাছে বসিয়ে কথা বলতে লাগল। শানুর সহজ সরল কথা বলার ধরন, তার নম্র বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে অল্প সময়েই নির্মল মুগ্ধ হয়ে গেল।

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। নির্মল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। আর বেলি দেরি হলে দুপুরেও গড়াবে। হাতের কাজ তাহলে সে আর শেষ করতে পারবে না। নির্মল বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালে বিনয় ঊর্মিলা শানু সবাই ওকে একেবারে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। নির্মল হাত বাড়িয়ে বিনয়ের হাত ধরে খানিকটা কাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এ-যাত্রা এ-পর্যন্ত। অল্প সময়েই অনেক উপদেশ দিয়ে ফেলেছি। কিছু মনে করো না।' তারপর ঊর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বৌদি, বিকবান বন্ধুকে বিদায় করলাম না বিত্তও করলাম, এ বার্তা দয়া করে পাঠাবেন।'

বিনয় হেসে বলল, 'অপূর্ব তোর এ অন্তিম অনুপ্রাস!'

সেদিন সন্ধ্যায় শানু ঊর্মিলাকে জানাতে ভুল করল না যে, নিরুকাকুকে তার খুব ভাল লেগেছে। সে আরও বলল যে, বাবাকে কাছে পেয়েও তার মনে হয় বাবা অনেক দূরের, আর অচেনা নিরুকাকু দূরে থাকলেও তাকে তার খুব কাছের মনে হচ্ছে। মুখে না বললেও মনে মনে ঊর্মিলা ছেলের বিচারের প্রশংসা না করে পারে নি।

নির্মল লখ্‌নৌ ফিরে যাবার পরপরই কারখানার ঘটনা দ্রুত মোড় নিতে শুরু করল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নিম্নমাফিক দাবিসনদ পেশ করা হলে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনাস্থা দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে উপেক্ষা করল। তখনও পুজো মাসখানেক বাকি। বাধ্য হয়ে ইউনিয়ন স্ট্রাইকের নোটিশ দিল। সেদিন স্ট্রাইক নোটিশের সময়-সীমা শেষ হবার কথা সেদিন সকালে প্রত্যাশিত লক-আউটের বিজ্ঞপ্তিটি কারখানার গেটে সবাই দেখতে পেল।

বিনয় মনস্থির করেই রেখেছিল। নির্মলের যুক্তি বা অনুরোধ কোনটাই তার মনে কোনো দাগ কাটতে পারে নি। ওয়াকারদের বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে সে বদ্ধপরিকর। পুজোর আগেই লক-আউটের এ সিদ্ধান্তও ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে ঊর্মিলার সঙ্গে মতবিনিময় সে করে না। ঊর্মিলা ঘটনাটা জানতে পারল এই মাত্র। লক-আউটের নোটিশ সই করে বিনয় আর একটা কাজও করল। সে নির্মলকে একটা চিঠি লিখে বক্তব্য এইরকম:

'নিরু, তুই যা চাস নি সেই অনভিপ্রেত কাজটাই শেষ পর্যন্ত করতে হ'ল—অর্থাৎ কারখানা বন্ধ করে দিতে হ'ল। বিশ্বাস কর, আমার আর উপায় ছিল না। পুজোর ছুটিতে এলে খুব ভাল হয়। তখন সব বলতে ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে পারব।'

চিঠি পেয়ে নির্মল যে খুব একটা আঘাত পেল তা নয়। সে এরকম একটা ধারণা নিয়েই কলকাতা থেকে ফিরে এসেছিল। হবে বা তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল তা হ'ল বিনয়ের মানসিক পরিবর্তন। কি নরম প্রকৃতির ছেলেই না ছিল বিনয়। নীচু ক্লাসে মাস্টার বসাইয়া ছেলেদের শাসন করলে ও কেঁদে ভাসাত। ওদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর বলি ও কোনদিন দেখতে পারত না। বিনয়রা নির্মলদের আগেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল। ওরা দু'জনেই তখন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিদায় নেবার সেই মুহূর্তে বিনয়ের কান্নার কথা নির্মল আজও ভুলতে পারে নি। সেই বিনয় কেন আজ হারিয়ে গেল? অতোগুলো মানুষকে কি করে সে এমন বন্যার মুখে ঠেলে দিতে পারল? হঠাৎ করে এতো বছর পর বিনয়ের সঙ্গে দেখা না হলে কি হতো? স্মৃতির সেই ছবি তো তাহলে এমন খানখান হয়ে ভেঙে পড়তো না।

কিন্তু না, নির্মলকে আবার বিনয়ের বাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল। শানু বিওয়ার চিঠি দিয়ে লিখেছে, নিরুকাকুকে দেখার খুব ইচ্ছে তার। বাবার সঙ্গে রাগ করলেও সে যেন তাকে ভুলে না যায়। কি সুন্দর ছেলেটা, কি বুদ্ধি! কি করে বুঝল যে ওর বাবার সঙ্গে রাগ। ওর মা হয়তো বলে থাকবে। ঊর্মিলাও কিন্তু বেশ। বড়লোকের স্ত্রীর গরিমা নেই একেবারে। চিঠি পেয়ে নির্মলের মনের মেঘ কেমন যেন কেটে গেল। অল্প সময়ের দেখা, তবু কেমন মায়া জন্মে গেছে ছেলেটার উপর। আসলে এসব সম্পর্ক তো স্বার্থহীন ভালবাসার সম্পর্ক, তাই মনের গভীরে নাড়া দেয়।

দিনটা ছিল দেওয়ালির পরের দিন। সকালে নির্মল কলকাতায় এসেছে বিনয়ের বাড়িতে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে। সন্ধ্যার কিছু পরে সে বেরিয়ে পড়ল বিনয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ির গেট পার হয়ে পরিচিত সেই নুড়ি বেছানো পথে পা দিয়েই তার মনে হ'ল বাড়িতে লোকজনের যাতায়াত আজ বেশি। অন্যবারের আলোগুলোও জ্বলছে। কি ব্যাপার কে জানে! হতে পারে, ছেলের জন্মদিন। বড়লোক হলে কথা। আগের দিনে তো পুতুলের বিয়েতেও বড়লোকেরা দু'হাতে টাকা খরচ করতো।

নির্মল সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা লোতলায় পড়তেই তার সঙ্গে উর্মিলার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নির্মলকে অভ্যর্থনা করে সে বলল, 'না হয় বন্ধুর সঙ্গে রাগ করেছেন, তা বলে আমরা কি দোষ করলাম? ছেলেটা তো কাল্লু কাল্লু করে অস্থির। আজ কতবার আপনার কথা ছেবেছি।'

নির্মল হেসে বলল, 'ওসব রাগটাগের কথা বাদ দিন। শানু কোথায়? বিনু আছে তো?'

'দু'জনই আছে। শানু একটু বাইরে গেছে, এখনই এসে পড়বে, আর উনি……' বলতে বলতেই বিনয় এসে হাজির হল। নির্মলের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চিঠিপত্র নেই, ছেবেছিলাম তোর মোদ্দা ভাতে নি। তোকে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। যা ছেয়ে এই কদিন!' তারপর উর্মিলার দিকে চেয়ে বলল, 'নিনুকে এখানেই দিয়ে যাও। উপরে টানা হেঁচড়া করে আর কি হবে।'

উর্মিলা একটু চুপ করে থেকে 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। নির্মল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বলো তো? এতো আলো, লোডশেডিং? তুমি বললে, খুব কষ্ট গেছে কদিন? শেষ পর্যন্ত লঙ্-আউট উঠেছে তা হলে?'

'না না, এমনি কয়েকজন বন্ধুকে বলে-ছিলাম। পুজোর পরে গেট্ টুগেদারের মতো আর কি!'

বিনয় নির্মলকে আরও জানাল যে, পুজোর ছাদের লখনৌ যাবার খুব ইচ্ছা হলেও নানা বাধায় তা আর হয়ে ওঠে নি। এসব কথার মধ্যেই উর্মিলা থালায় করে নির্মলের জন্য খাবার এনে তার সামনে টেবিলে রেখে বলল, 'সেবার আপনি না খেয়েই চলে গেছলেন। এবার ছাড়ছি না।' বলেই সিঙ্কের আলাদা ড্রয়ার থেকে কয়েকটা খাবারদাবার বাটি বার করে নির্মলের থালার সামনে সাজিয়ে দিল।

নির্মল ওটা দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছ বিনু, বৌদি এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে চাইছেন। প্রথম, সেদিন ছেলেও আপ্যায়ন করিনি তার ফোরফর দিচ্ছেন। দ্বিতীয়, তোমার সঙ্গে আমার যে বিবাদ তা তিনি অনুরাগে পরিণত করতে চাইছেন। তা না হলে এতো রকম খাবার এতো পরিমাণে কেউ কাউকে দেয়। এর সামনে মহাভারতের বকরাক্ষসকেও ছিপ্রমি খেতে হবে।'

'হয়েছে, এখন খান। আপনি অধ্যাপক, কথায় পারব না জানি। পরা করে হাত লাগান।'

'সীতা, সাধে মধুসূদন বলেছিলেন— 'বাঙালী মায়ের হৃদয়!'

নির্মল তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে দেখে বিনয় ও উর্মিলা যেন স্বস্তি পেল। খেতে খেতেই নির্মল তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কিছু মন্তব্যও করে যাচ্ছিল। খাওয়া তখন প্রায় শেষ। নির্মল বলল, 'বৌদি, এ কম্বিনেশনটা তো বেশ বের করেছেন— খিচুড়ি আর পাঁঠার মাংস! অবশ্য দুটোই হয়েছে অত্যন্ত উপাদেয়।'

'না, মানে আমাদের—' উর্মিলার কথার মাঝখানেই বিনয় একেবারে কাশিয়ে উঠল, 'কি বকতে শুরু করেছ? ওকে খেতে দেবে না কী?'

নির্মল বিনয়ের এই হঠাৎ উত্তেজনার কারণ না বুঝতে পেরে বিস্ফারিত চোখে উর্মিলার দিকে তাকাল। উর্মিলা আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল, 'আপনি তো জানেন না, আমাদের রাজা আর নেই। ওই এসব খেতে ভাল ভালবাসত। তাই—।' উদ্গত অশ্রুর বেগে সে আর কথা শেষ করতে পারল না।

নির্মল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠল। তার মনে হল, তার মাথার সমস্ত শিরা ফেটে রক্ত বেরুবে। স্থান কাল পাত্র ভুলে গলার স্বর সপ্তমে তুলে সে বলে উঠল, 'কি বললেন? রাজা মানে আপনাদের সেই কুত্তা? কুত্তার শ্রাদ্ধ! হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!'

নির্মল প্রায় ছুটে মুখ ধোবার বেসিনের কাছে গিয়ে গলার আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলল। তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। উত্তেজনায় শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। একহাতে চোখ ঢেকে কোনোক্রমে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'ওঃ, কি সাংঘাতিক! কি হৃদয়হীন! শতাধিক মানুষকে তাদের অন্নদাতার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে কুত্তার শ্রাদ্ধ! ওঃ ওঃ।'

বিনয় ও উর্মিলাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে ক্রুদ্ধের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আলোকোদ্ভাসিত নুড়ির পথ ধরে নির্মল ছুটতে লাগল। যেন এ বাড়ির গন্ধ না পেলেই তার মুক্তি নেই। □

With best compliments from

Jalpaiguri Co-operative Land Development Bank Limited

THANA ROAD ✱ JALPAIGURI

ফোন : ৬০-২৬৫৪

সমবায়ী অভিনন্দন সহ :

কাসুন্দিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১২২/১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা :—

- সকাল এবং সন্ধ্যা উভয় সময়েই ব্যাঙ্ক খোলা থাকে।
- নাবালকের নামেও টাকা জমা রাখা যায়।
- সই করিতে না পারিলে টিপ সই দিয়া টাকা জমা রাখা যায়, অবশ্য ইহার জন্য তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো লাগিবে।
- আমাদের ব্যাঙ্কে প্রতিটি প্রকল্পের সুদের হার অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি।
- ডিপজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার নিকট আপনার রাখিত গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তার জন্য বীমা করা আছে।
- জরুরি প্রয়োজনে আপনার স্থায়ী আমানত অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট ক্যাশ সার্টিফিকেট হইতে ঋণ পাইতে পারেন।
- স্থায়ী গচ্ছিত করিলে প্রতি তিন মাস অন্তর সুদ তুলিতে পারিবেন।
- স্বর্ণালঙ্কার অথবা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ পাইতে পারেন।
- আপনার মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য "সেফ ডিপজিট লকার"-এর ব্যবস্থা আছে।
- সহজ মাসিক কিস্তিতে সেলাই মেশিন, পাখা, টি ভি, ফ্রিজ, সাইকেল, স্কুটার ও আসবাবপত্র পাইতে পারেন।
- ব্যাঙ্কের সদস্যগণের জন্য পুরী, দীঘা ও বকখালিতে "হলিডে হোম"-এর ব্যবস্থা আছে।
- হাওড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসার জন্য দুইখানি শয্যার ব্যবস্থা আছে।
- ব্যাঙ্ক পরিচালিত "স্বাস্থ্য কেন্দ্রে" সামান্য ব্যয়ে সদস্যগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে ১টা পর্যন্ত এবং রবিবার ও সোমবার ছাড়া সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত "স্বাস্থ্য কেন্দ্র" খোলা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রকাশিত বই —

	বই-এর নাম	লেখক	বর্তমান মূল্য
১।	ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যাক্ট রাইট টেস্ট কো-অপারেটিভ স	অমিয় মজুমদার ও সত্য ব্যানার্জি	৮৫·০০
২।	সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন (২য় সংস্করণ	অসীম রায়	২৫·০০
৩।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ও প্রয়োগ বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিয় মজুমদার ও সুনীল মিত্র	১০·০০
৪।	সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ	প্রবীরেশ লাহিড়ি ও অরুণ চক্রবর্তী	২০.০০
৫।	আন ইন্‌ট্রোডাকশন টু ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯৮৩ (নিঃশেষিত) এ্যান এ্যানোটেটেড অফ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস—১৯৮৭ (নিঃশেষিত		
৭।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী (নিঃশেষিত	অসীম রায়	
৮।	মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সমবায়	নির্মল বসু	০·৭৫
৯।	সমবায় ও কৃষক আন্দোলন	নির্মল বসু	০·৫০
১০।	সেলফহেল্প সহায়ক (অনুবাদ)	উষা ভৌমিক	৮·৫০
১১।	রিঅর্গানাইজেশন অফ রুরাল ক্রেডিট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডা ডি ডি রায়	৫৫·০০
১২।	অনুসন্ধান সমবায়ের নানা দিক	মণিকা পালিত	১২·০০
১৩।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (১৯৮৩) প্রসঙ্গে		৮·০০
১৪।	সমবায় সমিতি নিরীক্ষণ পদ্ধতি (নিঃশেষিত)	রতন সুন্দর ও রূপনারায়ণ সাউ	
১৫।	সমবায় বিষয়ক বিবিধ কমিটি	অসীম রায়	৫০·০০
১৬।	সমবায় আবাসন	অমিয় মজুমদার	১০.০০
১৭।	সমবায়ে মহিলা	—	১.৫০

বইয়ের মূল্য অগ্রিম পাওয়া গেলে ডাক যোগে বই প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। তাছাড়া রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সিটি অফিস কাউন্টারে প্রতি কাজের দিন ৩টা পর্যন্ত বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২০এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল),

কলিকাতা-৭০০ ০০১

মহাশয়,

উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে টিক চিহ্নিত বইগুলি আমার নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাবেন। ডাক খরচ বিল ছাড়াবো। আমি আনি অর্ডার যোগে.....টাকা এ বাবদে পাঠালাম।

নাম.....

গ্রাম.....ডাকঘর.....

জেলা.....পিন কোড.....

স্বাক্ষর ও তারিখ

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

4, N. C. Dutta Sarani
Calcutta-700 001
PHONE NO—20-0841

★

An Organisation

Of the Employees, By the Employees, For the Employees of United Bank of India. Serving more than 12,000 Employees of United Bank of India for more than 42 Years. Enjoy comfortably in our Holiday Homes at Puri, Darjeeling, Varanasi, Rajgir, Digha, Ghatsila & Calcutta.

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক

দি জলপাইগুড়ি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৯

হেড অফিস ঃ—টেম্পল ষ্ট্রীট, জলপাইগুড়ি

আমাদের পঞ্চশীল ঃ

- সব রকম আমানতের উপর ১/২% সুদ বেশি
- সঞ্চয় ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স স্কীমে সুরক্ষিত.
- চেক ডিপোজিট লকারের সুবিধা.
- ৫৩ মাসে কাশ সার্টিফিকেট জমার দ্বিগুণ
- আমানতকারীদের সেবাই আমাদের ব্রত.

ব্রাঞ্চ ঃ জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাজরাজগঞ্জ

সকলের মান সমান হউক * সকল সমবায়ের সংগঠন সমান হউক

সকলের মিলনভূমি এক হউক

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

সত্যজিত বসু
সভাপতি

॥ সমবায় প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের যৌথ উদ্যোগের প্রতীক ॥

কৃষক সমবায় প্রতিষ্ঠান হতে চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁতে চাষ করতে
হয় একত্রভাবে। সার, কীটনাশক দ্রব্য, বীজ, জলসেচ ইত্যাদি
সবকিছুই যৌথ কৃষক একত্রভাবে সংগ্রহ করে।

★

আমরা কিন্তু
সেই নিঃসঙ্গ কৃষকের একমাত্র সঙ্গী বলতে পারেন।
উন্নতমানের বীজ থেকে শুরু করে শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয় সব কিছু
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করে থাকি। শস্য সংরক্ষণ করে থাকি
বারসারী মহল হতে দূরে—বৃষ্টি, আলো
হাওয়ার মত।

মাটির কাছাকাছি কৃষকের
কাছাকাছি এই

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন অ্যাণ্ড
মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

● কৃষকের স্বার্থে নিয়োজিত ●

জি টি রোড, পোঃ সেমারি, জেলা : বর্ধমান

"একা এক সূন্যমাত্র নাই অবলম্ব
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ—"

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই সাধারণ মানুষের
সাথে এগিয়ে চলেছে 'সমবায়'।

সমবায় ব্যাঙ্ক তারই দ্যোতক। আপনার সহায়তাও আমাদের কর্তব্য।

সর্বসাধারণের জন্য সবরকম আমানতের ওপর ½% বেশি সুদ / আমানত বীমা দ্বারা
সুরক্ষা / সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা রয়েছে।

তৎপর পরিষেবা আমাদের লক্ষ্য।

কৃষক / বয়নশিল্পী চাকুরীজীবী / তপসিলী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক
ঋণ-এর প্রকল্প রয়েছে।

আপনার নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন

আরামবাগ, খানাকুল, খামারগাছি, চুঁচুড়া, চাঁপাডাঙ্গা,
জাঙ্গীপাড়া, তারকেশ্বর, ধনিয়াখালী, পাণ্ডুয়া, বাঁশবেড়িয়া।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

চুঁচুড়া, হুগলি

১৯২১ খৃষ্টাব্দ।

বাংলার বিপ্লববাদের হাওয়া তখন তুঙ্গে।

তরুণ ডাক্তার হেমন্ত রায়। সবে এম বি বি এস পাশ করে বাবার উদ্যোগে চেম্বার খুলে বসেছে। তখন টোথিস্কোপ কাঁধে ফেলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবীশ হিসাবে হাজিরা দিতে হচ্ছে। চেম্বারে রুগি অপেক্ষা বন্ধু-বান্ধবের আসা-যাওয়া-অনেক বেশি। তার মধ্যে দু-চারজন বিনা পয়সার রুগিও আছে। তবে তরুণ ডাক্তারের বিশ্বাস তার 'প্র্যাকটিস' খুব তাড়াতাড়ি জমে উঠবে।

সেটা ছিল কার্তিক মাস···।

রাত্রি তখন ৯টা। একটু শীত শীত ভাব। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। ডাক্তার হেমন্ত রায় তখনও বসে আছে চেম্বারে। ঘর ফাঁকা। যেন কার জন্য অপেক্ষা করছে ডাক্তার। একটু যেন চঞ্চল মনে হ'ল ডাক্তারকে। ঘড়ি সমেত হাত চোখের সামনে এনে দেখলো ঘড়ির কাঁটা ৯·০৫ মিনিটের ঘরে। একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার···, আবার ফিরে গেল নিজের চেয়ারে।

ঠিক এই সময়·····।

সারা অঙ্গে বোরখা ঢাকা এক মহিলা ধীর পায়ে ঘরে এলো।

ডাক্তারের চক্ষু কুঞ্চিত হ'ল। তরুণ ডাক্তার একটু চঞ্চল হ'ল।

মুসলমান তরুণী মহিলা···, সঙ্গে দ্বিতীয় কেউ নেই·····।

ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাবে·····।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুখের বোরখা খুলে মহিলা সরাসরি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল···, মৃদু কণ্ঠে বললো আমি কিন্তু রুগি নই·····।

তার স্থির মুখমণ্ডলে একটা যেন হাসির ঝিলিক·····।

চমকৃত করলো ডাক্তারকে···। তার ঐ হাসিমাখা মুখমণ্ডল, সুন্দর মুখ আর সহজ কথার ভঙ্গীমা।

ডাক্তার আবার যেন কি বলতে গেল·····।

তার আগেই সে অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বললো—আমি একটা সংবাদ এনেছি। এক টুকরো কাগজ সমেত হাতখানা এগিয়ে দিল ডাক্তারের দিকে।

—মনে হয় আজ এতক্ষণ আপনি অপেক্ষা করছিলেন এর জন্যই ? কাগজটুকু নিতে স্থির মেয়েটির আঙুলের স্পর্শ লাগলো। ডাক্তারের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল সেই স্পর্শে। মেয়েটির মুখ কিন্তু নির্বিকার। কাগজটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলো ডাক্তার·····

—"হেমন্ত, আগামীকাল···সন্ধ্যা ৭টা ···কলযোগান বাঁচি··· জায়গাটা তুমি জান। আসতে দেরি করবে না।"

ইতি

ইঙ্গিত

চোখ তুলে তাকাল ডাক্তার·····।

তোমার তো চিনলাম না···।

নাম···? কোথায় থাক ?

মেয়েটির মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। মৃদুকণ্ঠে বললো—আমি আপনাকে চিনি। নাম ধামও বলা নিষেধ তবু জানাই, আমার নাম সন্ধ্যা। আর কোন পরিচয় দেওয়া যাবে না। পরে হয়তো জানবেন। শুধু শুনুন—আমি আপনাদের বন্ধু। যারা ভারতমাতার মুক্তির জন্য আত্মনিয়োগ করেছে তারা আমার কাছে দেবতা।

আমার প্রাণের ঠাকুর·····

আমি যাচ্ছি·····।

ধীর পদক্ষেপে মেয়েটি চেম্বার ছেড়ে চলে গেল যেমনভাবে এসেছিল তেমনি ভাবেই, শুধু ডাক্তারের মনে রেখে গেল একটা তরঙ্গ।

ডাক্তার চঞ্চল হয়ে উঠলো··

চেয়ার ছেড়ে ছুটতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে·····।

এই নির্জন রাত···, ঐ মেয়ে একা কোথায় যাবে···? কোন সাহায্য দরকার কিনা তা জানাও হলো না···। কিন্তু দরজার বাইরে এসে সামনের রাস্তায় ঐ মেয়েটির আর কোন সন্ধান পেল না ডাক্তার। একটা নিঃশ্বাস পড়লো তরুণ ডাক্তারের। ফিরে গিয়ে বসলো নিজের চেয়ারে। তখন একরাশ চিন্তা মনের মধ্যে ভীড় করেছে

ডাক্তার হেমন্ত রায়।

ধনী পিতার পয়সায় ডাক্তারি পড়তে পড়তেই বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশে গেল। বাড়ির কেউ জানলো না·····।

শৃঙ্খলিত ভারত জননীর মুক্তি কামনায় যারা তখন ঘরছাড়া—ছায়াছাড়া তারা হ'ল ডাক্তারের বন্ধু·····।

···এর একটা আকর্ষণ আছে। যে আকর্ষণ ডাক্তারকে নিয়ে যেতে থাকে এক

মোহময় ছোঁয়ের টানে···, এ যেন চুম্বক···। সেই অদৃশ্য টানে ডাক্তার এসে পড়েছে ঘাট পরিয়ায়। এখন আর পিছনে ধাওয়া সম্ভব নয়। সামনে লক্ষ্য রেখেই সাঁতরাতে হবে তীরের আশায়···, আর সে তীর হ'ল ভারতের স্বাধীনতা···। ভারত মাতার মূর্তি·····।

চিঠিখানা আর একবার পড়লো ডাক্তার।

আর একবার চেষ্টা করলো মেয়েটির মুখমণ্ডল স্মরণ করতে।

প্রশ্ন জেগে গেল ডাক্তারের মনে·····কে এই নির্ভিক মেয়ে···

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল বাড়ি যাওয়ার জন্য।

হাঁকছিল—রঘুনাথ?

দিব্যি কৃষ্ণ যুবক রঘুনাথ এগিয়ে এসে ডাক্তারের ব্যাগ হাতে তুলে নেয়। ভালো লাগায় ভরে। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে·····।

ছোট চিঠিখানার নির্দেশ এক চুম্বকের আকর্ষণ।

পরদিন। রাত তখন দশটার কাছা-কাছি।

কলাবাগান বস্তির গোপন খবরটা হাতে পরামর্শ সেরে বাড়ি ফিরছে ডাক্তার ব্রেহৎ রায়।

বহুবাজারের কাছাকাছি আসতেই একটা ঘুসু ডাকে ডাক্তার পিছু ফিরে তাকায় আর বিস্মিত ভাবে দেখে গত কাল রাত্রির সেই মেয়েটি ঠিক তার পিছনে·····।

একখানা চাদর ছুড়ে দিল ডাক্তারের দিকে—'ধরুন এটা।' তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিন। আর সোজা রাস্তায় নয়। আমার সঙ্গে এই গলিতে ঢুকে পড়ুন···।

সত্বর করুন। দেরি করলে বিপদ হবে···।

মেয়েটির কণ্ঠে যেন কঠিন নির্দেশের সুর।

ডাক্তার চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নেয়, আর মেয়েটির পিছু পাশের গলি পথটায় ঢুকে পড়ে।

মেয়েটি বললো—এখন আমার সঙ্গে চলে আসুন দ্বিধা না রেখে।

কিছুটা এগিয়ে ডাক্তার সরু গলিটার চারদিক তাকিয়ে বুঝলো এটা পতিতাদের পাড়া। মনে হলো মেয়েটির পিছু পিছু চলার জন্য মৃদু হাসাহাসিও করছে সব···। কিন্তু ডাক্তারের মনে হ'ল এই মেয়ে তার কোন খারাপ করবে না···। মেয়েটির নির্দেশ শোনা ছাড়া এখন অন্য পথ নেই।

মেয়েটি একটা বাড়ির সামনে থেমে গেল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে—ঠিক আমার সঙ্গে চলে আসুন, কোন রকম দ্বিধা না করে···।

ঐ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে ডাকলো—"দিদি!"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বললো সন্ধ্যা। যেন কি কথা হ'ল ওদের চোখে চোখে। একটু হাসলো দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি। সব কিছু দেখে ডাক্তার যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে দেখে কঠিন চাপা কণ্ঠে সন্ধ্যা বললো—দেখছেন কি, চলে আসুন। তারপর একটু এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ রেখে বললো—আপনার পিছনে পুলিশ ধাওয়া করেছে। কথা বাড়াবেন না—, বিপদ হবে—।

সন্ধ্যা আবার মুখ তুলে হাসি মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল আর ডাক্তারের একটা হাত ধরে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। সন্ধ্যার স্পর্শে ঠিক কাল রাতের মত থাবার তরঙ্গে ডাক্তারের সারা শরীরে যেন তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। একটু কেঁপে উঠলো ডাক্তার।

···মোতলার একটা ঘরের তালা খুলে সন্ধ্যা ঢুকলো—।

ডাক্তারও তার পিছনে ঘরে এলো। ডাক্তার দেখলো···

ছোট ঘর। বেশ রুচিসম্মতভাবে সাজান-গোছান। ছোট একখানা খাট, একটা টেবিল। তার ওপর কিছু খবরের পত্র-পত্রিকা। পাশে একখানা আরাম কেদারা। দেওয়ালে ঝুলছে একখানি ছবি স্বামী বিবেকানন্দের। সন্ধ্যা এতক্ষণ যা করেছে তা একটা দায়িত্ব আর কর্তব্যের তাগিদে। এখন তার মনে হলো—এই মুহূর্তে ডাক্তারের মনের অবস্থার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার···। সন্ধ্যা তাকাল ডাক্তারের দিকে। দেখলো, ডাক্তার তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে। যেন প্রশ্নাতেই ডাক্তারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—তুমি এই গলিকা পাড়ায় থাক সন্ধ্যা—? এবার সন্ধ্যার সারা শরীর কেঁপে উঠলো। স্মরণ করলো মনের ঠাকুরকে। চোখ দুটো নামিয়ে ডাক্তারের প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে বললো—এছাড়া কোন উপায় ছিল না! ঘটনাদার নির্দেশ ছিল তোমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু তা হ'ল না। দেখলাম পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছে। তাই আমার মনে হ'ল এই অবস্থায় বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া ঠিক হবে না। তাই তো আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তুমি ঠিকই বলেছ। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমি আজ এ পাড়ার বাসিন্দা। তবে ভয় নেই—আমি তোমার চরিত্রের কোন ক্ষতি করবে না···।

একটু হেসে বললো—অতীতে আমার জীবনে যাই ঘটুক, আর যে কলঙ্কই থাকুক এখন আমি মাতৃমন্ত্রের দীক্ষিতা—। তাইতো তুমি···, তোমরা আমার বন্ধু—। আমি তোমাদের কাজের সাথী—, কমরেড—।

পরদিন রাত্রিতে ডাক্তার বাড়ি ফিরলো। যে চিন্তা নিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা সে পরশও নিল না—বললো—এটা দলের কাজে—।

চমকে উঠলো ডাক্তার। ডাক্তার বুঝলো সন্ধ্যা তার চেয়ে অনেক বড় কর্মী।

ডাক্তারের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো। গত চব্বিশ ঘণ্টায় তার জীবনে যেন এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল—।

খাবার টেবিলে খাবার রেখে মা অপেক্ষা করছিলেন ছেলের জন্য।

হেমন্ত একটু অপরাধীর মতই আপন মনে বলছে—।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাত করলি কেন রে খোকা—?

ডাক্তার হেমন্ত রায় মায়ের কাছে এখনও খোকাই আছে। মা-বাবার একমাত্র আদরের ছেলে ডাক্তার।

—খুব বেশি কাজ ছিল মা। তাই এত রাত হ'ল।

ছেলে জানে তার জন্য মা কতটা উদ্বিগ্ন। তাই বললো—কাল হতে যাতে রাত বেশি না হয় তার চেষ্টা করবো।

খাওয়া সেরে নিজের ঘরে গেল হেমন্ত।

শুনতে পেলো মা রান্নাঘর বন্ধ করে শোবার ঘরের দিকে গেলেন।

টেবিলের একপাশের আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিল হেমন্ত।

খাওয়ার পর এইভাবে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিছানায় যায়। এটা তার নিত্য অভ্যাস। চোখটা বুজতেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সন্ধ্যার মুখ। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে নাটক ঘটে গেল তা আবার ভেসে উঠলো ডাক্তারের চোখে। যেন শুনতে পেল সন্ধ্যার সেই বজ্রকঠোর কণ্ঠ—"পিশাচ পুলিশ। চলে এসো বাড়ির মধ্যে···। কোন চিন্তা করার সময় নেই···।"

যেন শুনতে পেলো—"ভয় নেই তোমার, চরিত্র আমি কলঙ্কিত করবো না···। আমি ক্ষত্রি···, আমি ক্ষত্রিয়···।"

গত ছাব্বিশ-সাতাশ ঘণ্টার মধ্যে এই মেয়ে। এখন যেন তার কত পরিচিত—। কত আপনার···।

কি দুঃসাহস ঐ একটা চব্বিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ের। পতিতা পাড়ায় বাস করে মনের পবিত্রতাকে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে নিষ্ঠার সঙ্গে, নিঃশব্দে নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে সঁপে দিয়েছে···। ডাক্তারের কাছে এ যেন এক মহা বিস্ময়। প্রশ্ন জাগে মনে ডাক্তার কি পারতো এতটা···। পারবে কি এতটা···?

দিনের পর দিন চলতে থাকে একটা লড়াই-এর মহড়া। আর এই মহড়ার মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের জীবনে হয় নতুন দিনের সম্বোধন। সন্ধ্যার বৈপ্লবিক জীবনধারা আকৃষ্ট করে ডাক্তারকে···। আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে, করে আকর্ষণও···।

কয়েক মাসের চিন্তা-ভাবনা, পরামর্শ-পরিকল্পনা আজ পূর্ণতার···।

এলো সেই প্রতীক্ষিত দিন—।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাস—।

দু'দিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরছে। শহর কলকাতা যেন জলে ভিজে চুপসে গেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে কলকাতা যেন ক্লান্ত—।

একটা বিশ্রামের ঠান্ডার ভাব। কিন্তু এই আবহাওয়াতেও ঠান্ডা হয়ে নেই বাংলার দামাল ছেলের দল।

প্রায় এক বছরের পরিকল্পনা আজ কার্যকরি হবার কথা···।

তাদের অপারেশনের লক্ষ্য পুলিশ কমিশনার টেগার্ট—!

এখনকার বি-বা-দি বাগ।

তখনকার ডালহৌসি স্কোয়ার—।

এই ঠান্ডার পরিবেশেও ডালহৌসি স্কোয়ারের পরিবেশ যেন উষ্ণ। চারিদিকের হাওয়ায় যেন একটা ফিস্-ফিসানি আওয়াজ···।

একটা যেন প্রস্তুতির পদক্ষেপ···

একটা যেন বারুদের মৃদু গন্ধ···।

একখানা ছোট ফিয়েট গাড়ি এসে দাঁড়াল লালদীঘির ধার ঘেঁসে। নিঃশব্দে তিন-চার জন যুবক গাড়ি হতে নেমে পড়লো। এগিয়ে গেল লালদীঘির ধারে—।

গাড়িখানা শব্দ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইভাবে একে একে আট-দশটি যুবক ছড়িয়ে ছিটিয়ে জমা হ'ল লালদীঘির ধারে—, লালবাড়ির বড় ফটকের আশ-পাশে—। লালদীঘির জলে যেন লাল রঙের সংকেত···। লালে-লালে যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে লালদীঘির জল···।

সে রক্ত কত বাঙ্গালীর···, কত ইংরেজের···।

লালবাড়ির গেটের সামনে টেগার্ট সাহেবের গাড়ি থামলো। সোজাই ছিল পুলিশ!

তারপরই·

শব্দে—শব্দে—, বারুদের গন্ধে আর ধোঁয়ার কুন্ডলিতে ছেয়ে গেল চারিদিক। এক রক্তক্ষেত্রে পরিণত হ'ল ডালহৌসী স্কোয়ার···। ছুটে লাল বাড়িতে ঢুকে পড়লো টেগার্ট সাহেব···। বেঁচে গেল তার জীবন···। কিন্তু···

কিন্তু লালদীঘির জল তখন লাল হয়ে যেতে থাকলো বাঙ্গালী যুবকের বুকের রক্তে···।

কয়েকজন বিপ্লবী মৃত্যুবরণ করলো।

বেশ কয়েকজন ধরা পড়লো।

পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কেউ গেল হাসপাতালে···। কেউ গেল জেলে

ডাঃ হেমন্ত রায়ও পুলিশের হাতে ধরা পড়লো·।

প্রথম হাসপাতাল, তারপর নরমন সেন্ট্রাল জেল।

তরুণ ডাক্তার এখন বিচারাধীন বন্দী।

রাজদ্রোহী হেমন্ত রায় বন্দী হয়ে কারাগারে·।

লালবাড়ির গেটের সামনে যে লড়াই শুরু হ'ল তা বিস্তারিত হ'ল সারা কলকাতায়। ইংরেজের পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো এই ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিল তাদের·

পতিতালয়ের সেই মেয়েটি···?

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যারা টেগার্ট সাহেবকে আক্রমণ করলো তারা হয় কেউ মৃত্যুবরণ করলো, কেউ ধরা পড়লো। এখানেই কিন্তু ইংরেজের পুলিশ থেমে থাকলো না। তারা তোলপাড় করে তুললো সারা কলকাতা। কোথায় কোথায় আছে বিপ্লবীদের আস্তানা—কারা এই ষড়যন্ত্রের মূলে তাদের খোঁজ চলতে থাকলো।

সেদিন ঠিক সকাল হয়েছে—।

বহুবাজারের এই পতিতা পাড়ার তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। অনেকেই তখনও বিছানায় কোলে—।

কয়েকখানা পুলিশের গাড়ি গলিটা ঘিরে ফেললো।

পুলিশের বুটের শব্দে পাড়ার মানুষ চমকে উঠলো—।

বাঁহরাগত রাত্রির ভোমিকুল অনেকে এ গলি ও গলি দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। পুলিশ তাদের দেখেও দেখলো না। সদ্যখোলা পানদোকান সবে খুলেছে। তখনও দোকানীর চোখ যেন ঘুমে জড়ান। পুলিশ দেখে সেও চমকে উঠলো।

—সন্ধ্যাবাঈ কোন বাড়িতে থাকে হে—পুলিশের প্রশ্ন!

পানওয়ালা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। সন্ধ্যার গতিপ্রকৃতিতে পাড়ার সবাই তাকে বেশ সমীহ করে।

পুলিশ এ পাড়ায় প্রায়ই আসে। তবে এরা সে জাতের পুলিশ নয় তা পানওয়ালা বুঝলো—। তবু বললো—কোন বাবু তো ওনার ঘরে যায়, না যায়—!

ধমকে উঠলো পুলিশ অফিসার—তোকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দে—। সন্ধ্যা কোন্ বাড়িতে থাকে?

পানওয়ালা বাড়িটা দেখিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা প্রতি প্রভাতে স্নান করে কিছুক্ষণ গীতা পড়ে—।

অন্য দিনের মত সে আজ গীতাখানা খুলেছে। এমন সময় পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে পুলিশ—তোমার নাম সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মুখ তুলে তাকায়—হ্যাঁ, কেন বলুন তো—?

আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার নামে ওয়ারেন্ট পরোয়ানা আছে—।

—বোধহয় ভুল করেছেন। আমি সন্ধ্যা মজুমদার। মৃদু কণ্ঠে বলে সন্ধ্যা।

পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলো—শোন, বেহুদিরির কোন অনুরোধে আমরা তোমার এখানে আসিনি। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। পুলিশ কমিশনার টেমার্ট সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার—।

সকলের চোখের সামনে পুলিশের গাড়ি তুলে নিয়ে গেল সন্ধ্যাকে—।

বাড়ির অন্য মেয়েরা এ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ভয় কাতর চোখে—। তাদের মনে অজস্র প্রশ্ন—!

দুটো মাস সন্ধ্যাকে আটকে রাখা হ'ল পুলিশ হেপাজতে। নির্মম অত্যাচার হ'ল তার ওপর। কখনও ভালবাসা—, কখনও লোভ—, কখনও আরও অন্যকিছু।

কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না সন্ধ্যার কাছে।

তার একটাই কথা—আমি দেহোপজীবিনী, আমি ওসব কিছু জানিনা বাবু। আমায় ছেড়ে দিন—।

ছেড়ে দিল পুলিশ সন্ধ্যাকে। দু'মাস পর—। তখন সন্ধ্যাকে আর চেনা যায় না। ইংরেজের পোষা বাঙ্গালী পুলিশের অত্যাচার আর লোভ সন্ধ্যাকে করে দিয়েছে এক অন্য মানুষ—।

বাঁহরাগতে সব সংবাদই যায়। বাইরের সব সংবাদ জেল বন্দীরা পায়—।

দমদম সেন্ট্রাল জেলে বসে সব সংবাদ জানলো বন্দী হেমন্ত রায়। ডাকার হেমন্ত রায় সহ কয়েকজন বন্দীর বিচারে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল—, এবং কয়েকদিন পরই তাদের আন্দামান জেলে পাঠানো হ'ল।

পুলিশ হাজত হতে বেরিয়ে সন্ধ্যা যাতে ভদ্রসমাজে ভালভাবে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা জেলখানার বসেই হেমন্ত করতে পারলো তাদের দলের কয়েকজনের মাধ্যমে—।

দুটো মাস নয়—, যেন দুটো যুগ।

কত রকমের অত্যাচার, কত ধরনের লোভ, নারী জীবনের নানা অপমানের গ্লানি অতিক্রম করে সন্ধ্যা এসে দাঁড়াল রাজধানীর রাজপথে—।

অজস্র চিন্তা তার মনে—।

আর তো তার সাবেক বাড়িতে যাওয়া যাবে না। তাহলে কোথায় যাবে—? এই মুহূর্তে কোন বিশ্বস্ত আস্তানায়ও যাওয়া যাবে না। তাতে তাদের বিপদ—। আকাশ পাতাল চিন্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যা—।

হঠাৎ এক কিশোর কণ্ঠে তার চমক ভাঙলো—'সন্ধ্যাদি'!

কে ওকে দিদি বলে ডাকলো—! মনটা যেন আনচান করে ওঠে সন্ধ্যার। চারিদিকে তাকায়—। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর ছেলে—আপনি তো সন্ধ্যা মজুমদার?

—হ্যাঁ ভাই! কিন্তু কেন বলতো—?

আমার ভাই বলেই জানবেন। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা জানতাম আজ পুলিশ আপনাকে ছাড়বে। অনেকেই আছে আমার সঙ্গে। সবার সামনে আসা নিষেধ। কারণ পুলিশ তো এখনও দারা ফাটাতে পারেনি। সন্ধ্যা একটু হাসলো তার কথায়, ছেলেটিও হাসলো।

—আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আপনার থাকার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই—।

একদমে সব কথাগুলো বলে গেল কিশোরটি।

সন্ধ্যার মৃদু উত্তর—না ভয় পাব কেন? সমুদ্রে ঘর বেঁধে নদী তীরে ভয় পেলে হয়—? কিন্তু তোমার কি নাম তা তো বললে না—?

—আমার নাম শুভেন্দু নাগ। আমায় শুভ বলে ডাকবেন।

—তুমি যে আমারও জীবনে 'শুভ' তা বুঝতে পারছি—। একটু হাসলো সন্ধ্যা।

এগুতে থাকলো ছেলেটির সঙ্গে—।

সন্ধ্যার যেন বিশ্বাস হ'ল ছেলেটিকে। মনে হলো শুভ তার আপন জন।

লালবাজার হতে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়।

ওরা কথা বলতে বলতে চলে এসেছে…

শুভ্র বললো—এই রাস্তায় আসুন…।

মোড় ঘুরে আশপাশে তুলে একটা ছোট বাড়ি দেখিয়ে শুভ্র বললো—

—ঐ বাড়িতে আপনি থাকবেন দিদি। ভয় নেই, আমিও থাকবো আপনার সঙ্গে। ঐ বাড়ির সামনে আর একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এগিয়ে এসে আহ্বান জানালো —আসুন দিদি!

সন্ধ্যার খুব ভাল লাগছে এদের এই ধরদত্তরা দিদি ডাক।

বাড়ির ভেতর ঢুকে সব দিক তাকিয়ে সন্ধ্যা প্রশ্ন করে শুভ্রকে—

—এ সব ব্যবস্থা কে করলো শুভ্র?

—কেন, আন্দামান যাওয়ার আগে জেলখানার ডাক্তারই সব ব্যবস্থা করেছেন…।

—আন্দামান! মানে, ডাক্তারকে তা হলে আন্দামান পাঠিয়েছে? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো সন্ধ্যা…।

আন্দামানের কথায় চমকে উঠলো সন্ধ্যা। কারণ সে সময় আন্দামান জেল সম্বন্ধে নানা আতঙ্কজনক গুজব ছিল ভারতবর্ষে…।

শুভেন্দুর সঙ্গে কথার কথায় সন্ধ্যার মনটা বেশ সহজ হয়ে এসেছিল। কিন্তু আন্দামান-এর কথা শুনে বড় ভেঙে পড়লো সন্ধ্যা।

আর ক্ষণে একটা জিনিস উপলব্ধি করলো…।

তাহলো অন্তরের নিভৃতে ডাক্তারের ওপর তার টান কত গভীর!

আপন মনে প্রশ্ন করে—আন্দামান হতে ওরা ফিরবে তো?

সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে শুভ্র চমকে ওঠে।

গলার বেশ জোর দিয়ে বলে শুভ্র—ফিরবেন তো বটেই। মেয়াদ শেষ হলেই ওঁরা ফিরবেন। ফাঁসির হুকুম তো আর হয়নি…।

প্রশ্নটা করে সন্ধ্যাও সঙ্কুচিত লজ্জিত হয়ে পড়ে…।

এক নতুন জীবন শুরু হ'ল সন্ধ্যার—।

শুভেন্দু এই বাড়িতেই থাকে। কলেজে পড়ে। আর তার দেখ-ভাল করে। অন্যান্য ছেলেরাও আসা-যাওয়া করে। ধীরে ধীরে বুঝলো সন্ধ্যা যে, শুভেন্দু ডাক্তারের মাসিমার ছেলে এবং ডাক্তারের উদ্যোগে তার বাড়ি হতেই সন্ধ্যার এই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে সন্ধ্যার। ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখে —এর প্রতিদান কি দেবে সে ডাক্তারকে……।

তার কি দেওয়ার আছে?

সন্ধ্যা সম্পূর্ণ পরনির্ভর না হওয়া শুভেন্দুর প্রচেষ্টায় কয়েকটি ছাত্র জোগাড় করে নেয়। তার যেটুকু বিদ্যা তাতে এটুকু চালিয়ে নিতে পারবে বলে তার বিশ্বাস হ'ল……।

চলতে থাকে এই ভাবেই……।

মনের গোপনে প্রশ্ন জাগে প্রায়ই—ডাক্তার কবে ফিরবে আন্দামান হতে। ডাক্তার ফিরে কিরূপ ব্যবহার করবে সন্ধ্যার সঙ্গে? মাঝে-মাঝে মনে হয় বিপ্লবীদের গোপন অজ্ঞানাগুলোর খোঁজ একবার নেবে। খোঁজ নেবে ধরণীদা, বারীনদার। এরা কে কোথায় থাকলো। পাশাপাশি স্মরণে আসে বিগত দু' মাস ধরে পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা। কেঁপে ওঠে সারা শরীরটা…। বুকের মাঝটা ঝি ঝি করে। মনে হয় তার থেকে ঐ পতিতা পল্লীতে অনেক ভাল……।

একদিন একটা সংবাদ এলো……। আন্দামানের বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম জানায় ঠাকুরকে। প্রশ্ন জাগে—কে কে ফিরছে? ডাক্তার হেমন্ত রায় কি আছে তাদের মধ্যে? চিন্তা করে এই সন্তোষে তো বহু মুক্তকেই প্রাণ দিচ্ছে— অনেকেই অনেক জেলে বন্দী—। আন্দামানে আরও অনেকে গেছে। তবে ডাক্তার হেমন্ত রায়ের জন্য তার হৃদয় এতো কাঁদে কেন? বুঝতে পারে—ডাক্তার হেমন্ত রায় তার কাছে এক নতুন জীবন—, এক প্রেরণার উৎস……।

১৯০৭ সাল—।

আন্দামান হতে বেশ কিছু বন্দীকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তাদের নিয়ে আসা হ'ল দমদম সেন্ট্রাল জেলে…।

ডাক্তার হেমন্ত রায়ও ফিরলো আন্দামান হতে……।

একদিন জেলখানায় দেখা করতে গেল সন্ধ্যা।

ডাক্তার বললো—তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তা করেছি সন্ধ্যা। তুমি ভেবো না…। ভাবনা কিছু ফেল না সন্ধ্যা। তার ভবিষ্যৎ চিন্তা কি করেছে ডাক্তার সেইটাই তার বড় চিন্তা হ'ল…।

অজস্র প্রশ্নের ভীড় হৃদয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলো সন্ধ্যা।

শুভেন্দু আর এখানে থাকে না। তার ভবাবধান ঠিক আছে।

এলো ১৯০৯ সাল—।

আন্দামান ফেরত বন্দী যারা আটক ছিল দমদম সেন্ট্রাল জেলে তাদের ছেড়ে দিল ইংরেজ সরকার।

১৯০৯ সালের আগষ্ট মাস—।

মেঘে মেঘে ভরে আছে আকাশ।

ডাক্তার হেমন্ত রায় এলো সন্ধ্যার বাড়ি।

সন্ধ্যার আকুতি—, তার বুকের স্পন্দন যেন শ্রদ্ধা ভরে ভরে পড়তে চাইছে ডাক্তারের পায়ে। আবারও একই কথা তার মনে হয়—যে তাকে ঘৃণিত পল্লী হতে এনে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলো তাকে সে কি প্রতিদান দেবে?

ডাক্তার বসলো ইজিচেয়ারে…

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে: মনে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে…।

কোন রকম সম্ভাষণের অবতারণা না করে ডাক্তার বললো—

—শোন সন্ধ্যা; ভাল বাড়ি ফিরেছি। হয় তো কালই আসতাম। কিন্তু আসা হয়নি। তার কারণ—, আমি হোমার

বলেছি যে, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আমি করে রেখেছি। তার সব রকম প্রস্তুতির জন্যই আমার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় নিতে হয়েছে। একটু, খামলো ডাক্তার। আমার বলতে থাকে—প্রস্তুতি পর্ব শেষ। মা, বাবাকে নিয়ে যে চিন্তা ছিল তা মেটে গেছে। তাই আমি আজ এসেছি তোমার শোনাতে—আমি তোমার জীবনের সব ভার গ্রহণ করতে চাই—। আমি তোমায় বিয়ে করে আমার স্ত্রী করে তোমায় আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। আমার মা, বাবার এতে সম্মতি আছে। কথাগুলো বলে ডাক্তার তাকায় সন্ধ্যার দিকে—।

সন্ধ্যার চোখে জলের ধারা··· ।

মুখ তুলে তাকায় সন্ধ্যা—কিন্তু আমি যে···

সন্ধ্যার কথা শেষ হতে দেয় না ডাক্তার—তুমি যে কি কেমন···? ও সব কথা থাক। তোমায় আমি যে ভাবে চিনেছি, যে ভাবে বুঝেছি আমায় সেই ভাবেই বুঝতে দাও সন্ধ্যা। তোমার যা আছে তা অনেক মেয়ের নেই—। তুমি যা আমায় দিয়েছ তার প্রতিদানে আমি কিছু, দিতে চাই।

সন্ধ্যার মাথা নত হয়ে আসে ডাক্তারের পায়ে···

চোখের জলে ধৌত হয় ডাক্তারের পা দুটো··· ।

ডাক্তার তার দুটো হাত ধরে তোলে। বলে—আমি তোমায় পবিত্র নারী জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সন্ধ্যা, ফিরিয়ে দিতে চাই তোমার নারী জীবনকে··· ।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এমপ্লয়িজ' কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম কর্মচারি ঋণদান সমিতি

সুদের হার : ৬ শতাংশে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত
১১ শতাংশে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত
১৬.৮ শতাংশে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত।

দি কলিকাতা কর্পোরেশন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

১নং হুগ স্ট্রীট, (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০১৩

স্থাপিত : ১৯১৬

ফোন : ২৬-৩৪৭১ (এক্স ১৪২)

আপনাদের সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলুন। পৌর কর্মীদের নিজস্ব সংগঠন আপনাদের সেবার সুযোগ কামনা করে –

কার্যকরি মূলধন—৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা
অংশগত মূলধন— ৮০ লক্ষ টাকা
সংরক্ষিত মূলধন— ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা

উপরোক্ত সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করে আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সংরক্ষিত করুন এবং আপনার সহকর্মীবন্ধুদের অধিকতর সেবার সুযোগ আমাদের দিন।

বেনারস, দীঘা ও পুরীতে 'সোসাইটি হলিডে হোম'-এ বেড়াতে চলুন। ঠাকুরপুকুর 'ক্যান্সার সেন্টার' ও 'ওয়েলফেয়ার হোম' ও 'ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক' ও হসপিটাল সোসাইটিতে বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ আছে।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র নাথ
সেক্রেটারি

শ্রীশিশিরকুমার মুখার্জি
চেয়ারম্যান

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে
ভাইস-চেয়ারম্যান

"Let thy touch thrill my life's string
and make thy music thine and mine"

With best compliments from :

HOOGHLY DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

CHINSURAH, HOOGHLY, CNS-2408

- ☐ Dedicated to the services to the Target Group of the "District" and its precious clientele.
  Providing credit facilities at the cheapest rate and cariest term.
  Accepting "Deposits" from crass-section people providing higher interest rates. Safe-Deposit Locker facilities are available at Branches.
- ☐ Deposits are insured with the "Deposit Insurance and Guarantee Corporation"
- ☐ 'PERSONALISED SERVICE' for the customers through the net-work.
- ☐ Please step in any of our branches.

BRANCHES

★ Arambagh ★ Chinsurah ★ Champadanga
★ Dhaniakhali ★ Jangipara ★ Khanakul
★ Khamargachi ★ Pandua ★ Tarakeswar
★ Kamarpukur ★ Haripal

We offer loans : (viz. : Long Term, Short Term and Medium Term) at 6% per annum to members. Accept Deposits 5% to 5½% per annum and run Holiday Home at :

Calcutta Reserve Bank Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Reserve Bank Building (Annexe)

13, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001

The Stewarts Lloyds-Indian Tube Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Ganges Printing Ink Factory Employees' Industrial Co-operative Society Ltd.

GILLANDER HOUSE
BLOCK F-3 1.
8, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001

U S E

Ganges Inks

F O R

Quality & Economy

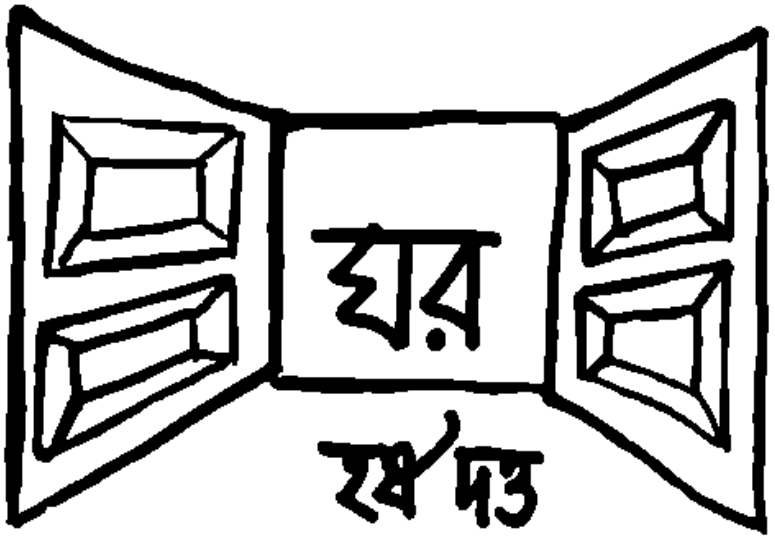

ছাদের এই ঘরটা বাবা তৈরি করিয়েছিল অন্য উদ্দেশ্যে। অরুণাভর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। বারো বছরের একটি বালক ছাদের নির্জনতায় একা একা খেলা করত। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে গড়ে তুলত এক কল্পরাজ্য। সেই বাবালকটির মনের কল্পনালতা ছেকে ধরে পাতা ধরে পড়ত, তা ঘুড়িতে-ছিটিতে থাকত ছাদের আনাচে-কানাচে। তার সারা বুক জুড়ে।

একদিন বিকেলে এক ভদ্রলোককে নিয়ে বাবা ছাদে উঠে এসে ছিল। সেদিন কি বিশ্বকর্মা পুজোর কোনও ব্যাপার ছিল? তিথি সম্পর্কে অরুণাভ আজ আর খুব নিশ্চিত নয়। তবে হতে ছিল। কেন না, আকাশ ভর্তি ঘুড়ির মেলা, নানা রঙের ডেউ আর আনন্দের দমকা শব্দের কথা বেশ মনে আছে। সেদিন বিকেলের ছাদ অরুণাভকে আটকে রেখেছিল, ঘুড়ির রোশনাই দেখাবার জন্য।

ভদ্রলোক ছাদের চারপাশটা দেখে বলেছিলেন, ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই। হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যে সাইজ বলছেন, তাহলে ঠাকুর ঘর একটু আন-ইউজুয়াল। কস্ট বেশি পড়ে যাবে।

ঘুড়ির খেলা থেকে চোখ সরিয়ে অরুণাভ এক বার তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল বাবার মুখ। বাবা কোনো দিকে তাকাচ্ছিল না। ভদ্রলোকের কথা শুনে মাথা নেড়ে বলেছিল, খরচের দিকটা নিয়ে আমি ভেবেছি। তবে আমার মাউন্সুকুটা একটু অন্য রকম। বাড়ির আর পাঁচটা ঘরের ছেকে এটাকে আলাদা করতে হবে। এখানে ঠাকুর-দেবতা যেমন থাকবে, তেমন মানুষও থাকবে।

—তার মানে? ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে গেছিলেন।

—মানুষ এখানে খাবে-দাবে এরকম বলছি না। থাকবে মানে, এই ঘরটায় এসে দু'দণ্ড বসবে। মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। একটা উদারতার ভাব তখনকার তার মনে, জাগবে।

সেদিন সব কথা ভোরের বসে হয়নি। অরুণাভ হাঁ-করে শুনেছিল। ভদ্রলোক, বাবা থামতেই বলেছিলেন, বুঝতে পেরেছি, নিছক একটা ছোট কুঠরি নয়, আপনি ঘরটাকে মন্দির করে তুলতে চাইছেন।

—একরাত্তির। মানুষের হৃদয়-মন্দির।

—এটা নিশ্চয়ই আপনার ছেলে? মুখ চোখের গড়ন আপনার মতো দেখছি! ভদ্রলোক অরুণাভর দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ ভাদুড়িবাবু। আমার পুত্র। বাবার গলায় স্নেহ জমাট বেঁধেছিল।

—তোমার নাম কি? ভদ্রলোক একটা হাঁ হাতে ঠিক করে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

অরুণাভ তখন একটা ঘরের ছবি দেখছিল বিভোর হয়ে। সে ঘরের চাল মন্দিরের মতো উঁচু। ভেতরে ঠাকুরের সিংহাসন। ধূপের প্রসাদ সাজানো। ধূপের মিষ্টি গন্ধ। ঘরে পুজোর ঘণ্টা বাজছে। বাবা অরুণাভর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বলেছিল, বলো।

—অরুণাভ চক্রবর্তী। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে নিজের নাম বলে অরুণাভ ছাদের রেলিংয়ের দিকে সরে গেছিল।

—বাঃ, বেশ নাম নীহারবাবু। আমি একটা স্কেচ এঁকে নিই। আগামী সপ্তাহ থেকেই মিস্ত্রি লাগিয়ে দিন। ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন।

ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এরপর বাবা নিচে নেমে গেছিল। আবার একা। নির্জন ছাদ। আকাশে অসংখ্য নাবিক আর অরুণাভকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। একটা ঘরের ছায়া বিভোর আলোয় দেখতে পাচ্ছিল অরুণাভ।

এই সেই ঘর। শ্বেতপাথরের মতো শাদাটে প্লাস্টারের দেওয়াল। দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালের গায়ে পাথরের বাবা খরচ করেছিল দু'হাতে। নিজের সাধ অপূর্ণ রাখতে চাননি। অন্তত শেষ পর্যন্ত এই ঘরটা আর ঠাকুরঘর হয়ে উঠল না। বাবাই এই ঘরের বাসিন্দা হয়ে গেল এটার পরিচয় বাবার ঘর।

ছাদের ওপরে ঘর কেন হয়ে না ঘর ভরে, নিপুণ হাতে মা তখন মশারি গুছে দিচ্ছিল। অরুণাভ জিজ্ঞেস করেছে।

কাজ করতে করতে মা ঠাকুমার বড়ো ইচ্ছে, হোক, তাই!

—পুজোর ঘর কি জিজ্ঞেস করেছিল প্রসাদাতে নিয়ে।

—যেখানে ঠাকুর-দেবতারা থাকেন, [illegible]

ঘর থাকে, তাকেই বলে পুজোর ঘর। অনেকটা মন্দিরের মতো।

—আমাদের বাড়ির সব ঠাকুর ওই ঘরে ফিরে থাকবে মা!

—হ্যাঁরে। তোর ঠাকুমা এখন যেখানটায় পুজো করে, সেখানে আর ধরছে না। দেখেছিস তো, অনেকগুলো ঠাকুর নিয়ে তোর ঠাকুমার হিমসিম অবস্থা। তাই আগে একটা ঘর বানিয়ে নেওয়া হবে।

—কিন্তু, বাবা যে বললো, ওই ঘরে, শুধু ঠাকুর নয়, মানুষও থাকবে। তুমি, আমি, বাবা—সবাই ওখানে থাকতে পারব —তাই না মা!

—কী জানি তোর বাবা কি বলেছে! হবেও বা। দাঁড়া, আমি কাল সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করবো। মা লাইট অফ করে মশারির ভেতর ঢুকে এসে বলেছিল, রাত হয়ে গেছে অনু। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

বাবার সাইজের একটা কাঠের বাক্সে ঠাকুমার দেবদেবীরা সব থাকতেন। পুতুলের মতো দেখতে সব। কোনোটা পিতলের, কোনোটা পাথরের, কিংবা চিনেমাটির। অনেকগুলো। সেই সঙ্গে ফ্রেমে বাঁধানো নানা সাইজের ছবি। বাবার ঘরের এক-কোণে বাক্সটা থাকত। সকাল বেলায় স্নান করে ঠাকুমা পুজোয় বসতেন। বাক্স থেকে সব ঠাকুর বের করে একটা জলচৌকিতে রাখতেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথার চুলগুলো ছেলেদের মতো ছোটছোট, ধবধবে শাদা কাপড় পরা ঠাকুমাকে তখন আরও সুন্দর দেখাতো। জলচৌকিতে দেবদেবী-দের সাজিয়ে রাখতে রাখতে গুনগুন করে গান করতেন।

ঠাকুমার সঙ্গে অরুণাভর তেমন বন্ধুত্ব হয়নি। উনি বছরের বেশির ভাগ সময় থাকতেন বাইরে। মা বলতো, ঠাকুমা তীর্থে গেছেন! তীর্থ কাকে বলে? তীর্থ কোনও জায়গার নাম? নানা প্রশ্ন অরুণাভর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতো। মা সব কথার উত্তর দিতে চাইতো না। একটু বিরক্ত হয়ে বলতো, তোকে তো এক কথায় বুঝিয়ে দিলে হবে না! তোর জানার শেষ নেই। তোর সব সময় এটা কি, ওটা কেন, এটা কেন! এতো জবাব দিতে পারি না বাবা! অরুণাভ আর কোনও কথা বলতো না। নিজের মনে তৈরি করে নিতো তীর্থ-জগৎ। রূপকথার অলংকার ও স্বর্গের ঐশ্বর্য মিলিয়ে।

পুজোর ঘর শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ ঠাকুমা মারা গেলেন। দুপুরে বেলা ঘুমের মধ্যে চলে গেলেন পরপারে। বাবা স্তব্ধ হয়ে গেছিল। তখনও রাজমিস্ত্রিরা বাড়ি ছাড়েনি। ছাদে জড়ো বালি, পাথর কুচি, থালি, ইঁট পড়ে আছে। বাবা বলেছিল, আর দরকার নেই। যে-পর্যন্ত হয়েছে, ওটুকুই থাক। যার জন্যে ঘরটা বানানো হচ্ছিল, সেই যখন চলে গেলো, তখন আর···।

বাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই সময় কেউ কথা বলেনি। প্রায় তিন মাস কাজ বন্ধ ছিল। মনে আছে, সেই সময়, ছাদটাকে ভীষণ ছোট লাগত। ঘরটার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাভ কতদিন ভেবেছে-এটা পুজোর ঘর নয়, মৃত্যুপুরীর অন্ধকার ভুটুরি। রূপকথার রাজপুত্র এই ঘরে ঢুকেছিল জীবন্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু পারেনি। কালো পোষাক পরে মৃত্যুর দূত এসে রাজপুত্রকে বন্দী করে রেখেছে। দরজা বন্ধ। ভেতরে যে রাজকন্যা ছিল, সেও হয়ত বেঁচে নেই।

কতদিন বন্ধ তালার ওপর হাত বুলিয়েছে অরুণাভ। কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করেছে। কান্নার শব্দ কিংবা রাজপুত্র-রাজকন্যার কথাবার্তা। ঘরটা তৈরি করার সময় কত রকম শব্দ ছড়িয়ে যেত ছাদের সারা বুকে। ঠাকুমার মৃত্যুতে এমন করে হঠাৎ সব থেমে যাবে, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি অরুণাভ। ছাদটা ছোট হয়ে গেছে, ঘরটা অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে এবং বাবার স্তব্ধ গম্ভীর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে—সব মিলিয়ে সেই সময়-গুলো অরুণাভর কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে-ছিল। খালি মনে হত, হারিয়ে যাওয়া, বাধাহীন ছাদটা যদি ফিরে পাওয়া যেত আবার।

ঠাকুমার কথা প্রথম প্রথম খুব আলোচনা হত। পিসিদের সঙ্গে মায়ের কিংবা বড় কাকা, ছোট কাকার সঙ্গে বাবার। ঠাকুমার স্মরণে একদিন শ্রাদ্ধ হল, বহু লোক জন এসেছিলেন। পূজা-পাঠ, গান, খাওয়া-দাওয়া, আরও কী কী যেন হয়েছিল। তখনও ছাদের ঘরটা বন্ধ। ঘর বানানোর জিনিস-পত্র ছাদটা নোংরা হয়ে আছে। তারপর একদিন ঠাকুমার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় একদম কমে এলো। দেবদেবীর মূর্তি বোঝাই কাঠের বাক্সটা মা দোতলার ঘরে নিয়ে এসেছিল। কেবল বাক্স থেকে একটা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বের করে নিয়ে মা একটা সেলফে তুলে রেখেছে। সেটা এখনও ওখানেই আছে। মা নিত্য ফুল আর নকুলদানা দেয়। ঠাকুমার প্রত্যক্ষ স্মৃতি বলতে ওই রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা। আর ছাদের ঘরটা কিছুটা। তবে যেদিন ওটা বাবার দখলে চলে গেলো, সেদিন থেকে ওটা বাবার, বাবার স্মৃতি বিজড়িত চার দেওয়াল।

সব যখন আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনগুলোকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না, সেই সময় বাবা ঠিক করলো, ছাদের ঘরটা কমপ্লিট করতে হবে। স্নান করে তৈরি করা একটা সুন্দর ঘর—তাকে এই ভাবে ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না। অরুণাভর মনে আছে, অনেকটা এই ভাবার বাবা একদিন সকালে বলেছিল, চিন্তা করে দেখলাম, ঘরটাকে আন করে ফেলে রেখে লাভ নেই। বাড়িতে দু'জন অতিথি এলে ওখানে শুতে বলতে পারবে। আমরাও গরমের সময় গিয়ে শুতে পারি। দক্ষিণ-মুখী দরজা-জানলা, শ্বেত পাথরের মেঝে—শরীর জুড়িয়ে যাবে।

মা ওকথাই সায় দিয়েছিল, আমিও তো তাই বলছি। মানুষ আসে, মানুষ যায়। এ নিয়মের যখন নড়চড় নেই তখন তুমি আর ওপর রাগ করবে!

ভাদুড়িবাবু যদে সেই ভদ্রলোককে বাবা বলেছিল, 'এই ঘরে মানুষও থাকবে।' কিন্তু সে দিন বাবা যে-আকার কথা ভেবেছিল, তার থেকে অনেক অনেক দূরে সরে আসতে হয়েছে বাবাকে। বাড়ির অন্য ঘরগুলোর সঙ্গে এটার আর কোনও পার্থক্য থাকলো না।

কিছুদিন পরে সেই মিস্ত্রিরা এসেছিল। যেটুকু কাজ বাকি ছিল শেষ করে দিয়ে যেদিন ওরা বরাবরের মতো চলে গেলো, সেদিন মা ওদের মিষ্টি খাইয়েছে। ওদের মধ্যে যে-লোকটির নাম দীননাথ মিস্ত্রি, তাকে একটা ঘুড়ি দিয়েছিল মা। অরুণাভ সেই সময় ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ো গোছের দীননাথ মিস্ত্রি ঘুড়িটা দু'হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল, মা, আপনার মঙ্গল হোক। ঘরটা চমৎকার হয়েছে। পুজোর ঘর বুঝে শুনে আমরা মন দিয়ে কাজ করেছি। ফাঁকি দিইনি মা। কিন্তু যা ঘটে গেলো, তাতে করে ঘরটার···। লোকটি একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তবে আমি বলি কি মা, এটাকে ঠাকুর ঘরই করুন। ভগবানের নামে ঘর কাঁপিয়েছেন তো!

অরুণাভর মনে আছে, মা উদাস স্বরে বলেছিল, দেখি কি হয়! শাশুড়ি-মা থাকলে যা হোত···। ঠিক আছে, তোমরা এসো। আবার কাজে কর্মে যেন তোমাদের পাই।

ঘরটা শেষ পর্যন্ত আর পুজোর ঘর হলো না। একটু একটু করে বাবার ঘর হয়ে গেলো। একটা ডেসপোস, একটা ছোট মাপের কাঠের আলমারি, চার থাকওয়ালা বই রাখার সেলফ, কাগজপত্র, পুরনো ম্যাগাজিন এসব আরও নানা জিনিস একটু একটু করে ঘরটার ভুকে এলো। পাশ্বের বেদিটা প্রথম প্রথম ফাঁকা পড়ে থাকতো। মাঝে-মধ্যে একটা ফুলদানি রেখে যেতো। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিংবা তিন-চারটে গোলাপ।

অরুণাভ ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। এখানে ওখানে ছুলো। মাকড়সার জাল। বেদিটা নানা জিনিসে ঢাকা পড়ে গেছে। এখনও ঘরটা জুড়ে রোগ আর ওষুধের গন্ধ। অরুণাভ পাখাটা চালিয়ে দিল। বাবা গত মাসের তিন তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পর থেকে এ ঘরে কেউ আর আসেনি। দু'দিন আগে শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেছে। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছেন। মা একেবারে ভেঙে পড়েছে। অরুণাভর দিদি বড়জোর আর দিন কয়েক থাকবে। এই ক'দিন একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেলো যেন। সব কিছু যেন উলোট-পালোট হয়ে গেছে। হঠাৎ এই ঘরটার কথা মনে পড়েছে অরুণাভর। ঠাকুরমা চলে গেলো, তারপর বাবা। ঘরটার সঙ্গে যারা জড়িয়ে গেছিল, তারা নেই, কিন্তু ঘরটা থেকে গেলো। অরুণাভ খাটের এককোণে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আশ্চর্য! মানুষ ঘর বদল করে যায় অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে সে ঘর সে বাড়ির যায়, তার কোনও বদল ঘটে না। সেটা থেকে যায়।

এবার এই ঘরটা কি হবে! কিসের এ নাম! ঠাকুর ঘর থেকে বাবার ঘর। কিন্তু এবার! অরুণাভর ঘর!

নিজের মনে মৃদু হাসল অরুণাভ। শ্বেতপাথরের মেঝেতে পা ঘষে অরুণাভ বললো, এটা তার পুজোর ঘর? কোন্ দেবতার!

হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। এই ক'দিন কাজে-কর্মে কেটে গেছে। বাবার মৃত্যুর আঘাত হৃদয়ের কত গভীরে বাজা মেরেছে, অরুণাভ বুঝতে পারেনি। ঘরটা সেই হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের দিনগুলো খুঁড়ে তুলে আনলো। বড় করে, সুন্দর করে তৈরি ঘরটাকে বড় নির্মম লাগছে। বড় কঠিন। শ্বেতপাথরের মতো ঠাণ্ডা।

জানলার বাইরে সন্ধ্যা নামছে। আলো মুছে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। অরুণাভ ধীর পায়ে ছাদে এসে দাঁড়ালো। একটু দূরেই ঘরটা। মহাকালের সংহতির মতো অপেক্ষা করে আছে নতুন প্রজার অতিথির জন্য।

সে কোন্ অতিথি! অরুণাভ উদাস চোখে শূন্য নীল আকাশে।

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই :

বাগডবাড়ি এস কে ইউ এস লিমিটেড

গ্রাম—বাগডবাড়ি, পোঃ—জোড়বেড়িয়া, জেলা—পুরুলিয়া

রেজিঃ নং—২০ পি, ডেটেড : ১৯.২.১৯৬১, বর্তমান সদস্য সংখ্যা—৫৩১+১ (গভর্নমেন্ট)

এলাকার কৃষকভাইদের অকৃত্রিম বন্ধুর কৃষিঋণ দেওয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ন্যায্যমূল্যে কাপড় পাইবার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। রাসায়নিক সারসহ বীজ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আই আর ডি পি স্কিমে ঋণসাহায্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সমবায়ের কৃষিঋণ পরিশোধ করলে সুদে ভরতুকি পাওয়া যায়।

হেলারাম মাঝি
ম্যানেজার

বাঞ্ছিতরঞ্জন বাসমাঝি
সম্পাদক

মন্টুলাল মাঝি
সভাপতি

পূর্বস্থলী ব্লক-১ টাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

হাটশিমলা, পোঃ সমুদ্রগড়, জেলা বর্ধমান

তসর, চাকাই, জামদানী ধুতি ও সিল্ক টাঙ্গাইল প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

গৌরচন্দ্র বসাক
সভাপতি

প্রবিনকুমার বসাক
সম্পাদক

নাদাই কো-অপারেটিভ উইভিং সোসাইটি লিমিটেড

পোঃ নাদাই, জেলা : বর্ধমান

জনতা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, প্রস্তুতকারক। ইহা ব্যতীত প্রস্তুত হচ্ছে সাধারণ ৮০' × ৮০' চিপার শাড়ি।

চন্দ্রহরি মেবনাথ
সভাপতি

গৌরাঙ্গকুমার ভৌমিক
সম্পাদক

"সমবায়িকা" থেকে কিনুন ও সাশ্রয় করুন।

"স্বয়ং-সেবা" (Self Service) ব্যবস্থার সুযোগ নিন।

নিজের জিনিস নিজের হাতে পছন্দ করে কিনুন।

★

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য

"স ম বা য়ি কা"

★

সমবায়িকা ২৫ বছর ধরে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

"সমবায়িকা"

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, মানিকতলা, ভি আই পি রোড, হাতীবাগান, হাজরা রোড, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, একডালিয়া ও বি কে পাল এ্যাভিনিউ।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

১০, নেলী সেনগুপ্তা সরণী, কলিকাতা-৮৭

দূরভাষ : ২৫-৬৭৮১

* একনজরে *

কার্যক্ষেত্রের সীমানা—ভারতের পূর্বাঞ্চল।	
সদস্য সংখ্যা ৩০-৬-৯০ পর্যন্ত	৬,৬০০
মূলধন	৫৭,৫১,০০০.০০
রিজার্ভ ফাণ্ড	১,৭২,৭৬,০০০.০০
গ্যারান্টি ফাণ্ড	৫৬,২৫,০০০.০০
সদস্যদের প্রদত্ত ঋণ	৩,২৭,৩০,০০০.০০

সভ্যদের প্রদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা :

১। দার্জিলিং, পুরী, রাজগীর, বকখালি, বেনারস ও কলিকাতায় সুন্দর "হলিডে হোম"।

২। সভ্যদের পুত্র-কন্যাদের, যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৫০০ টাকার (এককালীন) পুরস্কার প্রদান।

ক্যানসার রোগাক্রান্ত সভ্যদের চিকিৎসার জন্য পাঁচ কিস্তিতে ৩,৫০০ টাকার সাহায্য দান।

চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণকারী সভ্যদের ১০০০ টাকার (এককালীন) স্মারক প্রদান।

৫। মৃত সভ্যদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য ১০০০ টাকার (এককালীন) সাহায্য দান।

দুলাল ধর
সম্পাদক

নিত্যরঞ্জন বসু
সভাপতি

বিপথ

শৈলেন চৌধুরী

শুনছেন ?

একটা প্রমিক বস্তির অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে হেঁটে এগোচ্ছিলাম। প্রশ্নটা শুনে পেছন ফিরলাম। যদিও এ এলাকার প্রায় সবাই আমার পরিচিত, কিন্তু আমাকে ডাকার মত পরিচিত কাউকে চিহ্নিত করতে না পেরে একটু হতাশ হলাম।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নিশ্চিত হলাম এই বলে যে, শুনছেন ডাকটা আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়। কেউ হয়ত অন্য কাউকে ডেকেছে। অথবা আমি ভুল শুনেছি। আমি আবার যাবার জন্যে পা বাড়ালাম, আর তখনই ডাকটা ফের কানে এল, শুনছেন, আপনাকেই বলছি, একটু দাঁড়ান।

এবার সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম, সামনা দূরের যে বৃদ্ধ মানুষটির মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল তাকে আমি চিনি না।

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে লোকটা যেন খুব খুশি হল।

ধীরে হাতের লাঠিতে ভর রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

হেসে জিজ্ঞেস করল, আমায় চিনতে পারলে না ?

লোকটার কোটরে বসে যাওয়া দুটো ঘোলাটে চোখে যেন আহত দৃষ্টি। আমি আতিপাতি করে খোঁজ করলাম। কিন্তু ওকে চেনার মত খুঁজে কোন রেখা ওর শরীরে বা মনে কোথাও খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলাম। লোকটা হতাশ ভাবে আবার বলল, আমায় চিনতে পারছো না ?

হলে লোকটা বিড়ির নিকোটিনে কালো হয়ে যাওয়া পুরু ঠোঁটে বিচিত্র হাসল। আর সেই মুহূর্তে স্মৃতির অনেক কুয়াশা সরিয়ে সরল হাসিতে ভরা একটা মুখের মুখ যেন মুহূর্তের তুলো উঁকি দিয়ে গেল। আমি খুশি হলাম। সাহসে ভর করে বললাম, তুমি অক্ষয় !

লোকটার চোখমুখ অদ্ভুত আনন্দে ঝলমল করল। এবার ওকে আমি খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর ছেঁড়া ময়লা জামা, কাপড়, ঘোলা ঘোলা চোখ মুখ, হাত-পা। সারাটা হয়ে যাওয়া চামড়া। রোগে ভুগে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া একটা মানুষ, যাকে আমি বৃদ্ধ বলে ভুল করেছিলাম। লোকটা এবার যেন আশ্বস্ত হয়ে বলল, যাক, আমায় চিনেছ তা হলে !

আমি এ কথার জবাব দিলাম না। কারণ আজ থেকে পনের-ষোল বছর আগে যে অক্ষয়কে আমি চিনতাম এই ক্ষয়িষ্ণু মানুষটা সে নয়। এ অক্ষয় হয়ত তার নির্দিষ্ট পরিণতি। কথাটা ভাবতেই আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম এবং বেশ কষ্ট বোধ করলাম।

লোকটা কিন্তু খুশি খুশি মেজাজে এবার আমার দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। যেন পুরনো স্মৃতির পাতা খুলে সম্পর্কটা সহজ করে আনতে চায়। অনেক কিছু বলতে চায়।

কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম একটা ছোট ও বাঁকের হাঁপাচ্ছিল। একটাই দুর্বল মনে হোল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার হয়েছে কি ?

ও বলল, আমার রোগ হয়েছে।

কি রোগ ?

অক্ষয় এবার অদ্ভুত হাসল। সরল একটুকরো হাসি। বলল, আমার খাবার-রোগ হয়েছে।

সে আবার কি রোগ ? আমি কথা না বলে ওর দিকে তাকালাম। মুহূর্তে ওর চোখমুখ যেন মলিন হয়ে এল। আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেল, হাসপাতালে যাই, ডাক্তারবাবুরা নানারকম ওষুধ দেয়। বলে ওষুধে তোমার কাজ হবে না, ভালমন্দ খেতে হবে। ডিম, দুধ, মাছ, মাংস। এবার বলে কিনেছে খেতে না পারলে আর ওষুধ নিতে এসো না। ব্যাপারটা যেন খানিকটা বুঝলাম। একটু জ্ঞান দেবার মত করেই বললাম, এটা আর এমন কি কথা ! এক পাবা মাছ, মাসে নাই বা হল। গরিবের সংসার, তবু ওরই মধ্যে দুটো পাবা যায়। একটু কষ্টেসৃষ্টে মাছ। মাঝে মাঝে অন্তত এক-আধটা ডিম, সম্ভব হলে—

বলতে গিয়ে দেখলাম লোকটা হাসছে অদ্ভুত শব্দ করে। ওর কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা অপরিচিত হাসিটা যেন কঠিন ধমকের মত মনে হল।

হেসেই বলল, মাসের মধ্যে বেশিরভাগ দিন আমরা ভাতের মুখ দেখতে ভুলে গেছি। আমার কাজ নেই। বৌটা কি-গিরি করে যা আনে তাই দিয়ে সংসারের এতগুলো মানুষ।

জিজ্ঞেস করলাম, সংসারে তোমার পরিজন কটি ?

দুটো মেয়ে বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যা,

ছেলেটা ছোট। চায়ের দোকানে একটাকা রোজে ছোকরার কাজে দিয়েছি। আমার বয়স হয়েছে, না-খাবার বকল সইতে না পেরে পঙ্গু হতে চলেছি। ওরা এখনও জুটছে।

বলতে বলতে ওর ঠোঁটের নিষ্ফল হাসিটুকু ওঠানামা করল। আমি সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা পুরনো কথা জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সেই প্রিয় মালিক, তোমার বন্ধু, সাহায্য করে না?

আমার প্রশ্নে ও একটুও চমকালো না। এরকম একটা প্রশ্ন যে ঘুরে ফিরে কোনদিন ওর সামনে হাজির হতে পারে তা যেন ও জানত। তবে প্রসঙ্গটা না উঠলেই যেন ভাল ছিল। মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকে থাকল ওর। আমি প্রশ্ন করলাম, সেই চাকরিটা তুমি ছাড়লে কেন?

এবার ওর নোয়ান মাথাটা যেন খানিকটা সটান হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমি ছাড়িনি, মালিক আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এই প্রথম ওর মুখ থেকে আমি মালিক কথাটা শুনলাম। যা আমার কাছেও খানিকটা অবিশ্বাস্য লাগল। মালিককে ও কোনদিনই মালিক বলত না। বলত, বন্ধু। যদিও তারই সেলাইয়ের কারখানার একজন শ্রমিক হয়ে ও সারাজীবন মালিকের সেবা করে গেল। অবশ্য তার মূলে ছিল অক্ষয়ের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি এবং সততা। ওর এই দুর্বলতাটুকু সারাজীবন ধরে নিংড়ে রস বার করে নিয়েছে মালিক। অবশ্য কোন ঘটনাই অকারণ ঘটে না। কিশোর বয়সে এই মালিক ওর বন্ধু ছিল। তখন ওরা কোলকাতার রাস্তায় ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরত। সেই সময় ওরা দু'জনেই ঘাড়ে করে রেডিমেড জামা ফেরি করে বেড়াত। এক সময় এই করেই ওদের হাতে কিছু পয়সা হওয়াতে ওরা জামা তৈরি করে বেচতে শুরু করে।

তখন একটা সেলাই মেশিনে অক্ষয় জামা বানাত। ওরা দু'জনে বেচত। পরে অক্ষয় শুধু বানাত, বন্ধুটি শুধু বেচত। তারও পরে অনেকগুলো মেশিনে জামা বানান হত এবং বন্ধুটি বেচত। কেননা ততদিনে কারখানা এবং ব্যবসার মালিকানা বন্ধুটির হাতে চলে গিয়েছিল। অক্ষয়ের কিছু পাওনাগণ্ডা গুণে বন্ধুটি তখনই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

আমি যখন ওই কারখানার শ্রমিক হয়ে ঢুকেছিলাম, তখন ওর বন্ধুটি বেশ বড় মালিক। রমরমা ব্যবসা। গাড়ি বাড়ি সবই হয়েছে।

অক্ষয় যদিও তখন আমাদেরই মত শুধুই শ্রমিক, কিন্তু সে ছিল মালিকের প্রীতি-ভাজন। কারখানার সব থেকে ভাল মেশিনটি সে চালাত। সব থেকে ভাল জায়গায় সে বসত। মালিকের জন্যে বাড়ি থেকে খাবার এলে কখনও-সখনও মালিক তাকে ভাগ দিয়ে দেয়া করত। যদিও মালিকের কাছে সে শ্রম বিক্রি করত, কিন্তু অন্য শ্রমিকদের থেকে নিজেকে সে আলাদা ভাবত এবং প্রায়শই গর্ব করে সেকথা সবাইকেই জানিয়ে দিত যে, মালিক আমার প্রিয় বন্ধু। শ্রমিকরা বলত, এক সময় সে তোমার বন্ধু ছিল—অক্ষয় সেকথা মানত না। সে কারণে ওদের কারখানার শ্রমিকরা পেছনে ওকে দাঁড়কাক বলত। মুখে মুখে লাগান মালিকের সেবক, সে মালিকের হয়ে বেশার খাটে মার। যা মালিক তাকে খাটিয়ে নিত।

আমরা শ্রমিকরা এই সময় ওই কারখানায় একবার ধর্মঘট করি। অতিরিক্ত খাটতে হত, তার জন্যে মালিক বাড়তি মজুরি দিত না। তাছাড়া মজুরিও ছিল কম। মালিক আমাদের আচরণে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। যে করেই হোক এই বেআইনী ধর্মঘট দমন করা হবে বলে জানিয়ে দেয়।

অক্ষয় তখন লুকিয়ে কারখানায় ঢুকত। একাজে অক্ষয় মালিকের বাহবা পেত। পরে আমরা ওকে আটকে দিই। মালিক তখন পুলিশ, গুণ্ডা দিয়ে আমাদের হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। অক্ষয়কে তারাই পাহারা দিয়ে কারখানার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। এরা কারখানার ঘুঘু জনালিয়ে মালিকের বাহবা কুড়িয়েছিল।

অনেকদিন চলেছিল সে ধর্মঘট। না খেয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে আমরা লড়াই করেছিলাম এবং একসময় জিতেছিলাম। মালিক আমাদের সব দাবিগুলোই মেনে নিয়েছিল।

এই সময়, কি তারও পরে ও আমাকে একদিন বলেছিল, খুব চুপিচুপি যেন মালিক জানতে না পারে এইভাবে, তোমাদের জন্যে আমিও কিছু বাড়তি পয়সা পাচ্ছি, যার খুব প্রয়োজন ছিল। খাটুনিও অনেকটা কমেছে—

আমি ওকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার ক্ষেত্রে এটা তোমার মালিক বন্ধুর জন্যেই হওয়া উচিত ছিল।

আমার ঠাট্টার উত্তর দিতে পারেনি নিজের কপালে দেগেছিল মাথা নীচু করেছিল। যেন অনেক কষ্ট, ঘা ও সর্বক্ষণ ধরে বেড়ায়, অন্য কাউকে কিন্তু জানাতে পারে না। সেই কষ্টটা যেন মুহূর্তে সবাক হয়ে উঠেছিল।

আজ এতদিন পরে সেই পুরনো প্রশ্নটা তুলে দিয়েই আজও ওর মাথাটা যেন সেদিনের মতই মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, মালিক তোমাকে তাড়িয়ে দিল অক্ষয়, এটা যেন বিশ্বাস করা যায় না।

অক্ষয় বলল, যে শ্রমিক বয়স্ক হয়ে যায়। যার খাটবার ক্ষমতা কমে যায়। অন্য সংসারের প্রয়োজন বেশি হয়ে পড়ে। বন্ধু মালিকের কাছে হাত পেতে দেনা চেতে হয় তখন মালিক আর বন্ধু থাকে না, সে শুধু মালিক হয়ে সামনে দাঁড়ায়। একদিন কারখানায় গিয়ে দেখলাম আমার মেশিনে অন্য লোক।

মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। অক্ষয়ের পরিশ্রমের ওপরেই যে পাঁচটি প্রাণীর দু'বেলার আহার। দু'বেলা পেটপুরে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই, এবার অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

একটা বিরক্তিকর মাদকতা আমলের পুরনো গন্ধ। সামান্যতম নতুনত্বও এখানে নেই। আমি ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, কেননা ওর অকালে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া শরীর আর চাপ চাপ হতাশায় বিষাদ হয়ে যাওয়া ওর কোটরে বসা চোখের দৃষ্টি আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল।

বললাম, আমি যাই অক্ষয়, আমার কাজ আছে।

একবার অক্ষয় যেন একটু চমকে গেল। লাঠি ঠুকে ঠুকে আমার দিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বলল, আমি যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

আমার কাছে যাচ্ছিলে? কেন?

অক্ষয় বলল, এ পচ্ছেই যে ছেঁটে এগোনো দরকার এ কথাই ত তোমরা আমাকে বোঝাতে।

যদিও কারখানাগুলোর ছুটির সময় হয়ে এলো। অনেক মানুষ তাদের নানা সমস্যা নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। একটি মুহূর্তে সময়ও আমার অপচয় করবার নেই। তবুও আমি দাঁড়ালাম। অক্ষয়ের কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যাওয়া মৃত্যুপথ যাত্রী একটা মানুষ, যার বুকে বাঁচার অসীম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার পাথরটা, যা সারা জীবন ধরে মানুষ পায়ে মাড়িয়ে গেছে। মনে হোল, এখন যেন সেখান থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে—যে আগুন ওর চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। মানুষটা সোজা হয়ে মানুষের মতো হাঁটতে চায়। মানুষ হিসাবে আমি দাবিদাওয়া করলাম। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, পারবে আমার হাত ধরে হাঁটতে?

অক্ষয় শান্ত মুঠোয় আমার হাত চেপে ধরল।

জনতা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ও সাধারণ লুঙ্গি প্রস্তুতকারক:

নন্দাই কলোনী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

গ্রাম+পো: নাদাই, জেলা. বর্ধমান

সুনীল রায়
সভাপতি

রামারঞ্জন বেরনাথ
সম্পাদক

গ্রাম কালনা টাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

গ্রাঃ কালনা. পোঃ ধাত্রীগ্রাম. জেলা বর্ধমান

প্রসিদ্ধ টাঙ্গাইল, চাকাই, সিল্ক, বুটি ইত্যাদি প্রস্তুতকারক। আমরা তন্তুজ, তন্তুশ্রীতে কাপড় সরবরাহ করি।

আমাদের বিক্রয় কেন্দ্র: "তন্তুসাজ"

দেবরাণী সুপার মার্কেট
কালীতলা, বর্ধমান

শান্তিলাল বসাক
সম্পাদক

For Better Service
And More Interest
Open your Account

In

THE BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LIMITED

(Registration No. 5 Calcutta of 1947)

23A, N. S. ROAD (3rd Floor), CALCUTTA-700 001

Dial : 20-8564

EARN & EARN TO SAVE
ITEM OF YOUR EXPENDITURE

● MAKING SAVINGS THE FIRST
● SAVE FOR SAFETY AND SECURITY

Rate of Interest on Fixed Deposit & other Deposit :

Savings Bank Accounts
For Deposit 46 days & above but less than 1 year
For Deposit 1 year & above less than 2 years
For Deposit 2 years and above less than 3 years
For Deposit 3 years and above
Recurring Deposit of Rs. 10/- to Rs. 1,000 &
Co-operative Yojna of Rs. 500 - to Rs. 10,000 -
earn quarterly compound interest of 11%
P.A. for 12 months and @ 12% P.A. for 24 months
and 13½% P.A. for 3 years and above

Prompt in Service :

Cordial in behaviour :

Co-operative in Activities.

FOR PARTICULARS PLEASE CONTRACT SECRETARY

● **Cheque clearing facilities are available** ●

রে ক্যাডবেরি আর হবেনা দেখা

শ্যামল দেব

রান্নাঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত হল। শ্রীমতী ও'ব্রায়েন যখন দরজাটা খুললেন, দেখলেন পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর সংসারের ভার ভাড়াটে মিঃ রামিরেজ। তার দুপাশে দুজন পুলিশ।

"কি ব্যাপার মিঃ রামিরেজ?" শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের কণ্ঠে বিস্ময়।

রামিরেজকে বিহ্বল দেখাচ্ছিল। সে তখন বুঝিয়ে বলার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

দু' বছর আগে সে শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের এই বাড়িতে এসেছে। মেক্সিকো সিটি থেকে সোজা বাসে এসেছিল সান দিয়েগো, তারপর একইভাবে সেখান থেকে লস-এঞ্জেলস। এখানে এসে এই ঘরটি খুঁজে বার করেছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, মেঝেতে ঝকঝকে নীলরঙের লিনোলিয়াম, ফুলকাটা দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি আর ক্যালেন্ডার। সর্বোপরি শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের মত কড়া অথচ দয়াময়ী বাড়িওয়ালী। যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন ফ্যাক্টরিতে উড়ো জাহাজের ডানাদুটো তৈরি করত। এখনও যুদ্ধের পরেও সেই চাকুরিটা বজায় রেখেছে এবং বেশ মোটা টাকা কামাচ্ছে। তার থেকে কিছু জমিয়েওছে। মানুষটা সপ্তাহে একদিন নেশা করত—এই সুযোগটুকু শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের মতে প্রত্যেক খেটে-খাওয়া মানুষেরই থাকা উচিত। একথা নিয়ে কোন প্রশ্ন করা চলে না, তিরস্কার করা দূরে থাক।

এই সময় শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের রান্নাঘরে মাংসের কড়া ভাজা হচ্ছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়াগুলির রং হয়ে উঠবে মিঃ রামিরেজের গায়ের মত বাদামী, চকচকে এবং মুচমুচে। রান্নাঘর থেকে সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছিল। একটা পুলিশ তো তার ঘ্রাণ নেবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। রামিরেজ তার পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সেও এরাই জন্যে এইসব ব্যাপারের মধ্যে টেনে এনেছে।

"কি হয়েছে মিঃ রামিরেজ?" শ্রীমতী ও'ব্রায়েন আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

চোখ তুলতেই রামিরেজ দেখতে পেল শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের পিছনে লম্বা খাবার টেবিলটা। তাতে সাদা লিনেন পাতা, তার ওপরে সাজানো হয়েছে খাবার থালা, ঝকঝকে কাচের ঠান্ডা জল, একটা তেলের পাত্র—তার ওপরে বরফের টুকরো দেখা যাচ্ছে, টাটকা সালাদ একটা বাটিতে, আর একটাতে কলা আর সেদ্ধ—ছাড়িয়ে টুকরো করা এবং চিনি মাখানো। এই টেবিলে বসে আছে শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের ছেলেমেয়েরা, ছেলে তিনটি মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। মেয়ে দুটি ছোট। তারা

করছিল।

শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের গোলগাল হাত দুটোর দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলল রামিরেজ, "আমি প্রায় তিনটা মাস এখানটায় ছিলাম।"

পুলিশ তার জবাবে বলল, "তার মানে আপনি ছয় মাস দেশ ছেড়েছেন।" তারপর শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের দিকে ফিরে বলল, "দেখুন, এই ভদ্রলোকের একটা ওয়ারেন্ট ছিল। আমরা ভোর বেলায় এসে এইসব ওঁকে সেরেছি।

এই বাড়িতে আসার পর পরই রামিরেজ তার ছোট ঘরে একটা রেডিও কিনে এনেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সেটা চালিয়ে তার বাকিটা উপভোগ করত।

বিকেলটা

কোলাহল নানারকম বড়শি পাতা দেখে নিজের ঘরের দরজাটা বিছিয়ে দিল।

তোলা মাছধরার দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কয়েকজন ভদ্রলোকের

হচ্ছিল। সময় সে সপ্তাহে পড়তে পারত। একটা সময় সারা রাত ধরে বাড়ি ভরে থাকত ভোজনবিলাসের বিশ্বাসের আলোয়, তার ভাব পড়ে থাকত ঘরে ঘরে নানারকম বিজ্ঞাপন, বাদ দেয়া পুরনো চাকার ঘরগুলি কথা, পাশ দিয়ে চলে যাওয়া যুদ্ধের স্মৃতিলিপি, বড় বড়

পূর্ণ উপভোগ করত। একটা বড় বড় বেড়াবার ছেড়, অনেক পরের খাবার ছেড়, থিয়েটারে ছেড়, আপনার নিজের গান শুনত। একটা গাড়িও কিনে ফেলেছিল পরে আসল যখন বিক্রির মেটাতে দুটো বিয়েছিল, সোমবারে এসে রোজকার ঘরে সামনে থেকে গাড়িটা চলে গিয়েছিল।

একজন রামিরেজ বলল, "তাই আমি বলতে এসেছি যে আমাকে আপনার ঘর ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এখন আমার সমস্তকাপড় মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে একের সঙ্গে চলে যেতে

হবে।"

"মেক্সিকোয় ফিরে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ। লাসোলে। সেটা হচ্ছে মেক্সিকো সিটির উত্তরে একটা ছোট্ট শহর।"

"মিঃ রামিরেজ, আমি দুঃখিত।"

"আমার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে", বলতে বলতে রামিরেজের গলাটা ভরে এল। তার কালো চোখের তারা দুটি পিটপিট করতে থাকল আর হাত দুটো অন্ধকারের মত নাড়তে থাকল। পুলিশ দু'জন তাকে ধরল না। তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রামিরেজ বলল, "এই যে চাবিটা। আমার ব্যাগপত্র নেওয়া হয়ে গেছে।"

শ্রীমতী ও'ব্রায়েনের এতক্ষণে চোখে পড়ল যে বারান্দায় একটা ছোট সুটকেস দাঁড় করানো রয়েছে।

রামিরেজ খানেকবার সেই বিশাল রান্না ঘরের চেহারাটার চোখ বুলিয়ে নিল। চোখে পড়ল ঝকঝকে রূপোর ঘড়িটা, খেয়ে-বসা বাসনগুলো, পালিশ-করা ঝকঝকে মেঝে। ঘরে বাড়ির সামান্য কিছু বেশি সময় নিয়ে তাকিয়ে দেখল পাশের তিনতলা উঁচু সুদৃশ্য অ্যাটবাড়িটা—তার বারান্দা, চিমনি এবং পিছনের সিঁড়ি।

"তুমি কিন্তু ভাড়াটিয়া হিসেবে খুব ভাল ছিলে।" শ্রীমতী ও'ব্রায়েন বললেন।

"ধন্যবাদ। শ্রীমতী ও'ব্রায়েন, আপনাকে ধন্যবাদ।' খুব আস্তে আস্তে সে কথাগুলি উচ্চারণ করল, তার চোখ দুটো বুঁজে এল।

শ্রীমতী ও'ব্রায়েন দরজাটা আধখোলা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছন থেকে তাঁর এক ছেলে বলল যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তিনি মাথা নেড়ে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং রামিরেজের দিকে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে পড়ল, মেক্সিকোর সীমান্ত অঞ্চলে কোন এক শহরে তিনি একবার গিয়েছিলেন। গরমকাল, অসংখ্য লোকমোকড়ের লাফালাফি, রাস্তার ধারের দোকানগুলির জানালার নীচে বিয়ার-সিগ্রেটের পোড়া টুকরোর মত চারপাশে তাদের ঘরে পড়ে থাকা, নদীর জল থামারে ঘরে নিয়ে যাওয়া ক্যানেলগুলো, নোংরা রাস্তা, হেতে ওঠা মাঠ—ইত্যাকার নানা দৃশ্য। তাঁর মনে পড়ল সেই নিরক্ষুম জনপদ, প্রতিদিন গরম বীয়ার সহযোগে নানারকম গরম গরম খাবার। ঘাম-পায়ে ঘাস চেটে নিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো, রোদে-পোড়া বিশি ঘরগোশ—এই সবও তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠল। লোহ পর্বত, ধুলো-ভরা সেই উপত্যকা এবং সমুদ্রতীর মাইলের পর মাইল, নিঃশব্দে ঝড় ছেড়ে আমড়ে পড়ছে, এই সব কিছু তার মনে পড়ল তবে মনে পড়ল না কোন আড়ি-বাড়ি বা অন্য কিছু।

"আমার মাঁড়াই খুব খারাপ লাগছে মিঃ রামিরেজ।"

"আমি কিন্তু ফিরে যেতে চাই না শ্রীমতী ও'ব্রায়েন।" খুব ক্ষীণ স্বরে সে এই কথাগুলি বলল। "আমার এই জায়গাটাই পছন্দ। আমি তো এখানেই থাকতে চাই। এখানে কাজ পেয়েছি। টাকাও রোজগার করছি। ভালই তো আছি; তাই না? আর আমি ফিরে যেতে চাই না।"

"আমি দুঃখিত মিঃ রামিরেজ।" তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছে তোমার জন্য কিছু অন্য রকম যদি করতে পারতাম।"

"শ্রীমতী ও'ব্রায়েন!" সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল। চোখের পাতা বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দুটো বাড়িয়ে সাগ্রহে সে তাঁর হাতটা চেপে ধরল, তারপর কাঁদুনি দিয়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ। "শ্রীমতী ও'ব্রায়েন, আপনাকে তো আর দেখতে পাব না, আর দেখতে পাব না।"

পুলিশ দু'জন এইসব দেখে হেসে ফেলল। কিন্তু রামিরেজ সেটা লক্ষ্য করেনি। তবেও তারা তাড়াতাড়ি হাসিটা লুকিয়ে ফেলল।

"বিদায় শ্রীমতী ও'ব্রায়েন। আপনি আমার কত উপকার করেছেন। আহা, বিদায় শ্রীমতী ও'ব্রায়েন। আর দেখা হবে না।"

পুলিশ দু'জন অপেক্ষা করে রইল, যতক্ষণ না রামিরেজ ঘুরে দাঁড়াল এবং সুটকেসটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এবার তারা টুপি খুলে শ্রীমতী ও'ব্রায়েনকে অভিবাদন জানিয়ে তার পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। তিনি তাদের বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে দেখলেন। তারপর আস্তে দরজাটা বন্ধ করলেন এবং খাবার টেবিলের পাশে চেয়ারটায় ফিরে এসে বসলেন। চকচকে কাঁটা-চামচটা নিয়ে আবার মাংসের টুকরো কাটতে লাগলেন।

"তাড়াতাড়ি খাও না মা। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।" তাঁর এক ছেলে বলল।

শ্রীমতী ও'ব্রায়েন একটা টুকরোয় কামড় বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগলেন। একবার বন্ধ দরজাটার দিকে চোখ তুলে চাইলেন, তারপর কাঁটা চামচটা নামিয়ে রাখলেন।

"তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে বল তো মা?" তাঁর ছেলে জানতে চাইল।

"আমি ঠিকই বুঝতে পারছি", শ্রীমতী ও'ব্রায়েন বললেন; তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন—"মিঃ রামিরেজের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।"

রে ব্র্যাডবেরী মার্কিন দেশের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। গল্পটি "নিউ ইয়র্কার" পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। ১৯৪৭ সালে লেখা। অনুবাদ : শ্যামল চৌধুরী

THE SHIBPUR CO-OPERATIVE BANK LIMITED

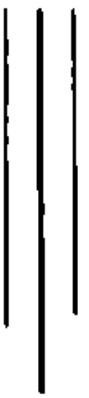

173 & 174 Shibpur Road, Shibpur
HOWRAH-2

ENJOY YOUR HOLIDAYS AT OUR HOLIDAY HOMES

at

PURI
Narayan Bisram Road
Puri (Orissa)
(West of Pantha Bhawan)
of
O. T. D. C.
&
at the nearest of
SEA VIEW HOTEL

DARJEELING
5, Tenzing Norgy Road
Tung Sung
Darjeeling
West Bengal

MUSOORIE
SYLVERTON HOTEL
Opp. Picture Place
The MALL
Musoorie
U.P.

To be started from 1st. October, 1991

For Reservation of accommodation please contact :

Steel Authority of India Employees' Co-operative Credit Society Limited

2, Fairle Place
Calcutta-700 001

Phone : 20-2371 (Extn. 325/430)

The Electro Urban Co-Operative Credit Society Limited

VICTORIA HOUSE
Calcutta-700 001
Phone : 27-6000/09

Serving more than 12,500 Employees of the CESC LTD.
for more than 80 Years.

Maintaining Holiday Homes at
Digha, Puri, Varanasi, Shantiniketan and Darjeeling.

With good wishes from :

Bankura District Unemployed Engineers' Co-operative Societies' Association

(BANKURA UNIT)
S E C O – WEST BENGAL
Office :
PATPUR ROAD (Opposit Gouranga Lodge)
P.O. & Dist BANKURA

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ :

ত্রিবেণী সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড

রেজিঃ নং—৮ (১১৭৮-৭১

তাজাপাড়া ★ জলপাইগুড়ি

"আমাদের উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের কাপড় কাচার সাবান 'ত্রিবেণী' ব্যবহার করুন।"

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertiliser plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,
NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be
important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

পছন্দ

শেখর বসু

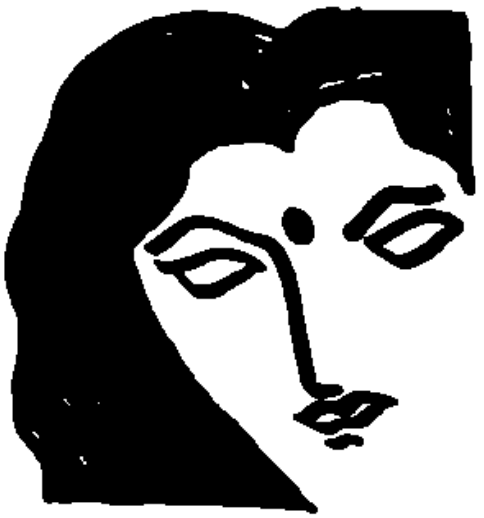

গাড়ি শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর মধ্যে ঢুকতেই পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে বেশ একটা পিকনিক-মুড তৈরি হয়ে গেল। শীতের রোববারের সকাল। কমলালে রোদ ছড়িয়ে আছে সামনের রাস্তা ও দু'পাশের মাঠে। এই দলে আছে দু'জোড়া স্বামী-স্ত্রী আর একটি বিয়ের পাত্র। পাত্রের নাম অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাত্রের জন্যেই দুই বন্ধু সস্ত্রীক পাত্রী দেখতে যাচ্ছে গোবিন্দপুরে। জায়গাটার নাম সত্যি-সত্যি গোবিন্দপুরে নয়, তবে দু'দিকে যে-ভাবে গা-গঞ্জ শুরু হয়ে গেছে, তাতে জায়গাটার নাম পঞ্চানন মিত্র বাইলেনের বদলে গোবিন্দপুরে হলেই বোধহয় ভাল হত।

অতনুর বিয়ে করার শখ হয়েছে তেত্রিশ বছর বয়সে, তাও আবার যোগাযোগ না-সম্বন্ধ করে। শিক্ষিত, সুদর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত দাবি-দাওয়াহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কাগজে। বাছাই-করা চিঠির প্রথম লটের প্রথম মেয়েকে দেখতে যাওয়া হচ্ছে এখন।

অতনু যা-যা চায় সে-সবের ওপর জোর দেখেই চিঠি বাছাই করা হয়েছে। বাছাইয়ের ব্যাপারে পাত্র নিজেও বেশ উদ্যোগ নিয়েছিল। মেয়েকে অতি অবশ্য সাধারণ পরিবারের মেয়ে হতে হবে। খুব একটা সুন্দরী হওয়ার দরকার নেই। ভদ্র এবং শিক্ষিত পরিবারের মোটামুটি শিক্ষিত মেয়ে হলেই চলবে।

একই রাস্তায় বেশ কয়েকটা চড়ার পরে পাওয়া গেল পঞ্চানন মিত্র বাইলেন। এ গলিতে গাড়ি ঢুকবে না, সুতরাং বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে সদলবলে গলিতে ঢুকল পাত্র।

কচুরিপানা-ভর্তি একটা ছোট ডোবা, তার গা ঘেঁষে উঠেছে টিনের মোতলা বাড়ি। নম্বর মিলিয়ে বোঝা গেল এই বাড়িটাই ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্যর বাড়ি। বেশ কিছুক্ষণ দরজায় কড়া নাড়ার পরে মোতলার খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে খুব আস্তে আস্তে নেমে এলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। ইনিই মেয়ের বাবা। পাঁচজন সুবেশ মানুষের পরিচয় পেয়ে ভীষণ লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আরে আপনারা! ছি-ছি, কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি—আসুন-আসুন, ওপরে আসুন।'

এই ধরনের খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা বেশ কঠিন কাজ, বিশেষ করে এই পাঁচজনের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেকেই মুখে সামান্য হাসির ভাব বজায় রেখে মোতলায় উঠে এলো।

মোতলায় উঠতেই একটা ঘর। ঘরের মেঝেয় মাদুর, মাদুরের ওপর একটা শতরঞ্জি বেছানো। হাত জোড় করা অবস্থাতেই শতরঞ্জিটা দেখিয়ে মেয়ের বাবা বললেন, 'বসুন বসুন। আমরা গরীব মানুষ, আপনাদের খুবই অসুবিধে হবে, তবু—।'

উত্তরে অতিথিরা রীতিমত বিব্রত হয়ে 'না, সে কী!' ইত্যাদি বলতে বলতে বসে পড়ল। কিন্তু গুছিয়ে না বসা পর্যন্ত ভদ্রলোক অপরাধী-অপরাধী মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর 'আসছি' বলে চলে গেলেন ভেতরের ঘরে।

এ-ঘরের কোণের দিকে ছোট্ট একটা তক্তপোশ। তক্তপোশের পায়ের নিচে আধলা ইট। পাশাপাশি রঙ চটা তিনটে টিনের বাক্স। একপাশে পুজোর জায়গা, চার-পাঁচটা সিঁদুরলেপা ঠাকুরের পট পাশাপাশি দাঁড় করানো। ঘর দেখলেই বোঝা যায় গৃহস্বামীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। অতনু সাধারণ মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিল এরা তার চেয়ে বেশ বেশি সাধারণ। অবশ্য অতনু এতে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নয়, কারণ ওর বিজ্ঞাপনের ভাষায় পাত্রীই তো একমাত্র বিক্রেয়।

মুখ সামান্য নিচু করে বসেছিল অতনু। ওকে দেখে ইলা আর মীরু মুখটিপে হাসতে হাসতে শেষ করে ফেলল সামান্য। অতনু চোখ তুলতেই দেখল সবার চোখ ওর দিকে। ওকে দেখে প্রায় নিঃশব্দে সবাই আর এক পর্দা হাসল।

একটু বাদে দুটি বাচ্চা ছেলে প্লেটভর্তি সিঙাড়া আর মিষ্টি রেখে গেল সবার সামনে। খাবার দেখে সবাই খুব বিব্রত হল, কেননা প্রত্যেকেই বোধহয় মনে-প্রাণে চাইছিল—ওদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে গরিব এই পরিবারটির অবস্থা খারাপ্তর যেন না হয়! কিন্তু খাবার বন্ধ করার উপায় নেই। 'আবার এসব কেন!' বলার পরে চুপ করে গেল ওরা।

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে বললেন, 'গরিবের ঘর, আপনারা কিছু না খেলে আমরা খুব দুঃখ পাব।'

ও কথার পরে আর কোনও কথা চলে না।

অতিথি আপ্যায়নের পরে ভদ্রলোক

আবার 'আসছি' বলে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। একটু বাদেই ফিরলেন ফুল তোলা একটা আসন নিয়ে। আসনটা পাতা হল অতিথিদের ঠিক সামনে।

কিছুক্ষণ বাদে দেয়ালে কোনাকুনি দুটো ছায়া পড়ল। তারপর দেখা গেল মোটা-সোটা এক ভদ্রমহিলা রোগা, লম্বা একটি মেয়ের হাত ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে আসছেন।

মেয়েটির বয়েস বোধহয় চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই মেয়ের মা। মা মেয়েকে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলেন ফুল তোলা আসনের ওপর। তার পরেই মেয়েটি অতিথিদের রীতিমত চমকে দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। অপ্রস্তুত অতিথিরা পালটা নমস্কার করল মেয়েটিকে, কিন্তু সে নমস্কার দেখতে পেল না মেয়েটি: ওর মুখ নিচের দিকে অনেকখানি ঝোঁকানো। সারা সিঁড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার।

মেয়েকে বসিয়ে দেওয়ার পরে মা আস্তে পিছু হটে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবার মুখে মৃদু উত্তেজনার ছাপ, একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে অমল বলল, 'আপনি বসুন না।' কপালে উঁনি কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না, তারপর মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

হরেশ এখানে আসার পরে একটা কথাও বলেনি, হঠাৎ পাত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী নাম আপনার?'

মেয়েটি কোনও জবাব দিল না, ওর বাবা তার ফলে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'বলো বলো, তোমার নাম বলো।'

কথাটায় তখন সায় দিয়ে চাবি নাড়ার শব্দ উঠল দরজার কাছ থেকে।

মেয়েটি এবার খুব নিচু গলায় নিজের নাম বলল—'কুমারী অঞ্জলি ভট্টাচার্য।'

এবারও চমকে উঠল অতিথিরা। নামের আগে কাউকে 'কুমারী' বলতে এরা বহুকাল শোনেনি।

মেয়েটির পরনে লালচে তাঁতের শাড়ি, টান করে বাঁধা চুল, মুখে কড় বেশি পাউডার। গায়ের রঙ ফর্সার দিকে, কিন্তু মায়ার মোলায়েম মুখ আর হাতের স্বচ্ছ নখো বিরাট তফাৎ। নাম বলার পরে কুমারী অঞ্জলি ভট্টাচার্যের মুখ আরও বেশি করে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

মেয়ের বাবা গড়গড় করে নিজেদের বংশমর্যাদার কথা বলে যাচ্ছিলেন। নিজেদের বংশমর্যাদা আর অতীতের সুদিনের প্রসঙ্গ ওঁর কথার ঘুরেফিরে আসছিল। একটা সময় ওদের বাড়িতে দশ-বিশজন অতিথি নাকি প্রতিদিন খেত! আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই যেন বড়লোক, তবে ইচ্ছে করেই ওঁদের সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ রাখেন না। আসলে আত্মমর্যাদাই সবচেয়ে বড় জিনিস। এই আত্মমর্যাদাবোধ উঁনি নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। এতগুলো শিক্ষিত পরিবার বলতে লোকে আঙুল তুলে ওঁদের পরিবারকেই দেখাত।

ভদ্রলোক কলরবে মুখে বললেন, 'প্রবোধভূষণ তর্কালঙ্কারের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

ও নাম অতিথিদের কেউ কখনও শোনেনি, কিন্তু ওরা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

ভদ্রলোক ধরেই নিলেন অতিথিরা বিখ্যাত ওই মানুষটির নাম শুনেছেন। তারপর উঁনি বেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, "উঁনি ছিলেন আমার আপন জ্যাঠামশাই। পাশাপাশি তিনটে জেলার মধ্যে যতবড় পণ্ডিত আর একজনও ছিলেন না। এক রাজা ওঁকে বিস্তর জমিজমা দিয়ে সভাপণ্ডিত করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উঁনি এককথায় 'না' করে দিয়েছিলেন। কেন জানেন? উঁনি চলে গেলে ওঁর চতুষ্পাঠী কে দেখবে? ছাত্রদের কে পড়াবে? অন্ত ওই টোল থেকে ওঁর একটা পয়সাও রোজগার ছিল না।"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়ান ওর ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের।' বলেই কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো তড়বড় করে বেরাল থেকে বহুকালের পুরনো একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ নিয়ে এলেন। তারপর ছবিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন।'

এমনভাবে বললেন যেন এই দেখার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

ভদ্রলোকের অতিরিক্ত আগ্রহের জন্যই অতিথিদের সবাইকেই এক-এক করে ছবিটা দেখতে হল। কবেকার ছবি! ঘুলো-পড়া কাচের ভেতরে একেবারে হলদে-হয়ে যাওয়া ঝাপসা একটা ছবি। ফুলের মালা গলায় দেওয়া একটি মৃতদেহকে ঘিরে বসে আছে একদল শোকার্ত মানুষ।

'জ্যাঠামশাই পঁচাশি বছর বয়েসে মারা গেছেন, কিন্তু দেখলে কি একবারও মনে হয় কত বয়েস হয়েছিল ওঁর!' কথাটা বলেই ভদ্রলোক কেমন যেন সমর্থন পাওয়ার আশায় অতিথিদের দিকে তাকালেন।

জীর্ণ, মলিন একটা ফোটোগ্রাফের ভেতর থেকে এক মৃতের যৌবন খুঁজে পাওয়া রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। অতিথিদের কেউই ওই প্রশ্নের উত্তর দিল না। সবারই বোধহয় অস্বস্তি বেড়ে উঠেছিল—একটা ছবি নিয়ে ভদ্রলোক খুব যেন বাড়াবাড়ি করছেন।

অমল কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ঠিক আছে, ওকে এবার নিয়ে যান, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের মা এগিয়ে এলেন মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যাওয়ার আগে কুমারী অঞ্জলি ভট্টাচার্য অতিথিদের আর একবার বিনত করে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

এই ধরনের অনুষ্ঠানের শেষের দিকে যে ধরনের কথাবার্তা হয়ে যেতে থাকে সাধারণত, সেই ধরনের কথাবার্তা বলার পরে অতিথিরা বিদায় নিল।

বাইরের রোদ ইতিমধ্যে বেশ চড়া হয়ে গেছে। সেই অনোরম উত্তাপ আর বাতাসে

নেই। আঁতিপাঁতি খুঁজে পায়ে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারপর তমাল বলল, 'বিজ্ঞাপনের চিঠিগুলো কে বাছাই করেছে রে?'

অতনু কোনও উত্তর দিল না।

'কী রে বলবি তো?'

ধমক-মেশানো সুরে প্রশ্নটা শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠল সবাই। হাসির মধ্যেই গাড়ি ছুটতে শুরু করে দিল ফেরার পথ ধরে।

হাসি আর থামতেই চাইছিল না। ওই হাসির মধ্যেই শুরু হয়ে যায় মজার কথা। চার আধুনিক, সৌখিন বাবু-বিবি মজা আর ঠাট্টা করে যাচ্ছিল সমানে। ওদের সব মজা আর ঠাট্টার মধ্যে ছিল পাত্রী, পাত্রীর বাবা-মা, বিদঘুটে বাড়ি, এমনকি টিনের বোতলে ওঁচার ঝাড়াই সিঁড়িটা পর্যন্ত। দুশ্চাপ অতনু শুধু মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল জানলার দিকে।

হাসি, ঠাট্টা আর মজার মধ্যে গাড়ি এক-সময় শহরতলী ছেড়ে ঢুকে পড়ল শহরের মধ্যে।

অতনু এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, সেটা খেয়াল হতেই হাসতে হাসতে মীনু বলল, 'কী অতনুদা তখন থেকে চুপ করে বসে কী ভাবছেন? কুমারী অরুন্ধতী ভট্টাচার্যের কথা?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভাবছি, এই বয়সের মেয়েকে বিয়ে করলেই বোধহয় সাতপুরুষের সুখী হওয়া যায়।'

অতনু অনেকক্ষণ ধরে কোনও কথা বলেনি, আর বলেনি বলেই বোধহয় ওর গলাটা বেশ ভারি শোনালো।

ওর কথাটাকে সুন্দর রসিকতা ভেবে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠেছিল সবাই, কিন্তু কী কারণে হাসিটা যেন থেমে গেল হঠাৎই।

গাড়ি ইতিমধ্যে শহরের বড় রাস্তার ঢুকে পড়েছে। চারদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি আর নানা রকমের হর্নের আওয়াজ। বাইরে এত আওয়াজ বলেই বোধহয় গাড়ির ভেতরের সবাই চুপ করে গিয়েছিল একদম।

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

চোরপাহাড়ী এস কে ইউ এস লিঃ

গ্রাম ও পোঃ—চোরপাহাড়ী, জেলা—পুরুলিয়া

রেজিঃ নং ঃ ৫ সি, ডেটেড ঃ ১৬-২-১৯৬১, সদস্য সংখ্যা ঃ ৪২৫ জন

- ☐ আমরা কৃষক সদস্য ভাইদের স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষি ঋণ খুবই অল্প সুদে যোগান দিই।
- ☐ মহাজনদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।
- ☐ I.R.D.P. স্কীমে Delivery Order-এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ভিত্তিক দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করি।

● পরীক্ষা প্রার্থনীয় ●

নগেন্দ্রনাথ মাহাতো	গোপালচন্দ্র মাহাতো	রাধানাথ মাহাতো
ম্যানেজার	সম্পাদক	সভাপতি

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ।

মেটালশহর এস কে ইউ এস লিঃ

গ্রাম ঃ মেটালশহর, পোস্ট ঃ চোরপাহাড়ী, জেলা ঃ পুরুলিয়া

রেজিঃ নং—২০ (সি), ডেটেড ঃ ১৮-৪-১৯৫৮, বর্তমান সদস্য সংখ্যা—৩৮০

- ০ এলাকার কৃষক ভাইদের নিজস্ব সমবায় প্রতিষ্ঠান। মহাজনদের কবল থেকে কৃষক ভাইদের রক্ষা করিয়া তাহাদেরকে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ যোগান সহ রাসায়নিক সার, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছে।
- ০ সময়মতো কৃষি ঋণ পরিশোধ করিলে সরকার প্রদত্ত সুদ ভরতুকি পাওয়া যায়।
- ০ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আই আর ডি পি দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করিতেছে।

দুর্গাপদ রাজি	অনিল ঘাটোয়ার	বরিপদ মণ্ডল
ম্যানেজার	সম্পাদক	সভাপতি

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

বসাকপাড়া ট্যাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

পোঃ ধাত্রীগ্রাম জেঃ বর্ধমান

ট্যাঙ্গাইল, ট্যাঙ্গাইল সিল্ক, এরি ট্যাঙ্গাইল, ঢাকাই বুটি ও ঢাকাই জামদানী উৎপাদন ও সরবরাহের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

ভোলানাথ বসাক	গোপালকৃষ্ণ বসাক	গৌরচন্দ্র বসাক
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

BANGASHREE MAHILA T. S. S. LTD.

Vill. Talbana P.O' Nibhuji Bazar

Dist. Burdwan

জরতা শাড়ী, ধুতী, লুঙ্গী উৎপাদন করে।

জ্যোৎস্না দেবনাথ	শৈলেনকুমার দেবনাথ	মাধবী দেবনাথ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদিকা

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ :

কমলনগর তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : কমলনগর পো: ভামাখাটা বর্ধমান

এখানে ১০০" × ২০০" টাঙ্গাইল, জামদানী, বুটী শাড়ী উৎপাদন করা হয়।

আমাদের সমস্ত উৎপাদিত শাড়ী তন্তুজ ও তন্তুশ্রীতে সরবরাহ করা হয়।

শ্রীহরিপদ বিশ্বাস	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল	শ্রীশ্যামল মণ্ডল
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

মানচিত্রের চালচিত্র

ভোলানাথ বসু

ম্যাপ শব্দটি এসেছে লাতিন ভাষার 'ম্যাপ্পা' (mappa) শব্দ থেকে। যার অর্থ ছিল রুমাল। এ্যাটলাস হল ম্যাপবুক। এ্যাটলাস হল ম্যাপের আধুনিক ব্যবস্থাপনার উন্নতরূপ। বিভিন্ন বিষয়মুখীন এ্যাটলাস তৈরী করা হয়ে থাকে। যেমন, ফরেস্ট এ্যাটলাস, এগ্রিকাল্চারাল এ্যাটলাস, ল্যান্ড ইউস ম্যাপিং, পপুলেশন ম্যাপিং, ম্যাপিং অফ ইকনমিক্স ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ওইয়ার-সিফিকেশন, ম্যাপ ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, জিওমরফোলজিক্যাল ম্যাপিং, ম্যাপিং অফ সয়েল ডিগ্রেডেশন, কমোডিটি জো ম্যাপিং, ল্যান্ড কনসার্ভেশন ফ্রম স্যাটেলাইট ইমেজারিস ইত্যাদি।

মানচিত্র মানব সভ্যতা বিকাশে এক বিরাট হাতিয়ার। মানচিত্র বলতে সাধারণতঃ গোলাকার পৃথিবীকে কোন সমতল ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সঠিকভাবে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এতে জায়গা বিশেষের ভূ-প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের সীমারেখা, নদ-নদী, সাগর উপসাগর, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত, বনজ, কৃষিজ, খনিজ এবং শিল্পজ সম্পদ, পরিবহন ব্যবস্থা, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয় নানাপ্রকার অঙ্কিত রং ও চিহ্নদ্বারা চিত্রিত করা হয়।

মানুষ এই পৃথিবীতে এক খুবই ক্ষুদ্র প্রাণী। পৃথিবীর বসবাসকারীদের সঙ্গে সে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ এই জটিল পৃথিবীতে অন্যান্য কলাকৌশলের সাথে মানচিত্রাঙ্কনের সাহায্যে স্থানাঙ্ক সম্বন্ধ খুঁজে তুলতে চায়। বলতে গেলে মানচিত্রাঙ্কন পর্যন্ত মানুষকে তার তাৎক্ষণিক দৃষ্টিসীমার উর্ধ্বে রাখে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করায়। একটা বড় জায়গার অবস্থানকে ক্ষুদ্র পরিসরে মানচিত্রে দেখায়: সেই অঞ্চলের ভূমির গঠন, পয়ঃপ্রণালী, বসতির অবস্থা, রাস্তা, কৃষিক্ষেত্র বা অন্যান্য রকমের অন্যান্য ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, যা তাকে সমাক জ্ঞান দেয় এবং যা দিয়ে সে দৃষ্টিবৃত্তি [illegible]

যা বাড়ির নির্মাণে, সন্যা নিম্নস্তরে বা অন্য যে-কোন গঠনমূলক প্রচেষ্টায় মানচিত্রের অত্যাধিকার থাকে। ভূমিরূপ, ভূমি ব্যবহার, জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, আয় ও আরও বহু বিষয় নিরূপণে এবং কোন এলাকার সমস্যা বা সম্ভাবনা জানার জন্য মানচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। ক্ষুদ্র স্কেলে সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র সর্বজনীনতা প্রকাশ করে এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহকে দৃষ্টিবৃত্তির সঙ্গে বিবেচনা করে সার্বিক পার্থিব ব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপন করে। নিখুঁতভাবে অবস্থান জানার আকার, আয়তন ও কৌণিক দূরত্ব মানচিত্রে আঁকা অসম্ভব কাজ। মানুষ যা এই পৃথিবীতে দেখে, বাস্তব বা অন্যকিছু তা দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় মানচিত্রাঙ্কন করতে পারে। উপযোগিক পৃথিবীকে মানচিত্রের সমতল ক্ষেত্রে প্রক্ষেপ করার দুটি প্রচলিত প্রণালী হল গাণিতিক (ম্যাথেম্যাটিক্যাল) ও বেলন (সিলিন্ড্রিক্যাল)। মেরু অঞ্চলের জন্য জিনিথাল প্রক্ষেপ করা হয়। প্রত্যেক মানচিত্রের স্কেল আছে। এই স্কেল আনুপাতিক হারে দেখানো হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পৃথিবীর ভূমি ও মানচিত্রের ভূমির প্রত্যক্ষ অনুপাত সমান। এই স্কেল সাধারণতঃ 'রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রাকশন' (R. F) রীতিতে বোঝান হয়ে থাকে। যেমন, ১/১০০ বা ১ : ১০০; মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভূমির ১০০ ইঞ্চির সমান হবে। স্থানাধিকরণমূলক (টোপোগ্রাফিক্যাল), সপ্তকেলে টোপোসীট (Topo Sheet) এবং দেশব্যাপী জরিপ সম্বন্ধীয় (কাডাস্ট্রেল)। মানচিত্র সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ম্যাপে আঁকা ও ছাপা হয়ে থাকে। ১৮১১ সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমস্ত দেশে একই স্কেলে (১ : ১০০০০০০) মানচিত্র প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রফেসর পেশ্ক প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাপের খসড়া প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালে জেনেভা জিওগ্রাফিক্যাল কংগ্রেস মোটামুটি এই মানচিত্রকেই স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় জরিপ সংস্থা (Survey of India) ১৮০২ সালে ল্যাম্বটনের নেতৃত্বে বিজ্ঞানসম্মত জরিপের কাজ শুরু করেছিল। মাদ্রাজের গ্রাধিমা রেখাকে সমগ্র ভারতের মূল দ্রাঘিমারেখা হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এই গ্রাধিমা রেখাটি ৮০° ১৫' ১৫" বা পৃথিবীর মূলরেখা গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত। ১৯৩৩ সালে ঢৌরর 'এ অ্যাটলাস টু ইস্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের মানচিত্রে ভারতের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

প্রাচীনকালে মানচিত্রাঙ্কনের সীমাবদ্ধতা ছিল। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপবাসীরা বিভিন্ন ধরনের শর, নল খাগড়া, বেতবনের চার্ট তৈরী করতো এবং এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপের আপেক্ষিক অবস্থান মানচিত্র নির্ণয় করত। পুরাতন গ্রামাঞ্চ মানচিত্র বা পাওয়া গেছে তা হল ব্যাবিলনের জমি-জমা সম্ভান্ত কিছু লিপি মানচিত্র। মিশরের নীল নদের উপত্যকার সম্পত্তি ঠিক করার জন্য মানচিত্রাঙ্কন করা হত। গ্রীসেও সুপ্রাচীনকাল থেকে মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব দু' শতকে আগে ক্লডিয়াস টলেমী পৃথিবীর মানচিত্র আঁকেন। আধুনিক মানচিত্রকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন পুরোধা। কিন্তু জরিপের বলতে তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং অনেকক্ষেত্রেই অকৃতপূর্ব লাইব্রেরীতে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে মানচিত্র বা ম্যাপ তৈরির প্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন। টলেমীর পর বহু বছর কেটে গিয়েছিল কিন্তু মানচিত্রাঙ্কনের অগ্রগতি তেমনভাবে ঘটেনি, বরঞ্চ অবনতি দেখা দিয়েছিল। মানচিত্র অঙ্কন একটা শৌখিন ও কাল্পনিক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাপে বা মানচিত্রে মানুষ, দন্তু-জানোয়ার, জাহাজ ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা ব্যবস্থাপনা দেখান হত। ফলে ম্যাপে

সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যেত না। হেরেফোর্ড ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ১৩০০ সালে প্রকাশ পায় এবং এই ম্যাপের উপরের দিক্ পূর্বদিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই ম্যাপের কেন্দ্রে জেরুসালেমকে দেখান হয়। অযোধ্যাটির এটা একটি উদাহরণ। আবিষ্কারের যুগে কলম্বাস, ম্যাগিলান এবং অন্যদের বিরাট সাফল্যে ম্যাপের ওপর প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের ফলে ম্যাপের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং ম্যাপের প্রকাশ এবং বিক্রয় এক লাভজনক ব্যবসায় দাঁড়ায়। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই ম্যাপ তখন সঠিক ও নির্ভুল হয়ে যেতে পারে নি। বড় বড় নামী ম্যাপ প্রকাশক সংস্থা—যেমন মর্কেটর, হাউ, হেনড্রিক্স ও হ্যাণ্ড এবং জন্সের কিছু সংস্থা সেই সময় সকলের নজর কেড়েছিল। ৫৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীসের মিলেটাস শহরের অধিবাসী হিকাটিয়াস (Hecataeus) বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রায় নির্ভুল পৃথিবীর মানচিত্র আঁকেন। ৩০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ইরাটস্থেনিস (Eratosthenes) পৃথিবীর আকার মাপার প্রচেষ্টায় এক সহজ ও নির্ভুল পরীক্ষা করেন। তিনি পৃথিবীর পরিসীমা মাপেন ২৮,২৭০ মাইল, যেখানে প্রকৃত মাপ হল ২৪,৮৭৪ মাইল। তিনিও পৃথিবীর ম্যাপ এঁকেছিলেন। ১৪৯২ সালে নুরেমবার্গে মার্টিন বেহাম প্রথম আধুনিক গ্লোব তৈরি করেন। ম্যাপ সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। যেমন পৃথিবীর প্রাচীনতম ম্যাপের নিদর্শন হল একটি মাটির ট্যাবলেট যাতে খোদাই করা আছে ইউফ্রেটিস নদী উত্তর মেসোপটেমিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই মাটির ফলকটির বয়স খৃষ্ট-পূর্ব ২২৫০ সাল। সব থেকে পুরোনো স্কেল করা যে ম্যাপ পাওয়া গিয়েছে সেটি আঁকা হয়েছিল খৃষ্ট-পূর্ব ১৩০০ সালে। এটি ছিল আসলে মিশরের সোনার খনিগুলির পথ-নির্দেশিকা। পৃথিবীর সব থেকে পুরোনো ছাপান মানচিত্র হল পশ্চিম চীনের একটি ম্যাপ। এটি আঁকা হয় খৃষ্ট-পূর্ব ১১১৩ সালে। এশিয়ার সঠিক মানচিত্র আঁকেন জে ডো ১৬৩২ সালে।

আবহাওয়া মানচিত্র বা সিনপটিক্ চার্টের সাহায্যে কোন অঞ্চলের কোন সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা জানা যায়। চার্টকে বিশ্লেষণ করে আইসোবার, উষ্ণ-নিম্ন চাপের অঞ্চল, উষ্ণ-শীতল অঞ্চল, বায়ু প্রবাহের মাত্রা ও গতি, তাপমাত্রার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আর্দ্রতা ইত্যাদি তথ্য জানা যায়। ফোর-কাস্টের (Forecast) দ্বারা ঝড়ঝঞ্ঝা, তুফান, ভূমিকম্পন, হারিকেন, সমুদ্রোচ্ছ্বাস সম্পর্কে আগাম জানার ব্যবস্থা আছে। আজকাল বৈদিক সংবাদে ইনসাট্ উপগ্রহের সাহায্যে টেলিভিশনে আবহাওয়া মানচিত্র দ্বারা প্রাপ্তাম তথ্য জানান দেওয়া হয়ে থাকে।

রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার মত মানচিত্র-বিদ্যা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান নয় বা সমাজ বিজ্ঞানের জন্যেও সত্য সন্ধানও নয়, পক্ষান্তরে মানচিত্র অঙ্কনে যুক্তি ও কার্যকারণ সম্বলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মানচিত্র তৈরির নিয়মকানুন বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ থেকে স্থির করা হয়ে থাকে, যার ভিত্তি ভূ-গোলকের আকার ও পরিমাপ সম্ভাত গণিতবিদ্যা, ভূগোল ও মনস্তত্ত্বের উপর। নানাবিধ মানচিত্রাঙ্কনের তত্ত্বাবধানার্থে বহু প্রতিষ্ঠ বে-সরকারী সমিতি আছে; যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি, ওয়াশিংটন, দি ব্রিটিশ রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটি লণ্ডন, চক্রবর্তিন দাস অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, দ্যা ইনস্টিটিউট জিওগ্রাফিক ন্যাশনাল অফ ফ্রান্স, ন্যাশনালিস্টোগ্রাফিক অফ সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি। এছাড়া ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান কলকাতায় অবস্থিত ন্যাশনাল অ্যাটলাস এণ্ড থিমাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠান দেশের বিষয়ের উপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় চারশোর উপর মানচিত্র তৈরি করে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ম্যাপের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং সুবিদিত। লেখার কলাকৌশলের বহু আগেই ম্যাপের কলাকৌশল উদ্ভব হয়েছিল। ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিদেওয়ার মূল্য জমি বা ভূমির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেয়ে কম নয়। আমাদের মাথা বিভিন্ন ধরনের ম্যাপে ভর্তি, ফলে আমরা সহজে ও তাড়াতাড়ি এ সম্পর্কে সজাগ হই। যুদ্ধে বা শান্তিতে সৈন্য বাহিনী ম্যাপের সাহায্যে অগ্রসর হয়। নতুন স্থান অন্বেষণে ম্যাপ আমাদের বন্ধু। পড়া বা জানার জন্য ম্যাপ আমাদের ভাষার কাজ করে। ম্যাপে চিহ্ন বর্ণমালার কাজ করে। একটা ম্যাপ হাজার হাজার শব্দের সমষ্টি। ম্যাপের উপযোগিতার জন্য এর স্থান অনেকের উর্ধ্বে। জমি-জমার জটিল বিবাদ ম্যাপের সাহায্যে সমাধান করা হয়ে থাকে। ম্যাপের ব্যবহার মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে শুরু হয়েছে। ম্যাপের ভাষা সংক্ষেপে লিপিতে বলা হয়ে থাকে। ম্যাপ শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু।

ভালবাসা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মানুষ আর এখন মানুষকে ভালবাসে না। অনেক অসুবিধে আছে। টেকনিক্যাল অসুবিধে। সবচেয়ে বড় অসুবিধে মানুষ কথা বলে। নিজের ইচ্ছা, মতামত প্রকাশ করে ফেলে। এক মানুষের মত আর এক মানুষের ভালো লাগে না। এক মানুষের ইচ্ছে আর এক মানুষের ইচ্ছার বিরোধী। এক মানুষে আর এক মানুষকে মেনে নিতে না পারলে ভালবাসা গজায় না। আর ভালবাসা স্বার্থশূন্য না হলে টেঁকে না। একমাত্র মানুষ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু [illegible] খানিক হয়ে নিশ্চিন্ত কথা বলতে সন্দেহ হয়। তোমার মতো কি বেড়াল পুরে এসেছে কে জানে। এখন মনে মনে বলি, তোড় কাশো [illegible] ছেলের কথা নিজের ফুটিয়ে তোল, তোমার এসব স্বার্থের কথা। হয় ছেলের চাকরি, না হয় মেয়ের বিয়ে, না হয় পরিচিত কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। একটা না একটা কিছু বেরোবেই। যে ছেলের কথা এইভাবে শুরু হয়, "তোমার মতো মানুষ হয় না ভাই, [illegible]

এই এক দিনই হয়েছিল
হল, তাতেও সুবিধের নয়। যাঁর জন্য [illegible]
তোড় চোখের ভালবাসা থেকে [illegible]

[illegible]
ভালো একটা
[illegible]
ঈশ,
সেই কারণে [illegible]
ভালবাসায় সেতু আর নৈ
সেতু তো সহজ জিনিস নয়।
লোহা লক্কড় চাই।
কথায় আছে ভালবাসায়
দুটি মন মুছে যায়।
ভালবা একটা
[illegible]

খুঁতে চোখা পড়ে যায়। ভালবাসার চোখে কালো-ধলা মেয়েও অপ্সরা। মানুষের মতো ছেলে যেন দেবতা। ভালবাসার চোখে যখন পৃথিবীর দিকে তাকানো গেল না তখন আমার একেবারে ওই পাশের প্রতিবেশী ভদ্রলোকে কি দুর্বিসহ। চওড়া নাক। উঁচু কপাল। বিকট একটা ভুঁড়ি। ছেঁড়ে গলা। সভ্যতা ভব্যতার বালাই নেই। ছেলে, মেয়ে, বউয়ের সঙ্গে গালাগাল করে কথা বলে। রাস্তা দিয়ে হাঁটে ভেড়া-পিঁপড়ের মতো। যেমন দেবা তেমনি দেবী। বউটি তো অহঙ্কারে একেবারে মটমট করছে। আর ছেলে-মেয়েরা! ঠিক যেন জানোয়ার। বাড়ির পাশে এক বিকট উৎপাত বিশেষ।

কলের জল নিয়ে একদিন পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সাংঘাতিক কাজিয়া হয়ে গেল। মেয়ে প্রায় ছাড়ই করে দিত জানোয়ারগুলো। আমি এক সম্মানিত ব্যক্তি, কোথায় আমাকে যাচে জল নিতে দেবে, তা না, বালতিটা টান মেরে ফেলে দিলে! আমি তো আর মার-দাঙ্গায় যেতে চাই না। মানুষকে ভালো না বাসতে পারি, আমার তো একটা ভদ্রতা আছে। মুখে বললুম, জানোয়ার, অশিক্ষিতের দল। তা ওরা আমাকে মারতে তেড়ে ফেলে বাস পেটানোর কায়দায় পেটাতে লাগল। আমার সেই নারকীয়তা, হেঁড়েগলা প্রতিবেশী হঠাৎ ছুটে এলেন। এক ধমকে প্রহরকারীরা সরে গেল। তিনি আমাকে ঠাণ্ডা হতে বললেন, 'জানো, এঁর মতো এমন একজন মানুষ আমাদের পাড়ার গর্ব। জানোয়ার-গুলোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই যে।' বালতিটা উঠিয়ে জলতলায় বসিয়ে দিলেন। ভর্তি বালতি নিজেই তুলে দিলেন ভেতরে। আমি তো অবাক। সেই প্রতিবেশী আমাকে সস্নেহে বললেন, 'কেন ওদের সঙ্গে গোলমাল করতে যান! ওরা জন্তু আমাদের মতো লোকের কাছে।'

অবাক হবার মতো ব্যাপার। ভদ্রলোক আমাকে ভালবাসতেন। আর আমি তাঁকে ঘৃণা করতুম। ভদ্রলোকের ভালবাসা আমাকে ভালবাসতে শেখাল। আর সেই আমি ভালবাসলুম সঙ্গে সঙ্গে মানবের ভিড়ে সেই ভদ্রলোককে দেবতা বলে মনে হতে লাগল। চেহারাটা পর্যন্ত পাল্টে গেল তাঁর। মনে হতে লাগল কি সুন্দর পুরুষালি চেহারা। হেঁড়ে গলাকে মনে হতে লাগল গভীর গম্ভীর উদার কণ্ঠস্বর। লক্ষ্য করলুম, পাড়ার সব মানুষই এই মানুষটিকে ভালবাসে, চায়ও পায়। কেন? কেন মানুষ আমাকে ভালোবাসে না!

'কেন'-র উত্তর পরে নিজেই পেয়ে গেলুম। অহঙ্কার। অহঙ্কার মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায়। নিজেকে আলাদা করে রাখলে, সরিয়ে রাখলে, কেবলই মনে হতে থাকে পৃথিবী ভরে গেছে অপরাধে, সবাই দূষিত বিকৃত। হঠাৎ ঘটনা এসে নিজেরই মুখের সামনে একটি আয়না ধরে। নিঃশব্দে বলে—অন্যকে দেখার আগে নিজের মুখ দেখ। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। যেমন কানে জল ঢুকলে সেই জল বের করার জন্যে কানে আর একটু জল ঢালতে হয়। জল দিয়ে জল বের করার মতো ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা বের করা।

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৬৪. জি. টি রোড, বর্ধমান

ফোন : ২২৪২

এই সমবায় সমিতি সকল প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের যাবতীয় বীজ, বিভিন্নপ্রকার বস্ত্র ইত্যাদির খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা। অফিস স্কুল ও কলেজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়।

এলাকার চাষীভাই ও অন্যান্য জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত এই সমিতি প্রত্যেকের শুভেচ্ছা কামনা করে।

নিভৃত ফুলের প্রজাপতি

কবিতা সিংহ

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল রজত। কাচের বাসনের দোকানটা থাকে থাকে নেবে ফুটপাতের কোল পর্যন্ত এসে পড়েছে। অ্যাসিটিলিনের আলোয় কি নীল, কি কনকনে, দোকান দেখা মোতী মেয়েদের আধখোলা চোখের মত। দু'চোখের শূন্য স্থানে যেন মিনুর চোখ দু'টো রেখে রজত এগিয়ে গেল। কি যেন ওই নকশাটা দূরের আর হেলিয়োট্রোপ, জাপানী বাঁশ-পাতা। মিনুর বিষম দুঃখ, পরশু ও জমনি একটা প্লেট ভেঙে ফেলেছিল। ফুটপাতের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল। রজত বাছাই করতে লাগল। তারপর ঠিক মিনুর মতই আড়চোখে করে উঠে পড়ল। না, দরকার নেই, মিনুর সঙ্গে কালিং স্লীট যাওয়া যাবে। মিনু কাচের বাসনের জগতে, মিনু কিন্তু কিছু কিনবে না, শুধু বাছবে, খুঁজবে, দেখবে, কোথায় সস্তা, কোথায় একটি আলাদা। আবার আসবে, আবার বাছবে রং মিলাবে, বলবে, 'দেখ না কেমন একটু একটু করে সব কিনব—।'

এত সামান্য ইচ্ছে, এত সাধারণ ইচ্ছে মিনুর।

—আমার কি ইচ্ছে করে জানো—? মিনু ওর কাছ ঘেঁষে আসত। মিনুর ইচ্ছের দু'পাশে তখন হরত অফিস ভাঙা মানুষের স্রোত, মিনুর ঘামেভেজা মুখোশ মুখে বিকেলের পড়ানো রোদের তলানি। কখন বাসে উঠবে দু'জনে তার ঠিক ঠিকানা নেই ...এমনি সময় মিনুর ইচ্ছে শুনতে হবে রজতকে—'উ, হ্যাঁ বল কি ইচ্ছে করে?'

—বেশ ইচ্ছে করে কালর মেওয়া সাদা বালিশ, ধবধবে বিছানা, দেখলেই যেন ঘুম পায়, একটা পুরোনো কাপড়রঙা সেড্ দেয়া দাঁড়ানো আলো...সারাদিন পরে তুমি আর আমি ঘরে এসে বসেছি। আমার খুব ইচ্ছে করে জানো, কাছে আর একটু ঘেঁষে আসত মিনু। মেয়ে, কেরানির ইচ্ছেটা যে খুব হাসির আর লজ্জার, আর তা শুনলে আশপাশের কেউ হেসে উঠতে পারে তা মিনু জানত। যেহেতু রজত তার স্বামী, হাসবে না, তাই রজতকেই বলত...'হ্যাঁ জানো এমন কিছু অন্যায় নয় রাতে শোওয়ার আগে কাঁদা খেতে,...।

—মিনু। রজত তাকাত, 'এত বাজে কথা ভাবো কেন?'

—ভাবি কেন? কি কথাই না বললে বলাই, ভাবব না, তুমি যখন গল্প লিখবে, ভাবার কথা ভাবতে না, ভাবের কথা ভাবতে না, ভাবো আমি লিখতে পারিনা বলে কিছু বুঝতেও পারি না, না?

—না, তা নয় বলছি, ওসব আমাদের কোনো দিন—।

—হবে না। নাই বা হল। তাতেই ত ভালো, অন্য কথা ভাবব, ঐ ভাবনাটা পুরোনো হয়ে গেলে ভাবব কেন সবুজ বেড কভার ঢাকা বিছানা। জানালার পরদাগুলো টাট্‌কা সাদা আর পাট ভাঙা, ঘরে টবে গরমে ভাপে ফুটে ওঠা বেলা ফুলের বাহার। খোবার আগে গা ধুয়ে এলাম, তোমার গায়ে পাউডারের তুলিটা বুলে বুলে দিচ্ছি। দরকার নেই নিমু হওয়ার, তবু খুব নিমু হয়ে তোমার সাদা শিঠে ঘামাচি খুঁজছি। তারপর আলোর তাপটা আর সহ্য হল না, নিবিয়ে দিলাম, ওমা। জানালা দিয়ে উঠলে এলো গ্যাসের সবুজ আলো; তোমার কোকড়া চুলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ বানিক জ্বলল...।

কাচের বাসনগুলো নাড়িয়ে রেখে রজত উঠে দাঁড়াল। অচেনা শিল্পদের যেমন আদর করবার জন্য হাত নিস্‌পিস্ করে তেমনি মিনুর জন্যও রজতের সমস্ত মন হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফেল, অন্য উপায় নেই। মিনু এখন হাসপাতালে। মিনু গলা পর্যন্ত চাকা দিয়ে শুয়ে আছে। ডাক্তার বলেছেন ওর বেশী যন্ত্রণা হবে না। অজ্ঞান দু'তিন ঘণ্টা পরে যেতে......, তারই অপেক্ষা হয়ে রয়েছে। রজত এখন এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে মিনুকে যেন ও কখনো দেখে এসেছে। রাহুকালীরা বলেছে, হাত যার ভাবনে না, ও সাহটাই জানবাই করে দেব—। কিন্তু আমি কোথায় যাবো?

রজত মোড়ের মাথায় এসে চারিদিকে তাকালো, গাছের পাতা লাইনে লাল সবুজ আলো ঝিকমিক করছে। একজোড়া স্বামী-স্ত্রী রজনীগন্ধা কিনছে.....স্ত্রীর কানে সোনার ঘণ্টার মত কোলানো দুল!—মিনুকে অমনি দুল পরাবে.....

ওপাশের ছোট রাস্তাটা পার হয়ে তাড়াতাড়ি এপাশে আসছে অলোক। রজতকে কি দেখতে পেয়েছে? রজত তাড়াতাড়ি পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইল, কিছুতেই ওদিক ফেরা নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই সেই এক প্রশ্ন, এক সহানুভূতি।

—রজত, রজত। অলোক একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলল রজত, 'কিরে কেমন আছিস, ক্যালকাটা আছে?.....চল পার্কে বসি।'

দু'জনে পার্কে এসে বসল। ধোঁয়া ছাড়ল রজত।

—তারপর, তোর সেই মেয়ে খবর কি?

সিগারেটে লম্বা টান দিচ্ছে অলোক, শিল্পরা খেলা করছে চারপাশে। চাপা আলো অন্ধকারের একটা মোটামুটি রফায় মেহেদির হাই-লাইট পাতাগুলোকে বৃষ্টি ভেজা মনে হয়,

—কে মেয়ে?

—আ, সেই ভীনভাসিটির, যার সঙ্গে তুই—

স্পষ্ট মনে আছে রজতের কফি সরাই-এর চৌকো টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসা সেই মেয়েটির কথা। খুব লালপাড় পরত, খুব কালো চোখে কাঁচ মুখে লম্বা লম্বা হাসত।

অলোক বলছিল মেয়েটিকে ও বিয়ে করবে।

—ও রিণা! ওকে [illegible]

—অর্থাৎ?

—দু'দিন ওরফানে নিয়ে ঘুরলাম, দু'দিন হাত দেখার ভান করে হাতের তেলো নিলাম হাতে—আর ভালো লাগল না। আমার কথাগুলো খুব বড় বড় কথা মনে হবে তোর রজত, কিন্তু সত্যি তখন, মানে আমার যেটাই ও ঠিক বুঝতে পারল না। একটু থেমে অশোক বলল গল্পগুলো ও নাই।

—কিন্তু ওরে আর কতটুকু চেনা যায়?

এই ত, আমি মনে রজত কে বলে তোর সেই লিপিটে আর নেই। তা যদি মিনস ভাই, সে রকম করে চিনতে হলে,.....মানে চাই কি জানিস? 'ম', আনসফিসটিকেটেড্ ..... মানে, আমার ত রীতিমত ঈর্ষা করে, আমার সামনে বসে শাড়ি ব্লাউজ—ইত্যাদি পরে যে রং করা মেয়েটা কাটলেট চিবুচ্ছে তার থাকে হয়ত পারোক্সিয়া।

বাতাস এখন কি ঘাসের মধ্যে দিয়েও আঙুল চালাচ্ছে। এত সহজ। ত্রিনাট নতুন বড় হওয়া মেয়ে ফুচ্‌কা খাচ্ছে ওদের টলটলে ঠোঁটে, চুলের রিবনে খানিকটা খোঁপনের ছোঁয়া। সমস্ত সময়টা একটা বিবৃদ্ধপূর্ণ মেঘের মত ছেকে ছেকে কম্পিত। রজত কিছু বলল না, কি হবে বলে।—আমি তা ভেবে বলিনি। আমি তা আর ভাবি না। কিন্তু তা বিশ্বাস করলে না অশোক। যদি বা করে বুঝতে পারলে আমি কাকে ভেবে বলেছি। কার শরীর কার মুখ কার মন। মিনুর শরীরকে তুমি কোন ভাষায় অনুবাদ করতে পারো। সবচেয়ে আদিম ভাষা দিয়ে সবচেয়ে মহৎ ভাষা দিয়ে। মিনু তোমার পায়ে মুখ রেখে ঘুমোয়। কখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার বুকেও পা রাখে। তোমার ব্যস্ততা জামা নিয়ে গালে ঘষে মিনু তোমার গায়ের গন্ধ নেবে বলে। তুমি একা একা যখন অনেক কাপ চা খেয়ে অনেক সিগারেট টেনে বাড়ি আসো, মিনুর ঠোঁটে তোমার বুরুশ ঘুরুশ ঘুলো লেগে যায়। মিনুর জিভে তোমার গালের নোনতা ঘাম লেগে যায়। মিনু বলে, উঃ তোমার নিঃশ্বাস যেন চিলমনার ভাজা ধাওয়ার মত ঘুরুশো। আগুনের আর নিকোটিনের। তোমার নাকে ওর ছোট নাক রেখে নিঃশ্বাস নেয় মিনু বুকের সব তাপি সব তাপ শুষে নেবে বলে।

—একটা নতুন গল্প লিখেছি রজত।

—তাই নাকি, তা হলে ত—

—হ্যাঁ, ভারি আনন্দে আছি! শুনবি নাকি? না, এ আলোয় পড়া যাবে না, গল্পটা হোক নিজ, অদ্ভুত আক্রিকটা।

—আর গল্পটা?

—এরকম লিখতে পারছে না, আর কেন পারছে না তার কথা নানা রকম সৃষ্টি ছাড়া করছে।

—এই-ই গুট! ঘুউং ঘর সব। আরে বাবা তোরা যে আজকাল কি হলি, খালি আক্রিকের ব্যাপার—!

—রজত, তুই কি পাগল হয়েছিস? যা ভাবব তাই লিখব, তোর কথা শুনে লিখব? তুই বরং লেখ, তোর লেখা যত অখাদ্যই হোক না কেন পড়ব, কিন্তু সমালোচনা করিসনি। তোর সমালোচকের এই ভঙ্গিটা সত্যিই অসহ্য।

অশোক উঠে দাঁড়াল, অশোকের চোখ কি অদ্ভুত কালো। কপালের ওপর সাপের ফণার মত চুলগুলো বাতাসে দুলছে ও খাড়া নাকে লালিত চাঁদার মত যেন অন্য গ্রহের আলো। জীবন ওর সমস্ত রক্তের ভিতর নাচছে হাসিওয়ার হীরা পান্নায়। ওর যন্ত্রণার আগুনে কখনো সাদা পরিশীলিত স্নিগ্ধ, শুভ্র জ্যোতি, কখনো লাল প্রভাবিত উজ্জ্বল ঝলক যায়। আর মাথের ফাঁকগুলো ভরে যাচ্ছে ঘাসের ফসলে সৃষ্টির সুখ বাসনা ইচ্ছায়।

অশোক চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল রজত। এই পার্কে বসেই সে তার প্রথম গল্প ভেবেছিল 'মায়া' গগন ঠাকুরের ছবির মত প্রোটোপ্লাজম্ শহর। খুঁজতে খুঁজতে মনের সেই অদ্ভুত লিফটে নেমে নেমে আসা উঠে আসা। তুমি জলের দিকে চাও। তুমি ওপরে হাত রাখো, তুমি আকর্ণ জ্যা টানো, তুমি রঙিন মাছ দেখো, তুমি আঁশে না, পাখনায় না, কানকোয় না, চোখে চোখ রাখো, বেঁধো।

সে এক অপূর্ব আবর্তন। সেই লেখা, লেখা শেষ হলে অদ্ভুত সুখে যেন জল মুছে ফেলা।

সে সুখ অশোক পাচ্ছে, প্রদীপ পাচ্ছে, নীরোদ পাচ্ছে, রজত কি পাচ্ছে না? এত দ্বিধা কেন, যদি না পেত, বুঝতে পারত। যদি না পেত ও কি পাগল হয়ে যেত না, কিন্তু আজ ওর শুধু জানতে ইচ্ছে হল ও কি করে পাচ্ছে? কেন পাচ্ছে?

ইউনিভার্সিটির সেই মেয়েটি অশোকের সেই গল্প বুঝতে পারেনি। মিনুও পারেনি রজতের মাছ গল্পটা বুঝতে।

কিন্তু মিনুর সব কথাই কি রজত বুঝতে পারে। মিনু কেন লাল গলির মুখে রাত্রি দশটার পর কবাট সরিয়ে বসে থাকে! মিনুর সামনে বিছানো সরু গলির ঢোকো ঢোকো তেলতেলে ইটে আলো কমে আসে। দেওয়ালে গাছের আলো মিনুর চোখের সামনে সবুজ তারা তৈরি করে, মুচির দোকানের পাশ দিয়ে সাদা বেড়ালটা রাতের খাওয়া খাবার জন্য বেরিয়ে এসে কাজের বাড়ি ঢুকে যায়।

তখন রজত ফিরে এলে কেন মিনু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না, কেন মিনুর চোখের জল চিক্ চিক্ করে। মিনু যেন কখনো দেখেনি ওকে অমনি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে।

—মনে হচ্ছিল যেন তুমি আর আসবে না?

—কেন আসবো না মিনু? এই তো টিউশনি।

—আমি যে কি সব ভাবি।

—কি ভাবো?

মিনু বলতেই পারে না। রজতের মনে হয় সে কিছুটা যেন বুঝতে পারে। সমস্ত আমাকে মিনু বুঝতে পারে না। আমার

মনে এমন অনেক ঘর আছে যেখানে মিনুর কোনদিন যাওয়া হবে না। মিনুর মনেও এমন ঘর আছে। সে-সব ঘরে আর যেতে ইচ্ছে করে না। নিজের মনের স্মৃতির ঘরেও আমার ছোটবেলায়, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি। বিষম ভয় পেয়েছি। কেউ নেই ঘরে, মা আমি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নামছি। যেখানে এসে থামলাম সেখানে ছোটমাসি তার মাস্টারের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দুজনে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে। আমি ছোট মাসির আঁচল ধরে ধরে যাচ্ছি। ছোট মাসি খাটের দিকে যাচ্ছে। লোকটার ছোট মাসির, কিন্তু আমি কী নির্বিঘ্নে তার বালিশে ছড়ানো চুলগুলো নিয়ে খেলা করছি। কিন্তু সেই স্মৃতি সারা শৈশব, সারা কৈশোর আমায় তাড়া করেছে। যৌবনে ওপর তলার পাঞ্জাবী মেয়েটাকে আমি কল্পনায় ছোট মাসির মত বালিশে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু কেন নির্বিঘ্নে তার চুল নিয়ে, শুধু চুল নিয়েও খেলা করতে পারিনি। মিনু আমাকে সেই যন্ত্রণা থেকে কি মুক্তি দিতে পেরেছে? আমি আর লিখতে পারছি না।

অ্যাসট্রেতে সিগারেট পিষে পিষে আমার বন্ধুরা রায় দিয়েছে।

রঞ্জত মাথা নিচু করেছিল। কখনো মাথা তুলে ও ছিল। কখনো দিশেহারা হয়ে বেরোচ্ছিল; যেন কনসালটিং ফিজিসিয়ানস। রঞ্জতের ডাক্তারী রিপোর্ট পড়ে ওরা রায় দিচ্ছে: No hope of issue, pure case of···। অশোক যখন রঞ্জতকে নিয়ে লিখেছে তখন রঞ্জতের ফটোটাও ও জিজ্ঞেস করতে পারত? আসলে ও ভেবেছে রঞ্জতের মনে কোন কষ্ট হয় না। একথাটা ও আগে ভাবেনি, এখন ভাবছে। ওর সামনে একটা অদ্ভুত চরিত্র। এখন যতটা আছে ততটা হল একটা লোক আধখানা ঘরে শুয়ে আছে। লোকটা দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ভাবছে কেউ বুঝতে পারছে না। কিন্তু তা সত্যিই না। সবাই বুঝতে পারছে লোকটা আধখানা মরে গেছে, তাই অন্য আধখানাকে কেউ সম্মান করছে না। এই ত বেশ ভাবতে পারল রঞ্জত, কোথাও ঢ কেউ ফেল না।

টবের মত উঠে দাঁড়াল রঞ্জত। ভাবার পরই লিখল না। তার বদলে মিনুর কথা ভাবল।

মিনুকে সে কি করে? ভালোবাসে না ঘৃণা করে। তার একভাগ তাকে ভালোবাসে। আর অন্যভাগ তাকে ঘৃণা করে। সুখ কি, আনন্দ কি, ঘৃণা কি? আমি, আবার সেই একটা কাচ কথা কাচের ডিসের মত মাটিতে পড়ে তার প্রাণ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রত্যেকটা টুকরো আলাদা আলাদা। একজন ভালোবাসা, একজন সুখ, একজন ঘৃণা, একজন করুণা, বাসনা, ইচ্ছা, মুখ ধারা— সে ভুলে নিচ্ছে। প্রতিটি টুকরো সাজাচ্ছে। সাজিয়ে সাজিয়ে পুরো ডিসটাকে তৈরি করে ফেলল। তার সব টুকরোগুলো শুকিয়ে গেল। এখন কে বুঝবে তোমার ভালোবাসা, তোমার ইচ্ছা, তোমার ঘৃণা করুণা।

রঞ্জত চিত্রার্পিতের মত হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল। নীলাকাশ নেই; ওরাইড অফ রঞ্জত নেই।

তুমি একটা বাড়ি চালাবে রঞ্জত? শেফার হাতে তুলিয়া যাচ্ছে আসছে। ওইখানে ওই ঘন কাচ লাগানো বড় বড় জানালা দেয়া অপারেশন থিয়েটারের ওপাশে টেবিলে তোমার মিনু শুয়ে আছে। তোমার মিনুর ব্লাড প্রেশার এখন দুশো পঞ্চাশ। তাকে যখন শেফারে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই ডাক্তারের রুমালের স্যাভলন পরা আঙুলে তুমি রক্ত দেখেছিলে। মিনুর ব্লাউজের বোতাম এখন নার্সরা খুলে দিয়েছে, মিনুর বুকের কালো তিলটার চারপাশে নীল শিরাগুলো দড়ির মতো হয়ে আছে। আমি কিছুতেই অজ্ঞান হব না·····যেমন রঞ্জতের কানের কাছে গুনগুন করে মিনু বলত— তেমনি কি এখনো বলছে·····

—কেন মিনু অজ্ঞানই তো ভালো— শুনেছি বড় কষ্ট হয়।

—হ্যাঁ হয়তো এত বেশী কষ্ট যে তা আর টের পাওয়া যায় না। আমি একটু একটু করে সেই কষ্টকে—

মিনু সেই যন্ত্রণাকে উপভোগ করতে চায়। রঞ্জতের একটুও কষ্ট হল না মনের মধ্যে সে মিনুকে তৈরি করতে। ওই আলোর তলায় ঐ টেবিলে মিনু তার সমস্তের মধ্যে শুয়ে আছে। মিনুর এখন অসহ্য সুখ। কলকে কলকে রক্ত আসছে মিনুর সমস্ত মুখ লাল। ওর চোখ দিয়ে, ওর কান দিয়ে, ওর মুখ দিয়ে যেন রক্ত পড়ছে। মিনু জানালা দিয়ে অন্ধকারে চাইছে। মিনু ভাবছে এখনো দুজনে দুজনকে হাওয়া দিয়ে ঘুরে আছে···তোমার, তোমার আর আমার, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে মিনু—ফেলে আসছে।

রঞ্জতকে কি অসহায় খুঁজছে? আমাকে কি খুঁজছে?

রক্তের ফোয়ারার মধ্যে ভেসে উঠল হাটের মধ্যে ভাঁড় করে রাখা মুখ। সাদা এতটুকু রক্ত চর।

মিনু যখন স্কুলে ছিল আর পাশাপাশি উপেন্দ্র হাওয়ার এলোমেলো রক্ত বলাকা তার তলার সেই সবুজ বাটির দিকে কারো চোখ পড়েনি। এতদিন পরে পড়ল। মিনুর চুল উঠতে লাগল, হাত-পা কাঠি হল। সেই সবুজ বাটিটা বড় হতে লাগল। পাশাপাশি করে পড়া দুমড়ো ফুলে রঞ্জত অবাক হয়ে দেখছে। তারপর ফাটা পুরে এলে বোটায় কি টেনটনে বেদনা। বোটার ডগায় পোকা ফল খুঁজছে! তারপর আপনি খসে যাওয়া। আস্তে আস্তে মিনুর নাড়িটা কেটে দিল। মিনুরা আলাদা হল। সুতো নাড়িগুলো যেন আরো বেশি জোড়া আছে। ওর প্রতি রোমে রোমে মিনুর একটি করে নাড়ি।

ঘোড় ছাড়াবার সময় যেমন সার সার সুতো বাঁটি ছাড়তে চায় না। আঠার মতো,

বড় লম্বা হয়, যতদূরে নিয়ে যাও ততদূরে। মিনু জিজ্ঞাসা করতে রঞ্জন স্পষ্ট শুনতে পেল ওর শুকনো নাড়ির ভেতো মিনু জিজ্ঞাসা করছে কি হল, বাবু, কি?

ঝুরো ঝুরো বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার ধারে বকুল গাছের তলায় রঞ্জন একলা দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পাঁচের ওপর জল। তার হড়হড়ে পিঠের ওপর দিয়ে হু হু করে বাসগুলো চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সির পেছনে লাল আলো জ্বেলে গোলা সিঁদুরের মত রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। মিনুর মাথা শরীরে ঘাম। বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিন্দুগুলো বড় বড় হয়ে ফোঁটা ফোঁটা হচ্ছে। স্বর ওঠে।

মিনু এখন এত সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে যে, আর স্বপ্নও দেখছে না।

একটা বাড়ি রাখবে রঞ্জন?

রঞ্জনের বাঁ চোখটা ডান ভ্রূর দিকে চেয়ে চোখ টিপল।

রঞ্জনের বাঁ দিকের ঠোঁটটা কোথা বেঁকিয়ে হাসছে—কেউ জানবে না। রঞ্জনের বাঁ পা-টা ডান পা তে আলগা করে দিয়ে ভর রাখলো।

—এই ত এত কথা ভাবলে, এত কথা লেখলে, লেখ না, আজ রাত্তির ছাড়াই লিখে ফেল না।

রঞ্জনের সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। আর প্রতিটি টুকরো আলাদা আলাদা অন্য জন্য বেগে নড়ছে। এই বুঝি আলাদা হয়ে যাবে! খসে পড়বে, খসে পড়বে সমস্ত। রঞ্জন তখন হাঁটতে আরম্ভ করেছে। পালাতে আরম্ভ করেছে। মুহূর্তে তার বাড়ির বাড়িটা ভেঙে পড়ে সে চলতে আরম্ভ করেছে। এই আমার পায়। আমি তৃপ্তি, আমি বাঁচি। মিনু তুমি তোমার সব। মিনু তোমায় আমি ভালোবাসি। আমায় ছেড়ে তুমি যেও না। আমার পায় ভর দাও। আমার প্রতিটি টুকরো গলে এই। আমার গলে সেই পাত্র ধীরে ধীরে মিশে গেছে।

কেউ জানে না, কেউ দেখতে পায় না যখন মিনু আর আমি এক থালায় মাথা রেখে শুয়ে থাকি, তখন যে গ্যাসের সবুজ আলো মিনুর নাকেমাথায় পড়ে, সেই গ্যাসের মান্টেল নেই। একদম পুড়ে গেছে। সেই ঘাতের আকারে গ্যাসের সবুজ আলোকটুকু শুধু জ্বলে যায়, সারা রাত জ্বলে যায়। কত নির্জনে, কত নিভৃতে গরম জলে ফেলবার ঠিক আগেই যেন জানতে পেরে খুব চালাক, একটা গুটি পোকার মত আমি মিনুর মধ্যে উড়ে গেছি।

বাঁকুড়া টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২১)

৪৩, সুভাষ রোড, বাঁকুড়া-৭২২ ১০১

ফোন : বাঁকুড়া—২৪৫

বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে আকর্ষণীয় সুদের হার সর্বোচ্চ ২১.২২%

- সহজ শর্তে লকার ভাড়ার ব্যবস্থা
- সরল সুদে 'গহনা' জামিনে ঋণের সুযোগ
- আমানত বীমা কর্তৃক সুরক্ষিত।

সাধারণ মানুষের সেবা ও আর্থিক সহায়তায় অম্বিতীয় এই বৃহত্তম সমবায় ব্যাঙ্ক এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শ্রীরতনলাল বরাট
সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস বসু
ম্যানেজার

শ্রীসুভাষ রঞ্জন কর্মকার
সম্পাদক

"আশ্বিনে বেণু বাজিল ওপারে বনের ছায়ে"

পুজো তো এসে গেল। কী ভাবছেন? বাইরে বেড়াতে যাবেন?—

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দূরপাল্লা রুটের বাসে আরামে ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন। আমাদের বাসে গ্রামবাংলা ও বাইরবাংলার বিভিন্নস্থানে পুজোর ছুটি কাটিয়ে আসুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তায় ব্রতী—

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

টিকিট প্রাপ্তিস্থান:
দূরপাল্লার বাস স্টেশন
এসপ্লানেড—ফোন নং: ২৮-১১১৬
দীঘা বুকিং অফিস
ফোন নং: দীঘা-১৫

মনে রাখবেন বিনা টিকিটে ভ্রমণ আইনতঃ দণ্ডনীয়। টিকিট কাটার দায়িত্ব আপনার।

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য
একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান

ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারি সংস্থা)

২৩বি, নেতাজি সুভাষ রোড (৪র্থ তল)

কলিকাতা-৭০০ ০০১

চাষীভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্টমানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয় :

ক) এইচ এম টি মহিন্দ্রা এসকর্টস মিংসুবিশি ট্রাক্টরস।

খ) কুবোটা মিংসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।

গ) 'সুজলা' ও অন্যান্য ডিজেল পাম্পসেট্।

ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের। তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগতমানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২০১৬/১১) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস :

২৪-পরগনা (দক্ষিণ) : ১৯, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮

২৪-পরগনা (উত্তর) : ৪২ই, কে এন সি রোড, বারাসাত

হুগলি : সাহাগঞ্জ রোড, তারকেশ্বর আরামবাগ, সুরেশ্বরা

বর্ধমান : সবর ঘাট রোড, জি টি রোড মেমারি, বর্ধমান, ১, বি সি রায় রোড, চুঁচুড়া

বাঁকুড়া : লালবাজার, বাঁকুড়া স্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর

মেদিনীপুর (ওয়েস্ট) : সুভাষ নগর, মেদিনীপুর

মেদিনীপুর (ইস্ট) : পাঁশকুড়া রেলওয়ে স্টেশন, পোঃ-পাঁশকুড়া

বীরভূম : সিউড়ি

মালদা : মনস্কামনা রোড, মালদা

মুর্শিদাবাদ : ১৬, শহীদ সুর্য সেন স্ট্রিট, বহরমপুর

জলপাইগুড়ি : 'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি

দার্জিলিং : বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

কোচবিহার : এন এন রোড, কোচবিহার, দিনহাটা

পুরুলিয়া : নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া

নদীয়া : ১/১, এম এম ঘোষ স্ট্রিট কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সভ্যতার রোগ

সাধনানন্দ মণ্ডল

রোগ হয় না এমন কোনো প্রাণী দুনিয়ায় নেই; রোগ প্রাণী জগতের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষও একটি প্রাণী—সেজন্য তার জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। মানুষ এক বিশেষ ধরনের সামাজিক প্রাণী—এমন সামাজিক জীবন আর কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। নানারকম সামাজিক ঘটনার মধ্যে তার জীবনে অনেক। এইসব ঘটনা তার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে; ফলে তার মৌলিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং "রোগ শুধুমাত্র একটি জৈবিক ঘটনা"—এমন কথা মানুষের ক্ষেত্রে বলার উপায় নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে দিন কে দিন; আবার সেইসঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষের জলস্বাস্থ্যের জ্ঞান। ফলে বহু রোগ মানুষ আজ দমন করতে পারে। বক্সা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতির মতো মহামারীতে সারা বিশ্বে এক সময় প্রচুর লোক মারা যেতো; কিন্তু এখন এসব রোগে মৃত্যুর হার খুবই কম। নিঃসন্দেহে এসব আমাদের সভ্যতার শুভ ফল। কিন্তু আমার অশুভ দিকও আছে। বস্তুনির্ভর আধুনিক জীবন-যাত্রা এবং শিল্পায়নের দরুণ মানুষের বেশ কিছু রোগের প্রকোপ সম্প্রতি বেড়ে গেছে। শিল্পবিপ্লবের আগে যে-সব রোগের কোন অস্তিত্বই ছিল না, কিংবা থাকলেও খুবই সীমাবদ্ধ ছিল সে-সব রোগ এখন দুনিয়া জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব রোগ আজ অতি পরিচিত এবং ইতিমধ্যেই 'সভ্যতার রোগ' হিসেবে বিশেষ খেতাব অর্জন করেছে।

মানুষ ও অন্যান্য অনেক প্রাণীর শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য থাকলেও বিস্তর তফাৎ রয়েছে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে; এই রকমের তফাৎ তাদের রোগের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের শারীরবৃত্তের সঙ্গে সব থেকে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে শিম্পাঞ্জী, বেবুন, হনুমান, বাঁদর প্রভৃতির। এদের এবং মানুষের সমপর্যায়ের রোগের তুলনা করলে সেগুলোর উৎপত্তি, লক্ষণ, বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য চোখে পড়ে। যদিও মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন, সেপটিক আলসার, টিউমার এবং আরো অন্যান্য রোগের একই নামকরণ করা হয়ে থাকে, তবুও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব রোগের স্বরূপ এক নয়। সত্যি কথা বলতে কী মানুষের অনেক রোগ প্রাণীদের প্রায় হয়-ই না; যেমন বহুমূত্র, হাঁপানী, ব্রংকোকার্সিনোমা ইনফারক্শন। আর বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে কোন কোন বিজ্ঞানী যদিও-বা দাবি করেছেন যে প্রাণীদের মধ্যে তাঁরা এইসব রোগের হদিস পেয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু জানিয়েছেন স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাণীরা এসব রোগে আক্রান্ত হয় না। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে আংশিক কিছু রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু এইসব রোগ পুরোপুরি কখনোই সৃষ্টি করানো যায় না। জীববিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন এ বিষয়ে; অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ-ও যথেষ্ট হয়েছে। এখন তো তাঁরা একমত যে, মানুষের কোন রোগই প্রাণীদের শরীরে হুবহু সৃষ্টি করানো সম্ভব নয়—বড় জোর আংশিক কিছু রোগ লক্ষণ এবং বিকৃতির প্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। পরিবেশ স্বাভাবিক ও কঠোর না হলে মানুষের মারাত্মক এবং ভয়াবহ রোগগুলি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। হাইপারটেনশন এমনই একটি ভয়ংকর রোগ; অত্যধিক উত্তেজনা বা বিরক্তি কিংবা মানসিক চাপজন্য ছাড়া প্রাণীদের মধ্যে এই রোগ হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাণীরা এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গবেষণাগারে খাঁচায় রাখা বেবুন 'হস্পিটির' সঙ্গী বা সঙ্গিনীটিকে তারই চোখের সামনে আলাদা একটি খাঁচায় অন্য বেবুনের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। এর ফলে নিঃসঙ্গ বেবুনটির মধ্যে হাইপারটেনশন রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। তবে সেগুলো মানুষের রোগলক্ষণের মত দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়নি এবং বিশেষ কোন ফলাফল ছাড়াই তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে সেই নিঃসঙ্গ বেবুনটির স্বাভাবিক অবস্থা এবং আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে শিম্পাঞ্জী, বাঁদর, বেবুন, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস প্রভৃতি মারোকারডিয়াল ইনফারক্শন রোগে আক্রান্ত হয় না। মানুষ ও প্রাণীদের ক্ষেত্রে আথেরোস্ক্লেরোসিস রোগের তুলনা করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য গবেষকদের নজরে এসেছে। প্রাণীদের মধ্যে পাকস্থলী কিংবা গ্রহণীর ক্ষত, স্পনডেলিসিস, অস্টেট গ্রাণ্ডের অর্টাইটিস, অর্শ, হাইড্রোসিল এবং কিডনীর রোগ অত্যন্ত বিরল। গবেষকরা শত চেষ্টা করেও কোন প্রাণীকে পেটে ঘা, এপ্যাণ্ডিসাইটিস কিংবা সেপটিক আলসার রোগে আক্রান্ত করাতে পারেন নি। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে পরিমাণে ক্যান্সার হয়, প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সে পরিমাণে এই রোগ হয় না—বরং বলা যেতে পারে প্রাণীদের মধ্যে এই রোগ অনেক কম। সন্তানের জন্মের বেলাতেও মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। অ্যানিমিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্যান্সার কিডনীর প্রভৃতির মতো রোগগুলিকে প্রাণীদের হুবহু সৃষ্টি করার কোন উপায় বিজ্ঞানীদের জানা নেই। বক্সা এবং ব্রুসেলোসিস রোগ যদিও মানুষ ও প্রাণী উভয়েরই হয়, তবুও কিন্তু তুলনামূলক বিচারে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি চোখে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কেন এত

রোগপ্রবণ হয়ে পড়েছে? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মানুষ তার সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে; অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপ থেকে সে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করেছে। আর এই মুক্তিই তার রোগবন্ধনের অন্যতম প্রধান কারণ।

যে-কোন প্রাণীর প্রায় সব বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জিন দ্বারা নির্ধারিত হয়। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও প্রাণীর একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এটিও সর্বসাধুলো জিন দ্বারা নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা লোপ পেতে বসেছে; এর কারণ বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে। তাঁরা বলছেন, মানুষের যেসব কিছু জিনের স্বাভাবিক কার্যকর্ম অবদমিত হওয়ার ফলে হয় সেগুলি দুর্বল, আর না হয় অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতিকালের ভয়ের 'এইডস্' রোগ যদিও একটি ভাইরাস-ঘটিত রোগ, তবুও এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্রুত অবনতি।

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের বিশেষ ধরনের বিবর্তন পদ্ধতির জন্যই তার যেসব কিছু জিনের স্বাভাবিক কার্যকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য প্রাণী প্রজাতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে জৈবিক বিবর্তনই শেষ কথা; মানুষের ক্ষেত্রে তা কিন্তু নয়। তার বিবর্তনে জৈবিক বিবর্তন ছাড়াও রয়েছে সামাজিক, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং এটিই মনুষ্য-প্রজাতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃতাত্ত্বিকদের মতে পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে, আজ থেকে মোটামুটি দশ হাজার বছর আগে। এঁরা প্রমাণ করেছেন যে সে-যুগের মানুষের সাথে আজকের মানুষের জৈবিক দিক থেকে কোন তফাৎ নেই; কিন্তু আসমান-জমিন ফারাক হয়েছে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে। এই ফারাক অবশ্যই সভ্যতা ও সংস্কৃতির—আজকের মানুষ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার এবং সে-যুগের মানুষের জীবন-যাত্রার মধ্যে কোন তুলনাই চলে না।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জৈবিক বিবর্তন সংঘটিত হয়। মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তন তার প্রাকৃতিক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে। ফলে সাংস্কৃতিক বিবর্তন জৈবিক বিবর্তনকে প্রভাবিত তো করেছেই, বরং বলা যেতে পারে অতিক্রমও করে গেছে। এর পরিণামে বহু রোগ মানুষের জীবনে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অন্যান্য জনপ্রাণীর তুলনায় একমাত্র মানুষেই বিভিন্ন ধরনের এবং মারাত্মক ধরনের টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়।

বিবর্তনের স্বাভাবিক পদ্ধতি থেকে সরে গেলে যে-কোন প্রাণীর জীবনে রোগের প্রকৃতি এবং রোগপ্রবণতার পরিবর্তন ঘটে। গৃহপালিত প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করলে ব্যাপারটি বেশ বোঝা যায়। দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরিয়ে নিয়ে 'কৃত্রিম নির্বাচন পদ্ধতি' গ্রহণ করার ফলে গৃহপালিত প্রাণীরা অতিমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন দেখা যায় গৃহপালিত প্রাণীরা যত বেশি সংখ্যায় এবং যে পরিমাণে টিউমার ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয় এদের বন্য আত্মীয়রা কিন্তু সেভাবে হয় না। প্রসব বেদনা জনপ্রাণীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষ এবং গৃহপালিত প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বেদনা কখনও কখনও অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়; অসহ্য বেদনা অনুভূত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়; প্রসব করতে গিয়ে অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে, কিংবা অস্বাভাবিক প্রসবের ফলে পরবর্তী-কালে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়। শরীর সুস্থ রাখার তাগিদে শুধুমাত্র মানুষকেই আলাদাভাবে ব্যায়াম বা খেলাধুলো করতে হয়। বন্য প্রাণীদের এসব দরকার নেই—তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গেই এসব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেজন্য পেশি ও স্নায়ুর রোগ বন্যপ্রাণীদের হয় না।

গৃহপালিত করতে গিয়ে মানুষ বন্যপ্রাণী-গুলিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনেছে; প্রয়োগ করেছে কৃত্রিম নির্বাচন পদ্ধতি। মানুষ নিজের স্বার্থে এইসব প্রাণীর মধ্যে তার পছন্দমতো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে, আর সেইসঙ্গে বাদ দিয়েছে তাদের বেশ কিছু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—যেগুলি মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় কিংবা অবাঞ্ছিত মনে হলেও প্রাণীগুলির জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই রকম রোগ-বিরোগের সামগ্রিক ফল হিসেবে প্রাণীগুলি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা রোগপ্রবণ হয়ে পড়েছে, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধ্যা হয়েই ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। মানুষ তার নিজের ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্বাভাবিক ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সাময়িক লাভ এবং তাৎক্ষণিক সুখের আশায় নিজের জীবনে অনেক কিছু কৃত্রিমতা আরোপ করেছে। এর পরিণাম কিন্তু আদৌ শুভ হয় নি।

মানুষের রোগে তার মনের দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ রক্ষা এবং তার শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিগুলির নিয়ন্ত্রণ এই তন্ত্রের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সেজন্য সামাজিক ঘটনা এবং সঙ্গে মানুষের শরীর ও মনকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই শুধু মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই নয়, শারীরিক রোগের ক্ষেত্রেও তার মানসিক অবস্থা বিশেষভাবে দায়ী। ক্যান্সার রোগও মানসিক কারণে ঘটতে পারে—এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন; অন্তত স্তনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তো এঁদের বেশির ভাগই

একমত। দেখা যাচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ যত বাড়ছে তত বাড়ছে মেয়েদের মানসিক চাপ, আর সেইসঙ্গে বেড়ে চলেছে এই রোগ। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ইত্যাদি মানুষের সামগ্রিক সমাজজীবনের এক একটি জঞ্জাল—সব মিলিয়েই মানুষের সমাজ ও সংসার। এইসব সামাজিক পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা মানুষের বহু জটিল ও মারাত্মক রোগের কারণ।

আজকের সমাজ ও সভ্যতার চাকচিক্য এবং আড়ম্বরের কোন সীমা নেই। কিন্তু এসবই নিতান্ত বাহ্যিক—ভেতরে কিছুই নেই, একেবারে ফাঁপা। প্রতিমুহূর্তে নির্মম, প্রবল এবং অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতায় মানুষ আজ বাতিব্যস্ত এবং ক্লান্ত। অসহ্য এবং হৃদয়হীন এক পরিস্থিতির চাপে তার স্বাভাবিক ও সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি হয় বিকৃত, আর না হয় নিহত হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক—এর ফলে তার মনে জন্ম নিচ্ছে হতাশা, বিরক্তি এবং অবশেষে বিচ্ছিন্নতা-বোধ। পরিণামে বাড়ছে ভয়ংকর মানসিক চাপ, আর তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মানসিক রোগ। সামাজিক কারণে মানুষের মানসিক রোগ যে কী পরিমাণে বেড়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

যদিও মানুষের বহু মারাত্মক ও জটিল রোগ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান, তবু রোগমুক্তির উপায় হিসেবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করার কথা ভাবা যায় না। কারণ এই দুটিকে বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না—তাকে নেমে যেতে হবে পশুর পর্যায়ে—যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে থাকতেই হবে এবং সেজন্য অনিবার্য কারণেই পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনও ঘটবে। এর ফলে মানুষের সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকা এবং সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানে ব্যর্থ তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

আধুনিক জীববিজ্ঞান জানিয়ে দিয়েছে যে, বিবর্তনের ধারায় উন্নতধরনের শারীরিক পরিবর্তন কিংবা উন্নতি মানুষের আর ঘটবে না। দেখা গেছে উন্নত প্রাণীদের বিবর্তনে একটি বিশেষ অঙ্গ বিশিষ্টরূপে বিবর্তিত হয়ে প্রজাতিটির বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাখির ক্ষেত্রে ডানার, ঘোড়ার ক্ষেত্রে পায়ের, হাতির ক্ষেত্রে শুঁড়ের বিবর্তন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমন মানুষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তার মস্তিষ্কের বিবর্তন। সে কারণে মানুষের সামনে নিত্যনতুন যে-সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সে-সব সমস্যার মোকাবিলা তাকে তার মস্তিষ্কের জোরেই করতে হবে এবং সেজন্য মস্তিষ্কের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রতি প্রবণতই পড়বে।

তাহলে এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন এটাই যে, এত চাপ মানুষের মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারবে কি না। এর উত্তরে অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের নিরাশ করেন নি। এঁরা জানাচ্ছেন যে, নতুন ক্ষমতা আহরণ করা মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব কোন কাজ নয়। তার মস্তিষ্ক কোটি কোটি স্নায়ুকোষ নিয়ে তৈরি হয়েছে—কিন্তু বর্তমানে সেগুলির মাত্র চার শতাংশ সে কাজে লাগাতে পারে; বিপুল সংখ্যক স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কে অব্যবহৃত হয়ে রয়েছে—এগুলিকে কাজে লাগানোর কোন পদ্ধতি আজও মানুষের জানা নেই। বিজ্ঞানীদের মতে ওইসব স্নায়ুকোষকে ব্যবহার করার উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারলেই মনোবিদ আসান হবে।

অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও প্রকৃতির অংশ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন; তাহলেও কিন্তু তার আত্মনিয়ন্ত্রণের এক বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। একথাও সত্যি যে, মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য—যেমন স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের বাসনা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, বাস্তব ও আবেগ এবং মত ও আদর্শকে বাস্তবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমানের সমাজ ও সভ্যতার মানুষকে প্রতিমুহূর্তে সেই নিষ্ঠুর পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে। মানুষের সামনে আজ এক চূড়ান্ত 'সভ্যতার সংকট'। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ না পেলে মানুষের পক্ষে সুস্থ জীবন লাভ অসম্ভব। সেজন্য রোগ মুক্তির উপায় হিসেবে শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিই যথেষ্ট নয়—তার থেকেও বেশি প্রয়োজন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ ও সভ্যতার। সভ্যতার জোরেই মানুষ অন্য প্রাণীর জীবন থেকে মানুষের জীবনে পরাবর্তন করেছে; এখানেই কিন্তু যাত্রার শেষ নয়। তাকে আরো এগিয়ে মানুষ থেকে হতে হবে মানব; কারণ তার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো সে নিজেই ধার্য করেছে বহু আগেই:

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ভবেৎ॥"

'ভাণ্ডার' রাজ্যান্তরে প্রকাশিত সমবায়মূলক একটি মাসিক পত্রিকা

With Best Wishes From :

★

CALCUTTA TRAMWAYS E. C. C. S. LIMITED

12, R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-700 001

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ :

পানুহাট তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

পানুহাট. জেলা : বর্ধমান

আমরা গামছা, ধুতি, ৬০' × ৪০' সাদাশাড়ি, টাওয়াল এবং রঙতা শাড়ি, ধুতি উৎপাদন করি

আমাদের বিক্রয় কেন্দ্র :

পলাশীপাড়া, নদীয়া. (নূতন বাজার)

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ :

নন্দগ্রাম তসরিনি তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

Regd. No.—15 DHT & ADR of 1982.

১০০ × ১০০ টাওয়াল, সিল্ক টাওয়াল, ৮০ × ৮০, ৬০ × ৯০ সুতার শাড়ি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

পোঃ বাত্রীগ্রাম ★ জেলা : বর্ধমান

হেড অফিস : **মালতিপুর মোড়**

আশুতোষ ধলাক	**নবকুমার ভট্টাচার্য**	**শান্তি বাড়া**
সভাপতি	একাউন্টেন্ট	সম্পাদক

শারদীয়া অভিনন্দন জানাই :

পুরুলিয়া বিড়ি কারিগর কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড

রেজিঃ নং—৩০ পি

চক্রধরপুর ★ পুরুলিয়া

★ আমাদের কলা বিড়ি এবং নিউ সাথী সিগারেট পানে আপনাকে ধূমপানে তৃপ্তি দিবে।

★ বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে ভালো এবং পাইকারি বিড়ি বিক্রয় করে আমরা বহুদিন সুনাম অর্জন করে আসছি।

★ ধূমপায়ী ভাইদের কাছে অনুরোধ আমাদের সমবায়ের তৈরি বিড়ি ধূমপান করে সমবায়কে শক্তিশালী করুন।

শ্রীবুদ্ধেশ্বর বর্মন
ম্যানেজার

শ্রীমহেন্দ্র বাস্কে
সভাপতি

ENJOY
Holiday Home at Puri
Swargadwar

THE CALCUTTA UNIVERSITY CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED

Dharbhanga Building, Calcutta-73
Ph. 32-6596

With best compliments from

Calcutta Improvement Trust Co-operative Credit Society Limited

P-16, India Exchange Place Extention
Calcutta-73 • Telephone 26-6430

With best wishes from

Bankura Wholesale Consumers Co-operative Society Limited

MACHANTALA, BANKURA

বাঁকুড়া জেলার চাষীভাইদের সেবায়
একমাত্র প্রাচীনতম সমবায়
ঋণদানাদি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান—

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—রামপুর মনোহরতলা, বাঁকুড়া।
শাখা অফিস—মেঝিয়া পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

সভাপতি—শ্রীসত্যনারায়ণ মিত্র

পুরুলিয়াবাসীর সেবায়
কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িসম্পদ সৃষ্টি এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য
সরকারি সাহায্যপুষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহে প্রতিষ্ঠান—

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পুরুলিয়া শাখা
পোস্ট ও জিলা : পুরুলিয়া

উপশাখা—বলরামপুর, পোস্ট : বাজাডি
সাব অফিস—কাশদা, পোস্ট : কাশদা
ক্যাম্প অফিস—রঘুনাথপুর, পোস্ট : রঘুনাথপুর।

বিশদ বিবরণের জন্য এলাকায় সুপারভাইজার অথবা ব্যাঙ্কের কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

শ্রীবিবেকানন্দ মিত্র
সভাপতি

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ :

ঘোষহাট তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

গ্রাম : ঘোষহাট, পো: : কাটোয়া, জেলা : বর্ধমান

আমরা উৎপাদন করে থাকি জনতা ধুতি, শাড়ি ও সাধারণ মানের
৪০″×৬০″ ও ৬০″×৬০″ কাপড়।

নীরনের হনিমুন

দীপালি ঘোষ

সকাল ছ'টায় কেয়া ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় এসেই দেখতে পেল ডানহাতি চওড়া বারান্দার একটা মস্ত হোল্ডল পাতা রয়েছে। ও অবাক হয়ে ভাবল ছোট দেওর তো এখনো ঘুমে। সে কোত্থি ঘর থেকে বেরোবে কি করে। হোল্ডলটা ওর বরজা প্রান্তলে পাতা হয়েছে। শাশুড়ির কাছেই কেয়া জানতে পারল ওটা তাদেরই দেনা এবং তিনিই দেওয়েছেন। কেয়ার মনে পড়ল প্রায় সাথে সাতটায় তালা, অর্থাৎ সে ও তার স্বামী নীরেন বাইরে যাচ্ছে। তাদের বিয়ে কয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

কেয়া ভাবল, সকাল ছ'টা থেকে হোল্ডল বাঁধার প্রয়োজন কেন? যাওয়া তো সেই সন্ধেতে। তাছাড়া শাশুড়ি হোল্ডল বাঁধবেন দুশাটা কল্পনা করতেই ওর বিষয়টা অস্বস্তি হল। কোন বড় রকমের কেয়াতে সাওয়া কেয়ার জীবনে এই প্রথম নয়। ও বাক্স-সোটরা নিজেই গোছাতে জানে এবং হোল্ডল বাঁধতেও বেশ পটু। ও ভাবতে লাগল একটা বিছানা বাঁধতে কত সময় ওর লাগতে পারে, এবং বারো ঘণ্টা অতীতে কখনও লেগেছিল কিনা, কিন্তু তেমন কোন স্মৃতি মনে পড়ল না।

কেয়া ভাবল হোল্ডলটা দেওরের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে থেকে একটু সরিয়ে রেখা উচিত। কেয়া সরাতে গেল, শাশুড়ি কোথায় যেন ছিলেন, ছুটে এলেন। বললেন, ওটা যেমন আছে থাক, ছোট ঠিক ডিঙিয়ে যাবে। কেয়া আমতা আমতা করে বলতে গেল, এত সকালে ওটা পেতে কি হবে? একটু বেলায় গুছিয়ে দেবখন। স্নেহময়ী বললেন, তুমি চলে-যাওয়া কর, আমি এদিকটা দেখছি। বেলা দশটায় কেয়া দেখল মাটিতে পাতা বেডিং-এর দেহটা অনেকটা ভারি হয়েছে। তোষক-বালিশ ছাড়া দুটো বড় পাতলা চাদর দিলেন শাশুড়ি, এখন যদিও বসন্তের শেষ, তবু বলা তো যায় না পথে-ঘাটে যদি শীত করে নীরনের। একটি স্বাস্থ্যবান বুকের হঠাৎ বসন্তের শেষ শরতে শীত করবে কেন কেয়া ভেবে পেল না। সে কারণেই অবশ্য বোধ বাড়তিটা ওর যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। মুখে কিন্তু বলল না অবশ্য। একটু বাদে এসে দেখে দুটি পাঁচশো গ্রামের খালি টিনের কৌটো হোল্ডলের দুধারে বালিশের ধারে বেশ কসরৎ করে চোকানো শাশুড়ি। জানা গেল ওর একটা চায়ের ও একটা বাথরুমের মগ হিসাবে ব্যবহারের জন্য। বললেন, তোমরা তো আর হোটেলে উঠছ না। নীরেন গাড়ি ভাড়া নিয়েছে, বলা তো যায় না,- তেমন অসুবিধা। এই দুটো পর্দা দিলুম, ঘরের জানালায় লাগাবে, নইলে বে-আব্রুর জন্য তোমার অসুবিধা হবে। আর বরফজল না হলে ঢোঁকলে খেতে নিও। এই কৌটোগুলোর মধ্যে জল নুন, চুনুর গুঁড়ো, চারটি চাল, আলু সব আছে, কিনেই বাজারে ছুটতে হবে না, ওতেই চলে যাবে একবেলা। আর হ্যাঁ, এ পাশে রইল থালা, বাটি, গেলাস। কেয়া দেখল, কলাই করা দুটো থালা, দুটো বাটি ও এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। প্রায় নাক সিঁটকে বলতে যাচ্ছিল, এ্যা, কলাই করা থালা? কিন্তু এই সময় নীরেন বারান্দায় এসে পড়ল। কেয়ার মুখের ভাব দেখেও নীরেন আশ্চর্য হয়ে বলল, আমরা তো চিরকাল কলাই করা থালা নিয়েই বাইরে যাই। স্নেহময়ীও যোগ দিলেন, হ্যাঁ, গো, ভ্রিপেশ-বিহীনই, চোরের নজর এড়াতে সস্তা জিনিসই ভাল। তাছাড়া এ-জায়গা ও-জায়গা খুঁজতে গিয়ে হারাতেও পারে। এ বেশ ভাল সস্তা, কিন্তু মজবুত, ভাববে না, অন্ধ মাজতে খুতে সুবিধে। কেয়ার বিরাট এক শখ ভঙ্গ হল, বিয়ের পর বেড়াতে যাওয়া, সঙ্গে কলাই করা থালা। এমন মুহূর্তকারী দুশাটা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে পারল না বলে ওর রীতিমত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে হলেও ফেলে গেল। লক্ষ্য করে দেখল স্নেহময়ীর গায়ে কখনো রীতিমত ঘাম। কেয়া বলল, মা এইবার আপনি পুজোটা সেরে একটু জলখাবার খেয়ে নিন, বেলা তো অনেক হল। এই কথাটাই নীরেন ও বড় বৌ-ও বলতে চাইল। স্নেহময়ী বললেন, হ্যাঁ, এই যাই। চারটি চিড়ে এনেছি, এই ছোট কৌটোয় দিলুম, নীরু আবার বেলা খাবার খাবে না। দই-চিঁড়ে দিও সকালে, বিকেলে ছানা দিও। কেয়ার প্রচণ্ড হাসি পেলেও গম্ভীর মুখ করে থাকল, বিশেষত স্নেহময়ীর ঘামে মুখ দেখে ওর সিরিয়াস থাকাই উচিত মনে হল।

বেলা এগারোটা বাজার পর উনি পুজোয় বসলেন। কিন্তু দশ মিনিট পরেই হঠাৎ মনে পড়ল পটল বালিশটা দেওয়া হয় নি, ওর ওয়াড়টাও পালটে দিতে হবে। ছেলে তো আর বিছানা সব সময় খুলবে না, পটলটা হাতের কাছে থাকলে একটু শুয়ে নিতে পারবে।

কেয়া এ-ঘরে আসতেই বললেন— বালিশের ওয়াড়টা পালটে রাখতে। কাজেই একটা টাইের মতলব হলদে রঙের চাদর ছিল, রোদিনীপুরের হাট থেকে আনা। পটল বালিশকে সেই চাদরে জড়িয়ে নিতে নির্দেশ দিয়ে স্নেহময়ী জপে মন দিলেন। কিন্তু হায়, আবার যে জরুরি একটা কথা মনে পড়ল। ও কেয়া, শুনেছো, এই আলমারির ড্রয়ারে একটা খালি জবার কৌটোয় তাজা মলমটা রেখেছি, ভুলে যাবার আগেই নিয়ে নাও। আর এই একটা গামছা। ওসব তোয়ালে-ফোয়ালেতে আমার ছেলেদের আরাম হয় না। এই গামছাটা বেডিং-এর মধ্যে নিয়ে নাও। এই রকম আরেকটা একান্ত জরুরি ভাবনাগুলোর মাঝেই নীরেন এই ঘরে কোন কারণে ঢুকে শুনতে পেল না পুজোর বসেও কথা বলছে। প্রায় একই সময়ে নীরেনের বড় ভাই এদিকের বারান্দায় এসে পড়ে। দু'জনে মিলে পুজোটা শেষ

করার জন্য মাকে কড়া ধমক দিয়ে যে যার কাজে গেল। এই রকম দৃশ্য কেয়া আজ কদিনই দেখছে এ বাড়িতে। সকাল সাতটা থেকে স্নেহময়ীকে পুজোটা সমাপ্ত সেরে ফেলার জন্য বাড়ির অধিকাংশ সদস্যরাই তাগাদা দিতে থাকে। এরই ফাঁকফাঁকে বহুবিধ জরুরি কাজ সারতে সারতে স্নেহময়ী নটা নাগাদ পুজোয় বসেন। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে? তক্ষুণি বাজার নিয়ে পড়া কিরকম। প্রতিটি আইটেমের দাম মিলিয়ে স্নেহময়ী ঐ আসনে বসেই হিসেব মেলাবেন। এই সময়ে ছোট রেডিওটি কাছে রাখতে অবলা ভুলবেন না। নটায় আবার খবর বলে কিনা। টেবিল ঘড়িটা সামনেই রাখা থাকে। শেষ পর্যন্ত সাড়ে বারোটা নাগাদ ছোট ঘটি হাতে ছাদে যাবেন তুলসী গাছে জল দিতে। তখনি বুঝতে হবে স্নেহময়ীর পুজোর শেষ পর্যায় চলছে। এই সময়ের পর আর দেরি হয় না। শুধু এই ফাঁকে মেজাজটা একটু তিরিক্ষে হয়ে আসে। কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়। বুঝতে হবে স্নেহময়ীর জল খাবার সময় হয়েছে। এক বাটি ছানা, একটি কলা ও এক ঘটি জল নিয়ে কেয়া দাঁড়িয়ে থাকবে। কেয়ার বড়-মা এই রকম সময়ে কি করতে হবে কেয়াকে আগেই বলে দিয়েছে। লক্ষ করে দেখা গেছে এই সময়ে স্নেহময়ীর কোচরে খানিকটা মুড়ি ও চানাচুর ফেলে দিলে চোখের ওপরের কুঞ্চন সরে গিয়ে মুখটা বেশ হাসি হাসি হয়ে যায়। স্নেহময়ী বলেন, যাই বল, আমরা হলুম গাঁয়ের মানুষ। ওসব বাটি-ফাটিতে খাওয়া পোষায় না। চাট্টি মুড়ি পেলে হয়ে যাই। মুড়ি কি আর বাটিতে খায়? কোঁচড়ে করে মুড়ি খেলে কত সুখ। আমায় বাপু রোজ মুড়ি দিও। ছানা রোজ খেতে পারি না। কিন্তু ছেলেদের কড়া হুকুম ছানা খেতেই হবে। বাবার অবর্তমানে ছেলেদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে।

সেই স্নেহময়ী বেলা একটায় আবার এসে ছোড়দের কাছে বসলেন। কড়া নজরে দেখে নিলেন আর কি কি দিতে হবে। জমল বেডিংটার চেয়ারা বিশ্রী আকারে ধারণ করেছে। সর্বদা ব্যবহারের অনেক জামা-কাপড়ও ওখানেই দিয়েছেন তিনি। সুটকেশটা তাহলে হাল্কা থাকবে, দরকার হলে নীচু বইতে পারবে। দেখে-শুনে কেয়া বলল বা, এইবার বেঁধে ফেলি? স্নেহময়ী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বললেন, দাঁড়াও, নীচু কিসুক, ওর আবার কিছু দরকারি জিনিস তোলবার থাকতে পারে। কেয়া হতাশ হলো। না, এখনও শেষ পর্যায় আসেনি। ইতিমধ্যে নীরেন তার কাজ-টাজ সারতে বেরিয়ে গেছে। বেলা চারটে। নীরেনের ছোট ভাই হীরেন এসে গেছে। ও ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। খানিক বাদে বড় ভাইও এসে গেলেন। বেল বড় একটি ওষুধের প্যাকেট কেয়ার কাছে জমা দিলেন। এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট প্যাকেট, গায়ে নাম ও নির্দেশ লেখা, কি হলে কোন্ ওষুধটা খেতে হবে ইত্যাদি। যত্নের মনোযোগ দিয়ে কেয়া ওষুধগুলি বুঝে নিল। বেড়াতে যাবার সময় যে এতগুলি ওষুধ নিতে হয় নাকি পরনা খরচ করে এটাও কেয়া এই প্রথম জানল ওর চব্বিশ বছরের জীবনে।

চারটে পনের। হাওড়া যেতে সময় লাগে, ট্রাফিক জ্যাম থাকতেই পারে, নীরেন এখনও এলো না। কেয়াই জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে, সামান্য খাওয়াও শেষ। হীরেন আরেকবার বারান্দার ঘড়ি গেল, চোখ ঘড়ির দিকে। টিফিন কৌটো, জলের বোতল, চাদর মোড়া গদি বালিশ, কিট ব্যাগ, সুটকেশ—সবই ঘর থেকে বারান্দায় এসে গেল, শুধু বেডিংটি বিশাল দেহ অজগরের মত পড়ে আছে। নীরেন না এলে তো ওটি বাঁধা চলে না।

ঘড়িতে পৌনে ছটা, বড় ভাই একবার পুজো সেরে এসে দেখে তখনও নীরেন আসেনি। কেয়ার পা থরথর করে কাঁপছে, কি হবে যদি গাড়ি ছেড়ে যায়, যদি টিকিটের এতগুলো টাকা নষ্ট হয়। যদি নীরেন না পৌঁছয়? কেয়া আর ভাবতে পারে না। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়তে থাকে। হীরেনের ভীষণ উত্তেজিত গলা বারান্দায় শোনা যায়, মেজদার কি কাণ্ডজ্ঞান এবারে হবে না, যত কাজ কি আজকের জন্যেই তোলা ছিল? স্নেহময়ীও ঠাকুর নমস্কার সেরে সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট ভাই সুরেন ও বড়বৌ এদের টেনশন দেখে হাসছে, বড় ভাই ধীরেন খুবই চিন্তিত মুখে এদিকে আসছিলেন। এমন সময় ছটা পাঁচ মিনিটে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সকলের সঙ্গে কেয়া দেখতে পেল নীরেন ফিরছে। বড় ভাই বললেন, যাক, এসে গেছে, তোমরা আর কেউ কিছু বলো না। কেয়ার অবাক মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত হাত-পায়ে কোন শক্তি নেই, মাথাটা ঘুরছে।

নীরেন ঐ সন্ধ্যেবেলাতেই স্নান-টান সেরে নিল। ঠাকুর নমস্কার ও গুরুজনদের নমস্কার সেরে নীরেন যখন ঘরে এল ততক্ষণে ওর কিছু কাগজ বই টোকাবার পর স্নেহময়ী লোকজনদের সাহায্যে সেই সকালবেলায় পাতা বেডিংটি বেঁধে ফেলেছেন ও সেটি মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে চালান হয়ে গেছে। কেয়ার মুখ দেখে নীরেন আস্তে বলল, যাবড়াবার কি আছে, আমি তো এসে গেছি। ওর এই এসে যাওয়াতে কেয়া এতটুকু আশ্বস্তবোধ করল না, কারণ ঘড়িতে তখন ছটা পনের। গাড়ি ছাড়বে সাতটায়। ওরোলিটেনের মোড় থেকে হাওড়া কাছে হলেও আশঙ্কা থেকেই যায়।

উত্তেজিত হীরেন বার কয়েক ড্রাইভারকে ধমক-টমক দিল এবং সাতটা বাজতে ছ'মিনিট আগে ওরা হাওড়ায় পৌঁছল। পথে হীরেন যত উত্তেজিত ও চিন্তিত ছিল, নীরেন ততই চুপচাপ।

ট্রেন ছাড়ার আগে এই ব্যস্তসমস্ত হীরেনই কেয়াকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়াল, নিজেও খেল। নীরেন ওদের

খেতে সাহস পায় না, যদি পেটটা গণ্ডগোল করে!

গুছিয়ে বসার আগেই ট্রেন ছেড়ে গেল। নীরেনের ফিরতে দেরি হবার কারণটা বেলাকে জানার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপে নীরেন এতক্ষণে ব্যস্ত।

সকলের দশকটাতে রাজনৈতিক মহল ছিল। কেরার বিস্তৃতে পারিপার্শ্বিকের কামেলা এড়াতে অনেক রাত-বেরাত ছাটাই করা হয়েছিল। সেই অশান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বেলা বেড়াতে যাবার সময়ও কোন গয়না পরেনি। সন্ধ্যা হলেও বেলার বেড়াতে যাওয়ার সাজগোজটা তেমন বলা হয় নি। সাদামাটা সাজেই ট্রেনে উঠেছে। নীরেনের চেহারায় ক্লান্ত। সারাদিন অফিস, কাছারির দোকান, টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরেই হাওড়া। নীরেন-বেলাকে দেখে নিতান্ত কল্পনা বিলাসীর পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিল না যে, এদের আটদিন আগে বিয়ে হয়েছে এবং এরা হানিমুনে যাচ্ছে। বেডিংটা দোমড়াতে নীরেনকে একটু বেশ পেতেই হাচ্ছল। কিছুক্ষণ বাদে সহযাত্রী নীরেনকে যখন প্রশ্ন করলেন, পাহাড়ে কি বদলির চাকরি? তখন সে ভদ্রলোকের সঙ্গে একই মুহূর্তে বেলারও চোখ পড়ে গেল তাদের বিশাল বেডিংটির দিকে। বেলা সলজ্জ চোখে নিঃশব্দে নীরেনকে দেখল। নীরেন বলছিল, না মানে এই বেড়ানো—

Our traditions do not but inspire

Our impeccable cuisine and above all our service
With a smile—you will enjoy

GREAT EASTERN HOTEL
(A NATIONALISED HOTEL)

1, 2 & 3, Old Court House Street
Calcutta-700 069

"সমবায়ের অপর নাম সেবা ও আত্মনির্ভরতা। এই দুই-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিয়ে এক সকলের ভালোবাসাকে মূলধন করে এগিয়ে চলেছে—

পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সমিতি লিমিটেড"

টেলিফোন নং : ২৩৬২ এল পি জি ২৩৮৪

—আপনাদের সেবায় আছে—

(১) সমবায়িকা (রাঁচী রোড) (২) আদ্রা (৩) মানবাজার (৪) বলরামপুর
(৫) ঝালদা (৬) সুইসা ও (৭) মুনডি ব্রাঞ্চ

Turner Co-operative Credit Society Limited

6, LYONS RANGE. CALCUTTA-700 001
VISIT OUR HOLIDAY HOME.
PURI. GOUR BAD SAHI.
(Near Sea Side)
PURI.

ফোন : ৬৮-২৭৫১

বালটিকুরী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক
রেজিঃ নং—২৮/৭৪

হাওড়া-আমতা রোড. বালটিকুরী. হাওড়া-৭১১ ৪০২

আমাদের ব্যাঙ্কের কয়েকটি জমা প্রকল্প :

- সেভিংস ডিপোজিট
- রেকারিং ডিপোজিট
- ক্যাশ সার্টিফিকেট
- মিউচুয়ালি ডিপোজিট
- স্থায়ী আমানত

প্রতিটি জমা প্রকল্পের সুদের হার যে-কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি। টিপসই দিয়ে এ্যাকাউন্ট খোলা যায় ও লেনদেন করা যায়।

মর্টগেজ করার ব্যবস্থা আছে।

এছাড়া চালু আছে :

(১) ব্যবসায়ীদের জন্য কারেন্ট এ্যাকাউন্ট
(২) মূল্যবান সম্পদের সুষ্ঠু নিরাপত্তার জন্য সহজ শর্তে 'লকার'
(৩) শিল্প উন্নয়ন ঋণ (Industrial Development Loan) ও ক্যাশ ক্রেডিট
(৪) স্বপ্নালঙ্কার সঞ্চিত ঋণ
(৫) গৃহ নির্মাণ ঋণ
৬. হায়ার পারচেজ ঋণ
(৭) দীঘার ও পুরীর সমুদ্র সৈকতে মনোরম পরিবেশে স্বল্প ব্যয়ে অবকাশ যাপনের জন্য 'হলিডে হোম।'

সভাপতি	সম্পাদক	কোষাধ্যক্ষ
শ্রীরতনচন্দ্র দাস	শ্রীঅসিতবরণ মাজি	শ্রীঅরুণ বসু

শারদীয়ার সাদর অভিনন্দন সহ—

দুর্গাপুর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

ডাঃ বি সি রায় এভিনিউ

দুর্গাপুর-৭১৩ ২০১

ঘাতিনী

আবুল বাশার

মানুষের কিছু কিছু আশ্চর্যরকম স্পর্ধা থাকে। ভাবছিল শিবেন্দ্র। সে-কথা কারুকে বলে বোঝাতেও ইচ্ছে হয়। যেমন কঙ্কাবতীর কথাই ধরা যাক, তার বড়ই সাহস ছিল। তার বাবাও ছিল আহাম্মক। বাপ আর মেয়েতে মিলে মরি ওরে শিবেন্দ্রকে শহরে নিম্নমিত চিঠি লিখে পাঠাতো। কঙ্কাবতী ছিল শরৎচন্দ্রের নায়িকার মতো অবুঝ, তার বাপও ছিল পুরনো সনদের সহজ স্বার্থপর মানুষ। চিঠি লিখে তাকে মেয়েকে গছিয়ে দিতে পারবে।

চিঠি লিখে লিখে এমন করেছিল যে, কঙ্কাবতীর সাথে শিবেন্দ্রর যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ, শিবেন্দ্রও প্রতিজ্ঞা হয়ে যেত, কঙ্কা নিশ্চয়ই তার সত্যিই কেউ। কিন্তু চিঠি ছাড়া আর তো কোন সম্বন্ধ ছিল না। দশখানা চিঠি লেখে একখানা জবাব লিখতো শিবেন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সমুখ ঘটনার তাল্লব রকম মিলও ছিল। ষোল বছর, বয়সে কঙ্কাবতী, বিধবা হয়েছিল। তারপরও চিঠি লেখা ছাড়েনি। বরং বেড়ে গেছিল।

শেষের দিকে বাপ আর লিখত না, মেয়েই সাহিত্য সাধনার মতো পদ্ধতি করে যাচ্ছিল বন্ধুর মনে পড়ছে, বছর দুই আগে বা এক বছর আগে কঙ্কার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, সে কথা চিঠি লিখে জানাতে ভোলেনি সে।

তারপর লিখেছে, তুমি ছাড়া আমাকে স্নেহ করার আর কোন মানুষ নাই শিব। বাপটি চলে গেল। এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসাস্থল, তুমি বাঁচালে বাঁচব, নইলে আত্মঘাতী হব। কী স্পর্ধা! এই ধারা লিখেছিল কঙ্কাবতী। শিবেন্দ্র আর কোন চিঠির জবাব দেয়নি। চুপ করে গিয়েছিল। তার চেয়েও রহস্যজনক ঘটনা, কিছুকাল যাবৎ কঙ্কাবতী আর কোন চিঠি লেখেনি। মনে হচ্ছে, মেয়েটি মরে গিয়েছে। শিবেন্দ্রর স্বভাবই হচ্ছে অনেক অনুমানকে সে মনের মধ্যে দীর্ঘ সময় নাড়াচাড়ার পর এক সময় সেটাকে সত্য মনে করতে শুরু করে। ঠিক সেই প্রকার কঙ্কাবতী মরে গিয়েছে ভেবে সেই ভাবনার গুরুত্ব এমনই বাড়িয়ে তুলল যে কঙ্কা যে বেঁচে থাকতে পারে একথা সে আর চিন্তা করতে পারল না। ঠিক সেই সময় শিবেন্দ্র গাঁয়ে ফিরে এল। বৌদির বোনের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয়েছে। বৌদির বোন তার মামার সাথে ওড়িশায় থাকে। কথা হয়েছে মেয়েটিকে তার মামা সাথে করে শিবেন্দ্রদের বাড়ি এনে তুলবেন, তারপর এখানেই বিয়ে হবে। সেই মতো শিবেন্দ্র এখন গাঁয়ের বাড়িতেই পরম-চন্দ্রের নায়কের মতন উপস্থিত। তার সম্মুখে বিষবাবেশি কি কঙ্কাবতী হাজেরা মূর্তিমান সেবিকা, কিন্তু শিবেন্দ্র তাকে মোটেও চিনতে পারছে না। তার দু'-তিনটি কারণ থাকতে পারে বা চার-পাঁচটি কারণও থেকে যেতে পারে, কিন্তু সমূহ কারণ আলোচনার দরকার নেই। আমরা দু'-তিনটির বেশি পারব বলে প্রত্যয় করতে পারি না। যা হোক, আমরা যা জানি, সেই প্রকার লিখছি।

প্রথমত, বিধবা কঙ্কাবতীকে শিবেন্দ্র কখনও দেখেনি। কিশোরীকালের যৌবনের সূচনায়, তখন ওর গড়ন ছিল পাতলা, হাত পা সরু সরু, ডিগডিগে কচির মতন সটান। এখন সে ভরাট স্বাস্থ্যবতী, নিরাকুল সৌন্দর্যের বিম্ব প্রতিমা। আগে ছিল ছিপছিপে—স্রোতের মতন কুলকুল করা সবাক মুখরতার নির্ঝর। এখন গহন স্থির ভরা গাঙ। প্রত্যক্ষত তাকে চেনার কোন পূর্বচিহ্ন নেই। আসল বদলে গিয়েছে। আজ সাতদিনে কঙ্কাবতী শিবেন্দ্রর সাথে কথা বলছে কি-জোর সবসুদ্ধ দু'-তিনটি। তাও খাবেন নেবেন জানব ইত্যাদি। তাছাড়া এই বাড়িতে কঙ্কাবতীকে কেউ কঙ্কাবতী বলে ডাকে না। সবাই বলে কঙ্কা। ভাইপো নীলু হোতলা করে ওকে কঙ্কা বলে ডাকে। সেটাই চালু।

ফলে শিবেন্দ্র ওকে চিনতে পারল না। তখন শিবেন্দ্র কঙ্কাবতী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এক যতনের যুথসুলভ বাসন্তী হাওয়ার মতন আলতা ছোতের ঢাকা হাসির মতন ফুরফুরে মেশানো অনাবিল-উচ্ছ্বাস প্রেম করতে চাইল। শুধালো—তুমি কে? ডাকে শুধালো—মা, কাকের মেয়েটি কে গো?

কঙ্কাবতী ভয়ানক আঘাত পেল, আর বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বলল—আমি কঙ্কা। তোমাদের ঝি। মা বলল—কে আর হবে বাছা! দেখতেই পাচ্ছ, কাকের মেয়ে।

শিবেন্দ্র বলল—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আগে যেন কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে, মনে করতে পারছি না। বলই না কোথা থেকে ওকে এনেছ? কী করতে আসে? ওর বর কী করে মরল? ওর বাবা-মা কোথায়?

মা বলল—ওর কেউ নেই। ঘরজুড়ে। কেউ থাকলে অমন হয়? কপাল, দোষে গুণের ছেঁসেল ঠেলছে তিন বেলা। থাকবার থাকলে ভরা যৌবনে কেউ আসে? আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

বলেই মা রহস্য করে হাসল। মা একটা মজা পেয়েছে যেন। এ বাড়ির ঐতিহ্য হচ্ছে হাসেনা কোন একটা মজার মধ্যে থাকা। মজার মধ্যবিন্দু মানুষে অথবা কুকুর বেড়ালও হতে পারে। মা কেবল নয়, তখন শিবেন্দ্র চিনতে পারেনি, একবার সবাই জেনে গেল এবং তখন কেউ আর কঙ্কাবতীর পরিচয় দিল না। মা বলল—চেনা চেনা লাগছে তখন, দেখি তুমি কী করে চিনতে পারো। অনেক মানুষকে অকারণ চেনা চেনা লাগে, আবার চেনা মানুষও অচেনা হয়। দেখি তুমি কীসে কী করছ, সবাইকে বলেছি, কঙ্কার নাম কেউ বলবে না। আসলে কঙ্কাই তো ওর নাম। আসলে তুমি ওকে ভয় পাচ্ছ। সেকথা কঙ্কাকেও বলেছি আমরা। কঙ্কা শুনে কেঁদেছে। কাঁদবে না, ছোট লোকের মেয়ে হলে কী হয়, প্রাণ মন

সবাই আছে। একটু কড়া স্বভাব, এই যা! সবাই তো সমান নয়। সবার কপাল এক-ভাবে পোড়েও না।

শিবেন্দ্র অবাক আর বাধিত হয়ে শুধাল —আমি ভয় পাব কেন? একটা সামান্য মেয়েকে ভয় পাব কেন?

—পাবে পাবে। তোমার ছেলেবেলার কথা মনে নেই? কঙ্কাবতী বলে একজন কপালে একবার কাঁচ পোকার টিপ পরেছিল। মনে নেই? মা বলতে বলতে কথা বন্ধ করে অন্য ঘরে চলে যায়। ফেরে না অনেকক্ষণ। বললে ঘরে আসে কন্যা। শিবেন্দ্র বুঝতে পারে না, টিপপরা কঙ্কাবতীর সাথে টিপহীনা সাধা সিঁথি এই বিধবা কন্যার কী সম্বন্ধ। প্রকৃত ঘটনা যাইহোক, মা একটা ভয়ের কথা বলছে। মা ছেলেবেলা থেকেই শিবেন্দ্রকে বলে আসছে সেই ঘটনা। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। সেই ভয় পাওয়াটা যেন কত গর্বের ব্যাপার।

শিবেন্দ্র কন্যাকে বলল—আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলাম।

কন্যা বলল—তোমার, আহা আপনার মন খুব নরম। আপনাদের পরিবারের সবারই মন খুব নরম। বড়লোকদের মন খুবই নরম হয়, ভিজে ভিজে হয়।

—হ্যাঁ! ঠিক বলেছ। তোমার অবস্থা দেখে আমার মন খুবই খারাপ করছে কন্যা।

—বলবেই তো, সামান্য একটা কাঁচ পোকার ডানা ছিঁড়ে ছিল একটা মেয়ে কপালে টিপ পরবে বলে, তাই না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা তোমাকে বলেছে বুঝি?

—কতদিন কতজনকে বলেছে।

—মা সবসময়েই বলে।

—কারণ আপনার মন যে কত নরম, সে কথা বলার জন্য কঙ্কাবতীর কথা বলতেই হয়। আপনি কঙ্কাবতীকে ভয় পান সে কথাও বলতে হয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক।

দ্বিতীয়ত, সেই কাঁচ পোকার কথাই ধরা যাক। একটা নীল রঙের পোকা। গুবরে পোকা নয় বটে, কিন্তু সেই পোকা গোবরেও শুয়ে থাকত। হাতের দু' আঙুলে চিমটি দিয়ে কঙ্কাবতী টেনে তুলেছিল শিবেন্দ্রর চোখের সামনে। কী ঘোরাক্ত বুনো স্বভাব ছিল কঙ্কার, নিষ্ঠুর ছিল। যাচকরা আঙুলে ডানা ধরে ছিঁড়ে ফেলল তারা সুন্দরী পোকাকে। এই দৃশ্যের দিকে মনে মনে চাইলে এখনও সভয়ে শিবেন্দ্রর চোখের পাতা নুয়ে আসে। ছেলেবেলার ভয়ে কেঁদে উঠেছিল কাঁকিয়ে। ততক্ষণে কঙ্কাবতী ছেঁড়া রঙিন কাগজে ডানা কপালে খুব ঘিষে সেঁটে নিয়েছে। এই হল টিপ, যিনে নাগনা প্রকৃতির দুনন করা সৌন্দর্য। নিজেকে সাজিয়ে তোলার জন্য কঙ্কাবতী একটি সুন্দরী পোকাকে হত্যা করেছিল একদিন। সেটা ছিল গ্রাম্য মেয়ের প্রকৃতির কোলে টিপ টিপ খেলার তীব্র রসপাত, কিন্তু সেই রক্ত চোখে দেখেনি কেউ। নারী অর্থাৎ যে নারী তার শখের জন্য সুন্দরী পোকাকে খুন করে, সে দরকার হলে স্বামীর খুনে সিঁথি ভরাবে। একথা বলেছিল শিবেন্দ্র-জননী। বলেছিল—খুব পারের জাতি ওরা, মানলে চলে, না মানলে কচু। শিবু! তুমি ঐ মেয়ের সাথে মিশবে না। গরীবরা খুব নিষ্ঠুর হয়।

একথা বলেছিল কেন? না, ঐ ঘটনার পর শিবেন্দ্রর বেহুঁশ জ্বর হয়েছিল। কঙ্কাবতীও সেই দৃশ্য মনে করতে পারে। ডানা ছিঁড়ে কপালে সেঁটেই সে ঈষৎ বোকা হয়ে গেল। মুহূর্তে শিবেন্দ্রর মুখে রক্তশূন্যতা দেখা দিল। ঠোঁট শুকিয়ে খর। দু'চোখ অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। শিবেন্দ্রর মুখের উপর থেকে শিবেন্দ্রর হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে দেখেছিল কঙ্কাবতী, এই! তুই কাঁদছিস শিবু? বলেই চোখের অতলে দৃষ্টি ফেলে করুণা দেখতে চায় শিবেন্দ্রর মনের গভীর নিচে কোথায় কী ঘটছে। এমন কেন হল?

এই ঘটনার থেকেই ওদের বাবধান প্রকট হতে থাকে দিনে দিনে। কিন্তু মনতো মানে না। ওরা দুরি করে দেখা করেছে কতদিন। আরো কিছুটা বড় হয়ে ওরা প্রেমের চিঠি লিখতে শুরু করে। কঙ্কাবতী লিখেছিল—আমার প্রচুর শখ। শখের দাম লাখ টাকা। আমি তোমায় খুন করে সিঁথি রাঙাব শিবেন্দ্র। ভয় পাও নাকি? আমি ছাড়ব না।

সেই ভয়ে শিবেন্দ্রকে তার মা শহরে পাঠিয়ে দিল মাসির কাছে। বোনকে লিখল—আমার শিবু খুব নরম মনের, গ্রাম্য নিষ্ঠুরতার মধ্যে ওকে মানুষ করা যাবে না বলে তোর কাছে পাঠালাম।

সেই থেকে শিবেন্দ্র শহরের বাসিন্দা। কেবল প্রথম দিকে স্কুলের বড় ছুটির বেশে গাঁয়ে আসত। সেটাও বন্ধ করেছিল মা, সেবার যখন কঙ্কাবতীর বিয়েতে নৌকাডুবি হল।

তৃতীয়ত, নৌকাডুবির ঘটনাই হয়ত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল। কঙ্কাবতীর বাবা বুঝেছিল কঙ্কাবতী প্রেমপত্র লিখলেও শিবেন্দ্রর মায়ের একফোটাও সদিচ্ছা নেই যে গরীব বামুনের দস্যিপনা মেয়েকে ছেলের বউ করে কুটুম্বিতা করে। তলে তলে বিয়ের ব্যবস্থা করল কঙ্কার বাবা। বিয়েতে ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সানাই বেজেছিল। বর এসেছিল নদী পথে নৌকায়। বউ নিয়ে ফিরছিল বরপক্ষ। নদী পথে ভয়ানক ঝড় উঠল। নৌকা ডুবে গেল! গাঁয়ের লোক নদী তীরে দাঁড়িয়ে মেয়ে বিদায়ের দৃশ্য দেখছিল। যখন নৌকা চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন যে যার ঘরে ফিরে গেল। তারপর নদীতে এল প্রখর ঝড়। নৌকা ডুবল কথায় কথায়। বর সাঁতার জানত না। ফলে বরযাত্রী যারা দু'-একজন নৌকোর ছিল তারাও মেরে আর শিল্প। কেউ বাঁচল না। কঙ্কাবতী সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে এল দুটিপাড়ার ঘাটে। বর নিরুদ্দেশ।

বিয়ের সাজে অনে ভেজা কাপড়ে শিবে শিবেন্দ্রর বাড়ি কন্যার মুখে। শিবেন্দ্ররা

কেউ কল্পার বিষয়ে সেরকম কোনো খোঁজ নেয়নি। যদিও খাওয়ার মতো ভোজ বাড়ি পরীর কী করে এ খবর জানাবে? সে-সব নয়। বারবার লোক পাঠিয়েছিল কল্পার মা কেমার মুখুজ্জের। নিজেও এসে শিবেন্দ্রকে আসতে যাওয়ার জন্য সাধাসাধি করেছিল। শিবেন্দ্রকে যা যেতে দেননি। বিকাল পড়ে এসেছে সন্ধ্যার মুখে। ভেজা কাপড়ে বদী থেকে উঠে এল সেদিনী খেপো রাক্ষুসী। শিবেন্দ্র জানালার মুখ রেখে ডাকল শিবু! শিবু! দরোজা খোলো শিবু।

বাড়ির সবাই ভূত দেখার মতন অলৌকিক ভয়ে চমকে উঠল, মৃদু সমস্বর আর্তনাদ শোনা। কে রে? কে ওখানে? বিশ্বাসই কেউ করবে না, ওটা কল্পাবতী। কল্পাবতীকে সাথে সাথে ওরা গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে ঠেলে দিলে। ধাক্কা খেতে খেতে কল্পা তখনও শিবু শিবু করে কাঁদছিল। সেদিন সেই দুর্ঘটনার পর কল্পাবতী কেন শিবুর কাছে এল?

মানুষের কিছু কিছু আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে। ভাবছিল শিবেন্দ্র। বাইরে যখন কল্পাকে বাড়ির সবাই ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে তখন ঘর ছেড়ে বাইরে এল শিবেন্দ্র। বাইরের বারান্দায় দেখল কোন এক রাক্ষুসীর পায়ের পাতার জলে ছাপ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শিবেন্দ্র ভেবেছিল, কল্পার পা দুখানি আর ছোট নেই।

তাহলে ঘটনা যা দাঁড়াল, হিসাব মতো নিতান্তই অদ্ভুত ও বিকট। কী হতে পারে এইসব ঘটনার নিদান। কেমার মুখুজ্জে শিবেন্দ্রকে চিঠি লিখল—ভাবিয়া দেখ বাবা, কল্পা কেন স্বামী খাইয়া ভেজা কাপড়ে তোমার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল? ঘটনার পরম্পরা বিচার করিলে বুঝিবে আমরা আজও তোমার প্রত্যাশী। তুমি মুখপুড়ি বিষয়ার প্রতি সদয় হইলে বাঁচি। পত্র লিখিও। ঈশ্বরকৃপা অদ্যাপি বাঁচিয়া থাকিলে কল্পার দর্শন অদ্যাপি করিতেন প্রস্তুত হয়। তুমি শুনিয়াছি গল্পকার, আর কিছু কবির ভাষিত কিংবা এলাইয়ের মতন স্পর্শ-কাতর কোমল প্রাণ, কাঁচপোকা হওয়ার পথকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও। কল্পা আমাকে সব কথা বুঝাইয়া বিদায়ছে, একটি সামান্য লোকায় জন্য কতকাল লোক করিতে হইবে, বিধান লিখিয়া পাঠাইলে আমরা প্রসন্ন হই।

শিবেন্দ্র উত্তরে লিখেছিল—মা আমাকে ভাটির মা এলাইয়ের সাথে তুলনা করেন বটে, কিন্তু কোন প্রকার বিধান লিখিবার ক্ষমতা আমার নাই, কল্পার ভেজা পায়ের ছাপ মনে করলে আজও আমার বুক তোলপাড় করে, বড়ই দুঃখে কাটছে দিন। আমার প্রতি প্রত্যাশা রাখবেন না, কল্পাকে তার নিয়তি ছলনা করেছে, উহা অতিক্রম করার সাধ্য কার আছে?—ইতি বিনীত শিবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু নিয়তি সাঁটাই নাহান না ছোড় পশু প্রতিভা মানুষকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে রক্তাক্ত করে ছেড়ে দেয় কোন্ বিবরের অভাব ছিল না। শিবেন্দ্র মনে করেছিল, কল্পাবতী মরে গিয়েছে, তার মনে কল্পা যথার্থ এবং সত্যনিষ্ঠ অনুমানে প্রখর। অতএব শিবেন্দ্র ভাবল সাজনের মুখোমুখান সেবিকা একজন সদ্য চেনা নবীনা অনাত্মিনী, বিশ্ব সুন্দরবাক আশ্চর্য হন করুণার অশ্রুজল, তাকে চেয়ে দেখলে মায়াবী কামেচ্ছা জাগে।

সেদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আলুথালু হাওয়া-ধর্মর দুপুর। চারদিক ঝিমুনি দিচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে। সহসা ঘুমন্ত শিবেন্দ্র জেগে উঠল। যেন তার কামনা তারই মূর্তি ধরে খাড়া হয়ে বসল মায়াবক ভঙ্গিমায়। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল খালি ঘরে। বারান্দায় চেয়ে দেখল সেই এল মাথা পায়ের ছাপ আরো পুরুষ্ট ভরাট। এমন পদচিহ্ন দেখে কেমন অন্য মনস্ক হয়ে যায় সে। কেবলই এক দুর্বোধ্য আচ্ছন্নতার মধ্যে সে অনুসরণ করে উন্ন বিধবার শোবার একলা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। দরোজা খোলাই ছিল। ঢুকে পড়ে শিবেন্দ্র। স্নানের পর কল্পাবতী কাপড় ছাড়ছিল। কেমন এক অন্যমনস্কতায় বিদ্ধ দৃষ্টিহত চোখে জানালার চেরে চেরে দূর গাঁয়ের সুচিহ্নের দিকে। শিবেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করায় ভয়ে চমকে ওঠে আর হাত থেকে কাপড় খসে যায়।

শিবেন্দ্র কাছে এসে মারাত্মক শিহরণে কল্পাবতীর বুকে হাতুড়ির ঘুসে ওঠে। আটকে থাকে বুকে। চোখের সামনে এসে, এখনও প্রতিবারের মতো এইমাত্র মনে হয়, তার শিবেন্দ্র তাকে চিনেছে, কল্পা বলে ডাকবে বুঝি! চোখের পলকে দৃষ্টি ফেলন করে কল্পাবতী। কিন্তু শিবেন্দ্রর চোখ ভরা কুয়াশা। কুয়াশার পেছনে আগুনের শিখা কাঁপছে। আকৃষ্ট হয়ে ওঠে কল্পাবতী। তখন দ্রুত বুকের নিচের উত্তপ্ত মায়া-কুহকে শিবেন্দ্রর চোখে ঘোর বিপত্তি ঘটায়। শিবেন্দ্র এগিয়ে এসে কল্পাবতীর নগ্ন কাঁধে হাত রাখে। বলে—নীলু যে তোমাকে কল্পা কল্পা বলে, আমিও মনে মনে রাতদিন সেইরকম বলি, কিন্তু বুঝতে পারিনা, এটা কোন ধর্ম কিনা? সত্যি বলবে, তুমি কে? মা বোন লজ্জা দিচ্ছে? আই……?

বুকের কাপড় হুঁশহারানে তুলে নিতে নিতে কল্পাবতীর চোখ জলে ভরে যায়। শিবেন্দ্র কোন উত্তর পায় না। শিবেন্দ্র তখন অদ্ভুত প্রস্তাব করে। বলে, ভারি তার কৌতূহল হচ্ছে এই অমনীর নারীদেহ জেনে দেখে একটা অগম্য আকুল অবস্থার পৌঁছতে, যেখানে ভালবাসার নিষ্পত্তি হয়। বলে, শুনে দেখবে, মেয়েমানুষে কেমন করে শোয়? কৃতজ্ঞ থাকব। বলতে বলতে ঝিমু করে হেসে ফেলে যেন বা। উপর্যুপরি শিবেন্দ্র বলে কাতর গলায়—আমাকে শেখাও কল্পা। হায়, শেখাও আমাকে। অভিজ্ঞতা দাও। তোমার মতো বিধবার পাশ কেউ

জানবে না। সবাই ঘুমুচ্ছে। তারপর একটু হেসে বলে, তোমার জীবনে পাপ আর ভালবাসা সমান কথা। ভয় নেই। আমি খুব ভীতু। বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন ইমোশনাল হয়ে গেছি। এসো। এসো না?

কল্পাবতী মনে মনে বলে, নাকের বদলে নয়ন। কলিজার বদলে পাতিহংস। আশিখোতার বদলে আশিখোতা। তথাপি এই লোক তার স্বপ্নের নায়ক। সে কি জানে না চিপের বদলে কাঁচপোকা কেন খুন হয়? সে মানে শিবেন্দ্রকুমার। জানে নাকি? অপর পারে প্রাক্তনের সংলাপ যা বর্ণিত, এক্ষণে শিবেন্দ্র এমন করে না বলে অন্য রকম করে বলে। কিছুটা অন্য।

কারণ কামেচ্ছার ভাষায় কোন জবা থাকে না। তা অনেক স্থূল। সে-সব লেখার আবশ্যকতা আমরা দেখি না। একটা মাত্র নমুনা সাবধানে দেওয়া যেতে পারে। যথা—বউ আসবে ঘরে, তুমি আমাকে আগাম একটু শিখিয়ে দিও, এই আর কি? হেঁ হেঁ! তুমি কি পার?

বলেই শিবেন্দ্র কল্পাবতীকে বুকে জড়িয়ে অনন্ত চৌকির ছোট বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কল্পাবতী অস্ফুট করে চোখের জলে চিৎ-শুয়ে বুঝতে পারে তার ভয়ানক হাসি পাচ্ছে, সে হেসে ফেলছে আর গা কাঁপছে থরথর করে এবং দেহের নিম্নভাগে একটি শুঁয়োপোকা চরে বেড়াচ্ছে, ভয়ংকর জ্বালা করছে তার যৌবন।

এইভাবে বিয়ের আগে অদ্দি কোন অভিজ্ঞতার অন্ত থাকে না। সে কেবলই কল্পাবতীকে সাংকেতিক স্বরে কথা ডাকে! তা কোন বাক্য কিনা বোঝা যায় না। কল্পাবতী বোঝে না। বিষয়া অঙ্গে লিপ্ত শিবেন্দ্রর কিন্তু নেশা কেটে যায়! মামা আসেন ওড়িষ্যা থেকে। জামাই আসে দিঘেটাট। চারজন মিলে একদা দুপুরে ওরা ক্যারাম খেলে। স্ট্রাইকার বোর্ডে ঘষা ঠুকে ঠুকে বলে বেড়ায়—কল্পা কল্পা। সেটাও কি বিদ্রূপ? তিনবার ঘষা ঠুকলে তিনবারই কল্পা বলে। ভারি চমৎকার সেই খেলা। কল্পাবতী শোনে স্ট্রাইকার শিবুর গলায় কল্পা কল্পা বলে কাঁদছে। দু'বার বিটিং দিচ্ছে। কল্পা আর কাঁদছে বোধ হয়। বড় ভালবাসা হয়ে যাচ্ছে জীবন এই সবই হচ্ছে কল্পার। স্ট্রাইকার ছুঁড়তে গিয়ে কল্পাবতী ঘাড় গুঁজে টুপিয়ে টুপিয়ে কেঁদে ফেলে। জল পড়ে চোখ থেকে ক্যারাম-বোর্ডের মেকে। সবাই অবাক হয়। ভাবে মেয়েটা বৈধব্যে উন্মাদ। বিষয়া এমন হয়। অকারণ কাঁদে।

মামা বলেন—বিষয়ার কষ্ট কেউ বুঝবে না।

হবু বউ বলে—হ্যাঁ। ভারি কষ্ট ওর। ও বলছিল এ বাড়িতে ওর আসল নাম বলাও মানা। এই মেয়ে তুমি কালই না তুমি কে? কেউ তো নেই এখানে শিবেন্দ্রও শুনতে চাচ্ছে। ও-ও বলছিল, নাম বললে তোমাকে ও চিনতে পারবে।

কল্পাবতী ভেজা চোখ তুলে শিবেন্দ্রর চোখে চায়।

সেই চোখ দেখে শিবেন্দ্র ভয়ে চমকে ওঠে। কল্পাবতী হয়ত নামটা তার ঘোষণা করবে মনে হচ্ছে। সহসা শিবেন্দ্রর কী যে হয়, বোর্ড ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ঘরে দ্রুত চালায়—থাক থাক। বলতে হবে না। কী দরকার। ওর কান্না পাচ্ছে দেখছ না! আমি নিজেই ওকে চিনে কি করবো। সেটা একটা মজাও বটে। আমি আসছি।

বলে শিবেন্দ্র দ্রুত অন্য ঘরে চলে যায়। কল্পাবতী তা দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

বিয়ের তৌপর পরে শুভদৃষ্টি করে শিবেন্দ্র। ঘরের দেয়ালে ঘড়ির কাছে বিষয়ার অপলা ভয়াল ছায়া। ওকে তাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে চালান করে দেয়। আবার ফিরে আসে কল্পাবতী। ও ছাড়ব না বলেছিল। ও ছাড়তে চাইছে না। ঘুরে ঘুরে আসছে কল্পাবতী। বাসর ঘরে আড়ি পাতবে সবার মতন ছেবেছে। সেজেছে কুমারী কন্যার মতো। সবাই খুশি দিচ্ছে। তা দিক। নিশাবাদ যা খুশি হোক। উৎসব উল্লাস তাব মেতে উঠেছে সে। দরজা সপাটে ছুটে বেড়াচ্ছে তারস্বর ঘুষি। খল খল হাসি। কপালে ওর হঠাৎ কাঁচ টিপ। সহসা শুভদৃষ্টির সময়ও শিবেন্দ্র মনে মনে কল্পা কল্পা করতে করতে সেই টিপের কপালে ক্ষুরের ধার কল্পনা করে। শিউরে ওঠে। ভয়ে গলা কাঠ। দু'চোখ বিহ্বল। স্মৃতির নদীজলে ঝাড়াঝাড়ি ভাং নৌকো ডুবে যায়। সেই থেকে পাগলীর মতন, দিশেহারার মতন, ভয়ানক ঘাতকের মতন, মোশন বড়ুয়ার মতন সারা দিনমান কল্পা শিবেন্দ্রর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর সে ক্লান্ত হয়ে বাসরঘরের বাইরে দরোজার চৌকাঠে কপাটে মাথা হেলান দিয়ে চোখ মুদে পড়ে আছে।

ভেতর থেকে শিবেন্দ্র কী এক দুর্বোধ আতঙ্কে মোটা কাঠের ছিটকিনি এঁটে দেয় সশব্দে। সেই শব্দে আচ্ছন্ন কল্পাবতী জেগে ওঠে। তারপর 'ওরাক' 'ওরাক' করে বমি তুলবে বলে। শিবেন্দ্রর মা ওকে জোর করে ওঠায়, টানতে টানতে অন্যদিকে নিয়ে যায়। বমির শব্দ সন্দেহজনক।

বউ শুধায়—অমন করছে কেন?

শিবেন্দ্র বলে—কল্পা। কল্পাবতী বমি করছে। আকণ্ঠ খেয়েছে কিনা! স্বামীর উচ্চারণে কষ্ট বিদ্রূপ।

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের নায়কের এত সাহস ছিল না।

ফোন : ৩৪-৮১০১
৩৪-৭৭৪০

✱ আপনার ছুটির দিনগুলিকে সুন্দরভাবে উপভোগ করুন।
সুন্দরী স্বর্ণশোভে প্রকাশের হলিডে হোম

"সুস্বাস্থ্য-তে"

যোগাযোগ করুন :

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল হসপিটাল্ ফর চিলড্রেন স্টাফ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

১১৯, নারকেল ডাঙা মেন্ রোড, কলিকাতা-৫৪

শুভেচ্ছা সহ :

বালি ওয়ার্ড নং ৩ উত্তরাঞ্চল কনজুমার্স
কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

৪৯ এ/১, বঙ্কুবিহারী ঘোষ লেন,
বালি, হাওড়া

অরবিন্দ ঘোষ
সম্পাদক

সুরেশচন্দ্র শূর
সভাপতি

অশোক ঘোষ
ম্যানেজার

মঞ্জুষার শাড়ি—"সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল"

—সুচিত্রা মিত্র

২০% রিবেট
২রা সেপ্টেম্বর হইতে
১৪ই অক্টোবর

পুজোর ভীড়ে নজর কাড়ে

মঞ্জুষা

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৭১, লেনিন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

রেশমশিল্পী আজ ও বাংলার রেশম বস্ত্র সম্ভারের এক চিরন্তন সৃষ্টি

আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে

পশ্চিমবঙ্গ রেশমশিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

হেড অফিস :

১২ ১ রেঞ্জার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

"দীঘা"

আমাদের এবং বিভিন্ন অনুমোদিত হোটেলে সামগ্রিক ব্যবস্থা

আমাদের তত্ত্বাবধানে হোম সবার জন্য উন্মুক্ত।

সেন্ট্রাল অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ

ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পি ১১, মিশন রো এক্সটেনশন,

কলিকাতা-৭০০ ০০১

ফোন : ২৮-৭৭৭১

Enjoy your Holiday
at our "Holiday Home" at
Swargadwar Puri.

—Opening Shortly—

P & T Accounts Co-operative Credit Society Limited

30 C R. Avenue. (12th Floor). Yogayog Bhawan, Calcutta-700 012

ENJOY YOUR HOLIDAY
IN OUR FURNISHED COSY POSH LOCATED HOLIDAY HOME
AT
DARJEELING
Near Mount Everest Hotel)
&
PURI
(Near Swargadwar)
"EKANTA"
For Further details please contact our Secretary/Chairman.

Martin Burn's Co-operative Credit Society Limited
12, R N MUKHERJEE ROAD, CAL-1.

Enjoy Holiday Home at Puri
near Sea Side (Marine-Drive)

M/s. Mahindra & Mahindra Calcutta Establishment Employees' Co-operative Credit Society's Holiday Home at Puri.

Location : BANI BHABAN, GOUR BADSAHI, Swargadwar Road, PURI ORISSA
Near opposite to Sea-Hawk Hotel Marine Drive Akhaya Dham.
From Rly Station—25-30 minutes by Auto Rickshaw Rickshaw cycle.

Accommodation & Rates :

Three Beded 4 Rooms - Rs. 40/- per room per day
Caution Money— Rs 50/- per room (Refundable)
For 3 three persons allowed to stay per room.

All rooms are attached with bath & Kitchen with utensils as per list enclosed.

With best compliments from

The Uttarpara Co-operative Bank Limited

8, Sridhar Chakraborty Street,
Uttarpara, Hooghly

With best compliments from

The Calcutta Metropolitan Water & Sanitation Authority Staff Co-operative Credit Society Ltd.

Registration No. 37 CAL (1976)
(Registered Under W. B. Co-op. Soc. Act. XXXVIII of 1973)

Registered office : 32, B. B. D. Bag (South), Calcutta-700 001
Phone : 23-2346 47

With best compliments from

The Bengal Printing Works

BAGBAZAR, CHANDANNAGAR
HOOGHLY

জলপথ পরিবহণের দ্বাদশবর্ষে
সমবায়ী বন্ধুগণ ও যাত্রীসাধারণকে
জানাই
শারদীয় অভিনন্দন

* যানজ শহরের যোগাযোগ রক্ষাকারী সহজ পরিবহণের সার্থক বিকল্প আমাদের লঞ্চ সার্ভিস। দৈনিক প্রায় ১০ হাজার যাত্রী সহজ যাতায়াতের মাধ্যম।

* আগামী পূজোর দিনগুলোতে প্রতিমা দর্শনার্থীদের যাতায়াতের শ্রান্তি দূর করার জন্য আমাদের বিশেষ লঞ্চ সার্ভিস অব্যাহত থাকবে।

হুগলী নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি লিমিটেড

৪/৫, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড হাওড়া-১

Eastern Railway Employees' Co-operative Bank Limited

Regd. Office :
17, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001

Admn. Office
10, STRAND ROAD, CALCUTTA-700 001

Our Branches For Banking Transactions :

★ FAIRLIE PLACE ★ HOWRAH ★ LILUAH ★ ASSANSOL
★ DHANBAD ★ DANAPUR ★ MUGHAL SARAI ★ JAMALPUR

অন্য খেলা

কৃষ্ণক সাহা

মারাহ্ জোর্টলি-কে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন ওর নাম-টা জানতাম না। রোমে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার তখনও দিন সাতেক বাকি। এক ঝাঁক মেয়ের মধ্যে ও-ই আমার নজর কেড়েছিল। প্রেস সেন্টারে মেয়েরা ছিল আমাদের, মানে সাংবাদিকদের সাহায্য করার জন্য। লাল ব্লেজার, সাদা স্কার্ট পরা এক ঝাঁক ইতালির সুন্দরী, সদ্য ইউনিভার্সিটি থেকে আসা।

প্রেস সেন্টারে সাংবাদিকদের জন্য চারটে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তথ্যে এবং বিশ্বকাপের বিভিন্ন খবরে ঠাসা। মেয়েরা এই কম্পিউটারের সামনে বসে থাকত। আমাদের কোনও তথ্যের দরকার হলে, মেয়েদের কাছে গিয়ে অনুরোধ করতাম, কম্পিউটারের বোতাম টিপে তা বের করে দিতে। খুশি মনেই ওরা তা করত। প্রেস সেন্টারে আমাদের জন্য, আর ছিল পানীয়ের ব্যবস্থা। এই মেয়েরা আমাদের তা এনে দিত।

রোমে পৌঁছবার দ্বিতীয় দিনেই মারাহ্ আমার চোখে পড়েছিল। সকাল নটা-সাড়ে নটায় প্রেস সেন্টারে পৌঁছি। মনোমতো একটা জায়গা খুঁজে নেওয়ার জন্য। টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাটাতেই বসব। প্রেস সেন্টারের পিছনেই সুইমিং পুল। সেখানের যাওয়ার জন্য কাঁচের একটা দরজা। তার পাশে একটা কোনে নিরিবিলি জায়গা পেয়ে গেলাম। ব্যাগ থেকে কাগজ-পত্র বের করে, গুছিয়ে বসব, এমন সময় কানের পাশে সুরেলা কণ্ঠস্বর, "ক্যান আই হেল্প ইউ, সেনর।"

চমকে তাকিয়ে দেখি, আমারই সমবয়সী একটা মেয়ে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। সোনালি চুল, বেণী বাঁধা, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, অন্য ইতালির মেয়েদের মতো ছিপছিপে নয়। তবে যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, ওর নীল চোখ। সুন্দরী মেয়েদের সামনে আমি কোনওদিনই স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। মেয়েটাকে দেখে মনে হল, সুন্দরী কথাটাও যেন কম, প্রীক দেবী। তাড়াতাড়ি বললাম, "নো, থ্যাঙ্ক য়ু।"

মেয়েটা যাবার হাসল। এত সুন্দর দাঁতের পাটি, কোনও মেয়েকে এত কাছ থেকে কোনওদিন দেখিনি। কাজের একটা ডেস্ক দেখিয়ে, মেয়েটা বলল, "আমি ওখানে আছি। কোনও দরকার হলে ডেকো।" একথা বলেই, ডেস্কে বসে থাকা এক ঝাঁক মেয়ের মধ্যে ও মিশে গেল।

...ওর নাম যে মারাহ্ সেটা জানলাম কয়েক দিন পর। নাইজিরিয়ান এক সাংবাদিকই আমাকে জানাল। ঐ ক্রিস ওকাপো-র সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশের সাংবাদিক বলেই বোধহয়। প্রায় ছফুট লম্বা, টি শার্টের আড়াল থেকেও ওর পেশীগুলো যেন বেরিয়ে আসতে চায়, এমনই পুরুষালি চেহারা। রোমে ইউরোপিয়ান সাংবাদিকদের সঙ্গে আফ্রো-এশীয় সাংবাদিকদের একটা ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল। ক্রিস ওকাপো দুটো গোল করে আমাদের জেতায়। সেই ম্যাচে আমি যাইনি। ছাউ লেগে যাওয়ার ভয়ে। ম্যাচ খেলে প্রেস সেন্টারে ফিরে এসে, ক্রিসের সে কী রাগ!

"তোমার জন্য আমাকে কথা শুনতে হল আজ। আমাদের তো টিমই হারছিল না। কেন গেলে না?"

ওর রাগ দেখে বললাম, "সকালে একটা খবর পেয়ে গেলাম। ফ্যাক্সে সেটা পাঠাতে দেরি হয়ে গেল। না হলে ঠিক ম্যাচে যেতাম।"

ক্রিস বলল, "বাজে কথা। আমরা যখন সাবা চেমেড়ার গুরোরগুলোর সঙ্গে লড়ছিলাম, তখন তুমি এখানে বসে মারাহ্ জোর্টলি-র সঙ্গে ফুসুর ফুসুর করছিলে। তোমরা, ইন্ডিয়ানরা মেয়ে পটাতে ওস্তাদ।"

এত বড় কমপ্লিমেন্ট কেউ আমাকে কোনওদিন দেয়নি। কিন্তু মারাহ্ জোর্টলি আবার কে? অবাক হয়ে প্রশ্নটা করতেই ক্রিস ডেস্কের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, "ওই তো, ওই মেয়েটা, যার সোনালি চুল।"

তাকিয়ে দেখি, মেয়েটা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সুইমিং পুলে যাওয়ার দরজাটা খোলা। হু হু করে বাতাস ঢুকছে। সোনালি চুলগুলো উড়ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রিসকে বললাম, "ওই মেয়েটার নাম যে মারাহ্, আমি জানতাম না। আর শুনে রাখ, ওর সঙ্গে আমি মোটেই ফুসুর ফুসুর করি না। ইতালিয়ান কাগজ-গুলো রোজই বিশ্বকাপ নিয়ে প্রচুর রিপোর্ট লেখে। তারা কী লেখে, সেটা জানার জন্যই আমি রোজ মারাহ্-র সাহায্য নিই। ইতালির ভাষা থেকে ও ইংরেজি অনুবাদ করে শোনায়।"

ক্রিস একথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, "অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য ও টাকা নেয় না?"

বললাম, "মোটেই না।"

ক্রিস বলল, "প্রায়ে ভাই, আমি তো এই রকমই একটা মেয়ে খুঁজছিলাম। সেদিন এখানকার একটা মেয়েকে অনুবাদ করে দিতে বলেছিলাম। আমাকে সাফ বলে দিল—বলে পারিশ্রমিক না দিলে কিছুই করবে না। তোমার কপাল ভাল।"

পরদিন থেকে আমার কপাল অবশ্য পুড়ল। সকালে প্রেস সেন্টারে এসে দেখি, ডেস্কে মারাহ্ নেই। ইতালির কাগজগুলো নিয়ে বসে আছি। খুব খুশিতে প্রায়ের দিন ইন্টারভিউ দিয়েছেন এক ইতালির সাংবাদিককে। কাগজ দেখে বুঝতে পারছি। কিন্তু পড়তে পারছি না। অসহায়ভাবে বেল কয়েকবার চক্কর দিলাম প্রেস সেন্টারে। মারাহ্-কে কোথাও দেখতে পেলাম না। তবে কী ও আসেইনি। কী করব ভাবছি, এমন সময় ডেস্কের একটা মেয়ে এসে বলল, "তুমি কী মারাহ্-কে খুঁজছ? ও বাইরে সুইমিং পুলের ধারে আছে।"

পা চালিয়ে সুইমিং পুলে গিয়ে দেখি,

ক্রিসের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে ধারাহ্ বসে আছে। একটা পা অন্যটার ওপর রাখা। হাঁটুর একটু ওপর থেকে অন্যবস্ত্র। ধারাহ্-র হাতে খবরের কাগজ। অনুবাদ করে যাচ্ছে। ক্রিস কী যেন লিখছে। লিখছে কি? আমার তো মনে হ'ল, ধারাহ্-র উরুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওই দিকে চোখ রেখেই ক্রিস মাথা নেড়ে যাচ্ছে। ভান করছে, মন দিয়ে শুনছে।

হঠাৎ মুখ তুলে ক্রিস আমাকে দেখতে পেল। হাত তুলে বলল, "হাই। আজ তোমার এত দেরি? নাইট লাইফ এনজয় করেছিলে বুঝি। কাল রাতে কোথায়ও গিয়েছিলে?"

ধারাহ্-র সামনে ইচ্ছে করেই কি ক্রিস এই প্রশ্নটা করল? আমার রাগ হয়ে গেল। তবু রাগ চেপে রেখে বললাম, "আরে, আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি। তোমাকে খুঁজছি। সকাল থেকে স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়া টিম প্র্যাকটিস করছে। ওদের অফিসিয়ালরা সাংবাদিকদের ডেকে ডেকে চমৎকার কিট ব্যাগ দিচ্ছেন। এক্ষুনি যাও। নাহলে পাবে না।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ক্রিস। "তাই নাকি" বলেই হনহন করে চলে গেল স্টেডিয়ামের দিকে। ওর চেয়ারে আমি ঘুরিয়ে বসলাম। স্টেডিয়ামে ছোটে যেতে, অস্ট্রিয়ানদের খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসতে লাগবে কমপক্ষে আধ ঘন্টা। অস্ট্রিয়া দলকে পাবে কোথায়? ওরা তো নেপলস থেকে ফেরেইনি!

রোজই ক্রিসের সঙ্গে আমার লুকোচুরি চলতে লাগল। দু'জনেই চেষ্টা করি, সকালে এসে প্রথমে ধারাহ্কে প্রথমে ধরার। একজন না একজনকে মুখ লুকনো করে ঘুরতে হয়। একদিন দেখি, ধারাহ্ চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ক্রিস সফট ড্রিঙ্কস খাচ্ছে। কথা বলতে বলতে ক্রিস ঝুঁকে পড়েছে। ওর মুখটা ধারাহ্-র একেবারে ঠোঁটের কাছে। ইচ্ছে করলে চুমু খেতেও পারে। কথা বলেই যাচ্ছে ওই অবস্থায় ওরা। কেউ সরছে না। ওইদিন থেকেই ক্রিসকে আমি হিংসে করতে লাগলাম।

...মেক্সিকো বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ছিল ইতালির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার। স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে নিজে বসেছি। আমার প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনাও টের পাচ্ছি। টেবলে দু'জনের বসার জায়গা। আমার পাশে আমারই সমবয়সী এক সাংবাদিক বসে। দু'জনের মাঝে একটা টেলিফোন। সাংবাদিকটি কথা বলছে টেলিফোনে। কথা শুনেই বুঝতে পারলাম আমান। ফ্রিন সেস চম্মা, দারুণ স্মার্ট। পুমা কোম্পানির টি শার্ট পরে। কথা শেষ করেই হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ও বলল, "অনোর নামে লোকে উন্মাদ। তোমার?"

নামটা বললাম। শুনে ও বলল, "তুমি কি ইন্ডিয়ান? আমার স্বিতীয় বাবা-র এক বন্ধু ভারতীয়। তাঁর সারনেম তোমারই মতো, শাহ্।" খেলা আরম্ভ হতে তখনও মিনিট পনেরো বাকি। লোকে-র সঙ্গে ভাল আলাপ হয়ে গেল। ও বলল, স্টুটগার্টের এক নিউজ এজেন্সির হয়ে বিশ্বকাপে এসেছে। এটাই ওর প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ। আমি জানালাম, আমারও।

প্রেস সেন্টারে ক্রিসই একা নয়, লোকে-ও আমার বন্ধু হয়ে গেল। ইতালির নানা শহরে খেলা হচ্ছে। আমাকে কখনও নেপলস, বারি, মিলান, তুরিন, ফ্লোরেন্স অথবা ভেনিস যেতে হচ্ছে। সব এক রাত্রির জার্নি। ম্যাচ কভার করে একদিন বাদে আবার রোমে ফিরে আসছি। ক্রিস বা লোকে-র সঙ্গে দেখা হচ্ছে অনিয়মিত। অত ব্যস্ততার মধ্যেও একদিন ক্রিস আমাকে বলল, "আজ এক কাণ্ড হয়েছে। ধারাহ্ আমাকে ভ্যাটিকান সিটি নিয়ে গিয়েছিল। খুব ঘুরলাম একসঙ্গে। তুমি কি ভ্যাটিকানে গেছ?"

ঘাড় নেড়ে বললাম, "না।"

ক্রিস বলল, "ইতালিয়ান মেয়েদের মতো মেয়ে হয় না।" বলেই একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। এর আগে ক্রিস রোমের নাইট লাইফের কিছু কিছু গল্প আমায় করেছে। "ভাই, এতদূরে এসেছ, সব কিছু দেখে নাও, চেখে নাও।" আমাকেও টানতে চেষ্টা করেছিল। পারেনি। বিবেকে বাধা দিয়েছে। কাজের পয়সায় এসে স্ফূর্তি করতে মন চায়নি। তবে ধারাহ্-কে নিয়ে ও ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়েছিল শুনে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ক্রিস ফেরার পথে আবার নিজের হোটেলে নিয়ে যায়নি তো!

ধারাহ্-কে নিয়ে চিন্তা করার সময় আমার তখন যথেষ্ট নেই। কলকাতা থেকে রোজ তাগাদা যাচ্ছে, আরও কলম পাঠাও। ধারাহ্ প্রেমে পেয়ে বিশ্বকাপ। ধারাহ্ রোজই আমাকে সাহায্য করছে। অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক কথাবার্তাও হয়। তাজমহল দেখার খুব ইচ্ছে। আগ্রার তাজমহল দেখারও। একদিন বলল, "ভারতীয় মেয়েরা কেন মাথায় এবং কপালে লাল পাউডার দেয়, বলতে পারো?"

বললাম, "ওটা সেন্দুর, শুধু বোঝাবার জন্য যে তাঁরা বিবাহিত। কুমারী নয়। ওকে আমরা বলি সিঁদুর।"

ধারাহ্ বলল, "কেন নীল বা হলুদ পাউডার দেয় না?"

এর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বোঝাতে হয়। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাই বললাম, "ভারতের মেয়েরা লাল রঙ খুব পছন্দ করে।" মাঝে মধ্যে খেলা নিয়েও ধারাহ্-র সঙ্গে কথা হয়। ও নিজে এ এস রোমা-র সাপোর্টার। রোমা ক্লাবে খেলে জার্মান ফুটবলার রুডি কোলার। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "ধারাদোনা, না কোলার কে তোমার প্রিয়?"

ধারাহ্ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "অবশ্যই ধারাদোনা। জার্মানদের আমি চক্ষুশূলে দেখতে পারি না। ওরা নিজেদের খুব বড় ভাবে।"

জার্মানদের যে ও কটো অপছন্দ করে, সেটা একদিন টের পেলাম। লোকে, ক্রিস আমি বসে একদিন গল্প করছি, এমন সময় মারাহ্ এল। লোকে-র সঙ্গে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম মারাহ্-কে। ও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। খুব তাড়াহুড়ো করেই দু'-একটা কথা বলে ক্রিস-কে নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় দু'জনে দু'জনের হাত ধরেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রিস একবার চোখ মারল আমাকে। দেখলাম, লোকে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, "ক্রিসের সঙ্গে এই মেয়েটা খুব আজকাল ঘুরছে। নাইজিরিয়ানরা পারে বটে সময় নষ্ট করতে।"

লোকে ম্লান হাসল। বলল, "এই মেয়েটা কি ডিভোর্সড। একবার খোঁজ নিও তো। আমার মনে হয়, ওর একবার বিয়ে হয়ে গেছে।"

আমি একটু অবাক। বললাম, "কি করে জানলে?"

লোকে রহস্যময় হাসি হাসল। বলল, "তুমি খোঁজ নিয়ে আমায় জানিও।"

খোঁজ নেওয়ার সময় আমার ছিল না। হু হু করে দিন কেটে যাচ্ছে। কিকঅফ সেমিফাইনাল পর্যায়ে। নেপলসে ইতালি-আর্জেন্টিনা ম্যাচ দেখে ফিরছি। ট্রেনে দেখা ক্রিসের সঙ্গে। ঘণ্টা পাঁচেকের জার্নি। ম্যাচটা ইতালি মেরে দেছে। সারা দেশ লোকাক্কার। ট্রেনে কেউ কোনও কথা পর্যন্ত বলছে না। ক্রিস বকবকানি শুরু করল। ভিচিনি-র এই করা উচিত ছিল, সেই করা উচিত ছিল। অন্য যাত্রীরা বিরক্ত হচ্ছেন। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই মারাহ্-র কথা তুললাম। ক্রিসের উৎসাহ ফিকে হয়ে গেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মারাহ্-কে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছে, আর কী করেছে—সব ফিরিস্তি দিতে লাগল। ওর কথা শুনে আমার মনে হ'ল, ক্রিস নিজেই খুব মারাহ্-র প্রেমে পড়েনি, মারাহ্-ও ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। খুঁটিয়ে মারাহ্-র কথা জানতে লাগলাম। লোকে-র কথাই ঠিক। একবার বিয়ে হয়েছিল মারাহ্-র। বছর খানেকের বেশি টেকেনি।

.....ফাইনালের দু'দিন আগে হঠাৎ শুনি ক্রিস লাগোস ফিরে গেছে। খবর এসেছে, ওর স্ত্রীর অসুখ। ক্রিস যে বিবাহিত, তাই জানতাম না। এই খবর আমাকে দিল লোকে। বেশ কয়েকদিন বাদে ওর সঙ্গে দেখা। ফাইনাল দিন সাতেক বাদে। জার্মান বিয়ার নিয়ে দু'জনে বসেছি সুইমিং পুলের ধারে। গল্প হচ্ছে। ইতালিতে থাকার মেয়াদ দু'জনেরই ফুরিয়ে আসছে। আর চারদিন। লোকে নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছে স্টুটগার্ট থেকে। গাড়িতেই ফিরে যাবে। আমি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাব। দিন কয়েক জার্মানিতে থাকব। একথা শুনে লোকে প্রস্তাব দিল, "তুমি আমার গাড়িতে স্টুটগার্ট পর্যন্ত যেতে পার। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে হেইলব্রোনে তোমার বন্ধুর বাড়ি চলে যেও।" প্রস্তাবটা ভালই মনে হ'ল। একথা-সেকথার পর মারাহ্-র কথা উঠল। বললাম, "তোমার কথাই ঠিক। মারাহ্ ডিভোর্সি। আচ্ছা, একদিন ও আমাকে বলল, জার্মানদের দু'চোখে দেখতে পারে না। কেন বল তো?"

লোকে মিটি হেসে বলল, "তাই নাকি, একথা বলেছে। আচ্ছা দেখা হলে, তুমিও বলে দিও, লোকে বলেছে, ও ইতালিয়ান মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারে না। ওরা সবাই নিজেদের বিশ্বসুন্দরী ভাবে।" এত হালকা চালে লোকে কথাটা বলল যে আমার বেশ খটকা লাগল।

.....ফাইনালের দিন মারাহ্-র সঙ্গে দেখা হ'ল। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ কোন্ দল জিতলে তুমি খুশি হবে?" আমাকে চমকে দিয়ে ও বলল, "জার্মানি।"

"এই যে কয়েকদিন আগে তুমি বললে, "জার্মানদের দেখতে পার না?" মারাহ্ হাসল। বলল, "দিন দশেক হয়ে জার্মানদের খুব আমার ভাল লাগছে।"

ফাইনাল হয়ে গেল। জার্মানি চ্যাম্পিয়ন হ'ল। পরদিন প্রেস সেন্টারে সবাইকে বিদায় জানাতে গেছি। সন্ধ্যা হয় হয়। প্রেস সেন্টার ওই একদিনেই ভাঙা হাট। লোকে, মারাহ্ কাউকে খুঁজে পেলাম না। প্রেস সেন্টারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাস ধরে হোটেলে যাব। পিয়াজ্জা নভোনা বলে একটা জায়গায়। প্রেস সেন্টারের বাইরে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। লোকজন কম। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে দু'টো আলিঙ্গনবদ্ধ মূর্তি নজরে পড়ল। রাস্তাঘাটে এসব আকছার দেখা যায়। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মূর্তি দুটো আরও কাছে আসছে। আমার তিন-চার হাত দূরে। একি! লোকে আর মারাহ্!

.....জার্মানি যাওয়া আমার আর হয়নি। পরদিনই দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে উঠে পড়েছিলাম।

জল থেকে জঞ্জাল
স্থল থেকে বাগান
রাস্তা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি
থেকে বস্তি উন্নয়ন—

প্রতিদিনের এই নগরোন্নয়নের যুদ্ধে
আপনার উৎসাহ আর উপলব্ধিই
আমাদের প্রেরণা।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা পুরসভা

West Bengal Financial Corporation

Do you want to set up an industrial unit or expand/modernise an existing unit ?

WBFC has special schemes to serve you

We provide loans and advances to prospective/existing small and medium scale industries in the state.

We assist all types of industries such as manufacturing, processing, preservation, servicing, maintenance etc.

Here is how we do :

A bird's eye view of the various schemes of assistance being offered by us –

- Term of loan upto Rs. 90.00 lakh
- Special concessional schemes for technician entrepreneurs, women entrepreneurs (Mahila Udyam Nidhi) and Ex-servicemen (SEMFEX)
- Term loan for import of machinery from specified countries under the Asian Development Bank (ADB) line of credit.
- Deferred payment guarantee for purchase of indigenous plant & equipment
- Assistance for setting up nursing homes and hotels and purchase of equipment for development and maintenance of roads
- Liberal financial assistance for revival of sick units already assisted by WBFC
- Composite loan up to Rs. 50,000/- to tiny manufacturing units, artisans and craftsman in the rural areas
- Singal Window Scheme (SWS) to assist you with both term loan and working capital loan provided the capital cost and the total working capital requirement do not exceed Rs. 5.00 lakh and Rs. 2.50 lakh respectively
- Term loan up to Rs. 90.00 lakh under Equipment Refinance Scheme for purchase of plant & machinery/utility service equipment by healthy existing units.

For further details, please contact :

General Manager (Operations),

West Bengal Financial Corporation,

12A, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700 001.

Or, our branch offices located in the districts.

THE BENGAL
INCOME TAX CO-OPERATIVE
SOCIETY LIMITED

CALCUTTA

ith best compliments from

Calcutta Dock Labour Board Staff Co-operative Credit Society Limited
20 B, ABDUL HAMID STREET,
CALCUTTA 69

Syndicate Bank Staff Co-operative Credit Society Limited
R. O 23, BRABOURN ROAD
CALCUTTA-700 001
"A Friend in need is
a friend in deed"

শারদীয়া অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

বলরামপুর কাঁইচি বিড়ি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ১ তারিখ—১৮ ৫ ১১৮৩

পোঃ রাঙাডি. জেলা—পুরুলিয়া

আমাদের ১৩১০ নং স্পেশাল কাঁইচি বিড়ি উৎকৃষ্টমানের গুরেরাটি ও মেপালী তামাক দিয়া সুদক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত হয়।

- ধূমপায়ীদের কাছে অনুরোধ আমাদের সমবায় সমিতির তৈরি বিড়ি ধূমপান করে তৃপ্তিলাভ করুন এবং সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে সাহায্য করুন।
- আমরা খুচরো এবং পাইকারি বিড়ি বিক্রয় করি।

হীরালাল কুমার
ম্যানেজার

মহেশ্বর পরামানিক
সম্পাদক

প্রেম কর্মকার
সভাপতি

পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল কিসারম্যান্স কো-অপঃ সোসাইটি লিমিটেড

অযোধ্যাপাহাড়ী, পুরুলিয়া

আমরা উন্নতমানের দেশী ও বিদেশী জাতের চারাপোনা, মাছের পরিপূরক খাদ্য, জাল সুতা ইত্যাদি ন্যায্যমূল্যে যত্নসহকারে সরবরাহ করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আর এস কর
মৃত্যু নিবাহী আধিকারিক ও
জেলা মৎস্যাধিকারিক
পুরুলিয়া

এস সি ভৌমিক
আই এ এস, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত
জেলা সমাহর্তা
পুরুলিয়া

শারদীয় অভিনন্দন জানাই

নিতুড়িয়া ল্যাম্পস লিমিটেড

গ্রাম—সোবাশ, পো:—রাইকালালী, জেলা—পুরুলিয়া
রেজি: নং ১৪ পি, তারিখ ২৮-৩-১৯৭১

সোভনেন্দু মুখার্জি
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

রাখাল মাজি
সম্পাদক

বৈদ্যনাথ সরেন
সভাপতি

তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত ও বিক্রয়ে অগ্রণী ভূমিকায় ৪৬ বছর

রাজগ্রাম কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি লিমিটেড

ফোন—বাঁকুড়া (২৩৬) গ্রাম+পো:—রাজগ্রাম, বাঁকুড়া-৭২২ ১৪৬
(স্থাপিত—১৯৪৪)

শাখা—রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। চাইবাসা রোড ;, দুর্গাপুর (কাপড় মার্কেট), সোনামুখী (পৌর মার্কেট)

সভ্য—৮৫০, কর্মী—৩৫৮, কর্মচারি—৭২, অ-শ্রমিক—২২

শ্রীবিভূতিবিহারী কর
সভাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র কর (দাশক
সম্পাদক

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

প্রণবানন্দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি: নং—০ ডবলু বেঙ্গ, তারিখ ঃ ৩০. ৪. ৮৫

রেজি:+হেড অফিস—৬৩, আর বি ঘোষ রোড
বর্ধমান

আমাদপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পোস্ট—আমাদপুর, বর্ধমান

রেজিঃ নং -২৩৬৭ ফোন নং—মেমারি-৬৫

সেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

যথা :—(১) প্রকৃত চাষীদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দেওয়া হয়।
(২) বর্গাদার বা পাট্টা হোল্ডারদেরও এস পি এল কল্প ঋণ দেওয়া হয়।
(৩) সাধারণ আমানতের উপর শতকরা ১/২ শতাংশ পর্যন্ত বেশি সুদ দেওয়া হয়।
(৪) আকর্ষণীয় ও লাভজনক স্থায়ি ও রেকারিং আমানতের ব্যবস্থা আছে।
(৫) নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে চাষীদের জমি কর্ষণ করে থাকি।
(৬) রাসায়নিক সার, করলা গুঁড়া, কেরোসিনসহ নন-কন্ট্রোল কাপড় ব্যবসা করে থাকি।
(৭) নিজস্ব হাস্কিং মেশিনের মাধ্যমে চাষীদের ধান্য ও গম ভানাই করে থাকি।
(৮) সরকারি প্রকল্পের চাউল, গম এবং রেলনে মালপত্র বিলি করে থাকি।
(৯) নিজস্ব এলাকার একটি শাখা-এর মাধ্যমেও অনুরূপ কাজ করে থাকি।
(১০) চাষীদের উৎপাদিত ফসল কিনে থাকি।

এছাড়া আমরা নূতন কর্মসূচি নিয়েছি :

যথা :—(১) অল্পসুদে অসময়ে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে ধান্য বিলির ব্যবস্থা।
(২) পিতল, কাঁসার জিনিস অল্প সুদে কর্মক দেওয়ার ব্যবস্থা।
(৩) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা চালু করার ব্যবস্থা।
(৪) এই এলাকার সমস্ত চাষীদের সমবায় মনোভাবাপন্ন করার ব্যবস্থা।

পুরুলিয়া জেলাবাসীদের নিজস্ব ব্যাংক

পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

রাঁচি রোড, পুরুলিয়া, (ফোন নং—২২০৪)

শাখা : (১) বাঘদা (ফোন—আলপা-৬৬) (৩) পুরুলিয়া ডে ব্রাঞ্চ (ফোন-২২০৭)
(২) বলরামপুর (ফোন—রাওাড-২৯) (৪) পুরুলিয়া সান্ধ্য শাখা

(রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা)

* আমাদের ব্যাংকে পাবেন সবরকম আমানতের উপর ১২% সুদ বেশি।
* আপনার সঞ্চয় আমানত বীমা প্রকল্পের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
* জেলার ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিদের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প স্থাপনে আমরা স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে থাকি।
* নাবার্ড অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের জন্য আমরা অর্থ বিনিয়োগ করি।
* আপনার পছন্দমতো যে-কোন প্রকার আমানত আজই খুলুন। ৫ বছর ৩ মাস সময়ের ব্যবধানে আপনার টাকা ডবল করার সুযোগ নিন।
* আমাদের হেড অফিস এবং শাখা অফিসসমূহে লকারের ব্যবস্থা আছে।
* সময়মতো কৃষিঋণ পরিশোধ করুন এবং সরকার প্রদত্ত আংশিক সুদ ভরতুকির সুযোগ গ্রহণ করুন।
* পুরুলিয়া শহরে আমাদের সান্ধ্য শাখা খোলা হয়েছে।

শ্রী জি টি লামা	শ্রীনিশিকান্ত মেহেতা	শ্রীসৌম্যনাথ মল্লিক
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সহ-সভাপতি	সভাপতি

KNOW NCCF

NCCF means National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd.

NCCF represents all Consumer Co-operatives of the country at National level.

NCCF renders service to the masses belonging to the vulnerable section of the community.

NCCF serves the people by making them available the essential goods throughout the year.

Besides network of lakhs of consumer co-operatives including urban and rural at primary District and State level. NCCF has its 20 branches spread all over the country in order to meet the requirements of the people.

In order to eliminate the middlemen, NCCF has taken up a number of steps such as arranging manufacturing of goods by detecting its own demand pattern and setting up its own processing units.

NCCF has arrangments even with the co-operative in the foreign land in the bilateral countries and even otherwise to establish its trade arrangements in the interest of common people.

NCCF has been recognised as the largest agency in the public distribution system by the Govt. of India.

Thus, NCCF has gained tremendous confidence of the people of the country and it is, therefore inspired to do its business in doing services to the people.

NATIONAL CO-OPERATIVE CONSUMERS' FEDERATION OF INDIA LIMITED

(NCCF)

H. O. : **3, SIRI INSTITUTIONAL AREA, KHELGAON MARG**
(Behind Hauz Khas) NEW DELHI-110 016

GRAM : Konfed, Telephone Nos. 66-8030, 66-8023, 66-8092
Telex—031-66611

27, MIRZA GHALIB STREET, 4TH FLOOR, CALCUTTA-700 016.

GRAM : NACOFED, Telex : NACOFED-IN-2308,
Phone : 24-2841, 24-5068, 24-1839.

কাশিয়াড়া-পল্লী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

পোঃ—রামেশ্বরপুর, ব্লক মেদিনীপুর, জিলা—মেদিনীপুর

রেজিঃ নং—১৮১ ১৪. ৩. ৭৫) ফোন। মেদিনী-৬৮২

এই সমিতি সকলের সেবায় নিয়োজিত। এই সমিতি রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ সকল প্রকার উন্নতমানের বীজ, কন্ট্রোল ও নন-কন্ট্রোল বস্ত্র ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করে থাকে। চাষীদের সুবিধার্থে হার্ভিং মেশিন, পম্প ভাঙ্গা মেশিন, স্প্রে ও ডেসার মেশিন ও সমিতির নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে জমি কর্ষণ ও মাল পরিবহণ করে থাকে।

কাশিয়াড়া সমিতির নিজস্ব শাখা অফিস আছে

মোঃ ইলিয়াস	সেখ আবদুল কাসেম	হিরণ আলী
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

• নেই কোন ঘর জুড়ি

জেলা-শ্রেষ্ঠ বিড়ি উৎপাদক সংস্থা

বাঁকুড়া জিলা বিড়ি কারিগর সমবায় সমিতি লিমিটেড (৫২২)

কেরানি বাঁধ, বাঁকুড়া

ফোন নং—২৫১

ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাদার, পাট্টাদার কৃষকদের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ দানসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে

ভাগাবাঁধ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম + পোস্ট—ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া

নেপাল বাউরী	অশোক ঘোষ	ছিরু রায়
সম্পাদক	ম্যানেজার	সভাপতি

With best compliments from :

Mobile Civil Emergency Force Employees' Co-operative Credit Seciley Limited

Regd. No. 24 Cal. Dt. 13.8.82. Ph 35-7722

/1, Kankurgachi 2nd. Lane, Calcutta-700 054

প্রহর শেষে

শংকরনারায়ণ পাণ্ড

এই মুহূর্তে শৌভিকের হাতে কোন কাজ নেই। আর সেজন্যে সে যথেষ্ট বিরক্ত। যখন অনেক কাজ থাকে তখন আর পাঁচটা মানুষের মতই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আবার যখন হাতে তেমন কোন কাজ থাকে না তখনও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নিজের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে শৌভিক নিজেই বিস্মিত হয়। আপন মনে তখনও তখনও হেসে ওঠে, একটু পরেই ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে কাজ করতে লেগে যায় আর কাজ না থাকলে লেগে পড়ে কাজ খুঁজতে।

তবে আর পাঁচদিনের এই ঘাম-খেয়ালিপনার সাথে আজকে এই সময়টার যেন কিছুটা তফাৎ আছে। একটু আগেই শৌভিক সেই কাজটা করে এসেছে যা করতে তাকে জীবনের চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। আরও মজার ঘটনা, রওনা হওয়ার সময় শৌভিকের কোনই ধারণা ছিল না যে রোমাঞ্চকর কাজের কথা সে প্রায় ভুলতেই বসেছিল, যে কাজের কথা সে বছর পাঁচেক আগে পর্যন্তও অভিজ্ঞতাভাণ্ড বন্ধুদের কাছে মুখেই গল্প শুনে রোমাঞ্চের প্রাশ্বাদ পেত আর রাতের প্রহরে নিজের কাছে একটা হতাশার শূন্যতায় নিরালম্ব মনুচ্ছবি উপলব্ধি করত—তা বাস্তবে একটু পরেই ঘটে যাবে, অযাচিতভাবে, কামাখ্যন অবলুপ্ত হতে হতে পরপর্যায়ে হয়ে দেখা দেবে। তাহলে শৌভিকের জীবনেও এমন কোন কাজ থাকে যা করতে ক্লান্তি আসে না, কাজ শেষে শরীরে ক্লান্তির রেশ এলেও তাতে নেই চিরাচরিত বিরক্তির ছোঁয়া। কিন্তু অন্য অর্থে? এ কাজ পরবর্তীকালে না পেলে যদি ক্লান্তি আসে? ভাবতে পারে না শৌভিক। আস্বাদন না হলে বঞ্চিত হওয়ার মত দুঃখ থাকে, হতাশাও বিচিত্রময়; কিন্তু আস্বাদিত বস্তুর স্বাদ যদি ক্লেদবাহী হয় তা হলে অভাববোধ তাঁর হওয়াই স্বাভাবিক, তখন শৌভিক কি করবে?

অত দূরে ভবিষ্যতের কথা ঠিক এখনই ভাবতে পারে না শৌভিক। আপাতত মনের মধ্যে, যা ঘটে গেল তারই প্রতিক্রিয়া। বয়স হলেও কিন্তু শৌভিক জানে না, তবে ঘটনাচক্রের ক্রমক্রম্ভলিনীতে প্রবেশের পূর্ব-মুহূর্তে কপালের ঘাম থেকে চোখের নীচ পর্যন্ত শৌভিক যেমনই দেখেছিল। সেই হলুদ ক্ষেত্রের মধ্যে আপাতঃজ্ঞক ডুবে যেতে যেতে সে চাইছিল এই অভ্যাস নিমজ্জনের যেন শেষ না হয়, কিন্তু কি এক শারীরিক বিক্রিয়া তাকে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও প্রতিমুখী পথে তার সুস্থ শরীরকে ফিরিয়ে আনছিল আলোয়, প্রবন্ধানে, তাও ক্ষণিকের জন্যে, আবার নিমজ্জিত হওয়ার জন্যে, অবগাহনের জন্যে। আনন্দ কোথায়, পাতালপুরীতে প্রবেশের মধ্যে না কি প্রবেশ করে মুক্ত হওয়ার মধ্যে না কি মুক্ত হয়ে আবার প্রবেশের রোমাঞ্চ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে? জানে না সে। শৌভিকের চিন্তা তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে, শুধু এটুকু সত্য অবলম্বনীয়ার্থ, শরীরের সম্পূর্ণতার লাভ না করা পর্যন্ত শৌভিক মুক্তি কি তা বুঝতে পারে নি। মুক্ত হতে হবে এমন কোন সুস্পষ্ট বোধও তার ছিল না, শুধু মুক্ত হওয়ার পর বুঝতে পারল, এরকম একটা মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অনেক বছর আগের একটা ছোট্ট ঘটনা খুব মনে পড়ছে। বাড়ের শেষন থেকে কেমন হাসিমুখে নেমে এসেছে সেলাইয়ের ছন্দে মুনন করা একগোছা ঝিনুনী। সদ্য শাড়ি পরতে শিখেছে। শৌভিকও সন্তর্পণে দুবিন কলা গাছের রোয়া ওঠা বাদামী লোমের উপর আলতো করে রেজর ঘোলানো প্রস্তাব করছে। দেওয়ালীর প্রত্যুষের হাতে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী প্রদীপ জ্বালতেই কাজের প্রত্যুষের অন্ধকার দূর হল, একটা দীপ তার শিক্ষা দিয়ে সাধারণত জেলে তুলল আলো। ঘরে। কিন্তু তার থেকেও বেশি দীপ্তিময়ী এক চোখ ঝলসানো আগুন যজ্ঞের আগুনের মত জ্বলে উঠে আশেপাশের অন্ধকারকে গভীরতর করে তুলল। হাত ছেড়ে দেল শৌভিকের। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, মনে হল এই তপ্ত আগুনকে বরণ জানানোর জন্যে কোন দীপশিখার প্রয়োজন নেই, শুধু প্রয়োজন মনের গভীর অনুচ্ছারিত দিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর। ওর নাম এষা।

সেবছর বাৎসরিক উৎসবের জোয়ার এসেছিল অন্য বছরের তুলনায় একটু বেশিতে। বাতাস ছিলেন হাওড়ার ছোরা, কলকাতায়—এ জায়গাটা নতুন গড়ে উঠছে বলে চারদিক এখনও খোলা-মেলা। পুরোনো কলকাতার ঘন চাপা পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যারা সভেতন তারা আশে-পাশে প্লট কিনে রাখছে, পুরোনো দিনের আমলে একটু বা বেশি জায়গা নিয়ে তৈরি করছে বাড়ি। একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে যেমন এক দিন

এক দিন করে অনেকগুলো দিন পেরিয়ে যায় কোন নগর বা নগর উপনিবেশও একদিনে গড়ে ওঠে না। অনেক অনেক পরিশ্রম আর ত্যাগ বিনিময় করে তবেই পাওয়া যায় অনেক কিছু। তবু প্রতীক্ষায় থাকে মানুষ, বৃহত্তর কিছুর জন্যে।

প্রতীক্ষায় থাকতে পারে নি শৌভিক। ইতস্তত করেও হালকা চাবর গায়ে নেমে এসেছিল উপরের খুলো বারান্দা থেকে, একটু এগিয়ে রাস্তা যেখানে মোড় বেঁকেছে সেখানে আবার ও দেখল সেই আগুনশিখা, একটু ধুরুষ রেখে দাঁড়িয়ে রইল শৌভিক। মৃদু কথা ভেসে আসছে শৌভিকের কানে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে নিজের কোন কথার উত্তর ওরকম খুনসুটির শুনতে, ঐ মুখ থেকে; ইচ্ছে করছে মৌমাছির মত গুনগুন করা কথার উত্তর বড় মিষ্টি করে দিতে। কিন্তু সব ইচ্ছেই সাহসে কুলোয় না, অন্তত ঐ মুহূর্তে। তাই হয়তো যা অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, অনেক অপেক্ষা চিরস্থায়ী থেকে যায়, অনেক কুঁড়ি কুঁড়িই থেকে যায়, ফুল হয়ে ফোটার আগেই ঝরে পড়ে না, তবে শুকিয়ে যায়। আর আরও কিছুদিন পরে পাশের ডালে অন্য কুঁড়ি একইভাবে জন্ম নেয়। এবার পরিণতি এক হয় না, হলেও কি এক গাছের সব ফুলই সমানভাবে পরিপুষ্ট হয়? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। ইচ্ছের পূর্ণতা ঘটলেই যে সব সময় তার পরিণতি মধুর হত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে বিকশিত ফুলের মতই বিকশিত ইচ্ছে ইচ্ছের পূর্ণতা ঘটাত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যের দিকটায় এদিকে লোকজনের আনাগোনা কমে আসে। তার সাথে সঙ্গতি রেখেই কমে যায় যানবাহনের সংখ্যা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িগুলোয় এক এক করে জ্বলে উঠতে প্রদীপ মালা। নিজের হতে স্থির হয়ে থাকতে পারছিল না শৌভিক। কিন্তু তা হলেও পা এগিয়ে এই সময়টাকে সংক্ষিপ্তও হতে দিতে চাইছিল না সে। হঠাৎই একটা ভালো লাগা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল সে। মনের মধ্যে গুমরে ওঠা চাওয়া অপ্রত্যাশিতভাবে মিটে গেলে সারা শরীরে একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ ওঠে, কোন এক দুর্বোধ্য কারণে তা সারা দেহের মধ্যেই একটা তরঙ্গ প্রবাহের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করে। শৌভিক এখন ঠিক মনে করতে পারে না, সে কথা আগে শুনেছিল না কি আগে শিহরণের অনুভূতি না শিরশির ছড়িয়ে ফুলেছিল। ভালো লেগেছিল শুনে যার সাথে কথা বলার সোপন কামনা লালন করে সে এতক্ষণ, নিশ্চিতে পাওয়া মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে সে-ই আহ্বান করছে, 'কয়েকটা বাড়ি পরেই আমি থাকি। আপনাকে আমি চিনি, অন্ধকার হো, যদি একটু এগিয়ে দেন।'

ঠিক সেই দুর্লভ ক্ষণে শৌভিক কি তার অন্তরের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল, না কি নেহাৎই পুরুষের স্বভাবজাত ঔদার্যে তার সম্মতি জানিয়েছিল? মনে হয়, এর কোনটাই না। হোমাপিন্ন এক একটি মাথা উঁচু করে থাকা শিখাকে যেমন আলাদা করে চেনা যায় না, সমস্তটা মিলেই হয়ে থাকে এক আকাশ ছুঁতে চাওয়া অগ্নিশিখা তেমনি শৌভিক তার সমস্ত অনুভূতি মিশিয়ে তার আবেদন প্রকাশ করেছিল। খুব মৃদুস্বরে বলেছিল, 'সেঁকিয়ে দেওয়ার কাজটা সাথে নিয়ে যাওয়ায় পরিণত হলে কারুর কারুর মনে অন্য সুর বাজে।' এর উত্তর দেয়নি। অল্প রিনরিন হাসি অন্য মাদকতা সঞ্চার করেছিল। সারাটা পথই আর কোনও কথা বিনিময় হয় নি। তবে কথা না থাকলেও তাকে নিয়ে কর্তব্যের ধাক্কে অতিক্রম করা যায় না। মনে ফোটে পড়া উদ্যত ঢেউয়ের রাশির মাথায় দুলতে দুলতে দুটি মন এগিয়ে যাচ্ছিল। নীরবতা সেখানে দুরুহ নয়, সান্নিধ্য। তাই কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও নীরবতা বজায় ছিল, যেটুকু বাড়তি এসেছিল তা হল দুটি উষ্ণ হাতের পরস্পরকে ছোঁয়ার তাগিদে স্পর্শসুখ। ওদিনটা শৌভিক ভোলে নি।

দুটি প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণী পরস্পরকে সান্নিধ্য কামনা করলে পারিপার্শ্বিকতা যত বাধাই সৃষ্টি করুক মনের গতির কাছে তা হার না মানলেও বেশির ভাগ সময়ই পরাজিত হয়। শৌভিক আর এষাও অনেক তাড়াতাড়ি মনের সংযোগ ঘটিয়ে ফেলেছিল। স্বপ্নের রঙিন রামধনুর জগতে অনেক কল্পনাই হয়তো বাস্তবের মুখ নিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু পেরেছিল তার দামও কি খুব সামান্য? সামান্যই যদি হবে তাহলে পর পর কয়েকটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও কি করে তারা পেরেছিল, অভিভাবকসমেত নিজের পরিবারকে একই ট্রেনের দুই পাশাপাশি কামরায় একই গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়ে 'কাকতালীয়' ভাবে দেখা ঘটিয়ে দিতে? দু-হাতের ব্যবধানে করুণার না লুকিয়ে রেখে হয়েছে, ইচ্ছে করেই আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যের সামনে

সীমিত কথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে প্যারেজে কথা বলেছে। কিন্তু তা-ওতো দীর্ঘ সময়ের ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে শৌভিক বুঝতে পারছে, কথার পরিমাণ আনন্দের পরিমাপকে নিরূপিত করে না, আসল আনন্দ গোপনীয়তায়: গোপনীয়তাবে, অল্পেকটা সামান্য অংশের জন্যে হলেও, একে অন্যের কাছে অ-গোপনীয় হওয়ায়, অনেক বছর পরে শৌভিক কি গোপনীয়, কিন্তু চূড়ায় অ-গোপনীয়তার স্বাদ পেল? পেয়ে থাকলেও শৌভিক চূড়ায় একা নয়, মাকের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, অনেক হতাশা ক্রোধের সেতু পেরিয়ে সে আজ যা পেল তা বোধহয় এভাবে সে পেতে চায় নি। শুধু পেলেই হয় না, পাওয়ার পটভূমিকার ভূমিকাও নিতান্ত গৌণ নয়।

ছাই-রঙা টিপ নাকি মানায় না, বিশেষ করে ভরন্ত বয়সের যুবতীতে: এ তত্ত্ব যারা বিশ্বাস করে থাকেন তারা সম্ভবত এখনও এখাকে দেখেন নি। এখার ক্ষেত্রে টিপ শুধু সুন্দর করে তোলেনি বরং যে টিপ অন্য কোন মেয়ের ক্ষেত্রে অচল বলেই সবাই মনে করবে তাকে এরাই মর্যাদা দিয়েছে, আর শুধুমাত্র মর্যাদা দেওয়াই বা কেন, সেই ছাই-রঙা টিপ যে ছাইয়ের মতোই তা গৌণ নয়, তা যে সমস্ত বৈরাগ্যের ঔদাসীন্যকে কাম্য যৌবনের অসারতার মধ্যেও সারাক্ষণ প্রতিফলন করাতে পারে তা বোধহয় প্রমাণ করার জন্যেই এখার এ সাজ। কয়েক ঘন্টা আগে সবার যে টিপ কপালে এঁকে পাশে দাঁড়িয়ে ফায়ুকোন করেছিল তা কিন্তুটা অস্পষ্ট।

চন্দ্রিমের কাছে পৌঁছেও এখার বুকে টিপ টিপ করছিল, একটু পরেই পৌঁছিকের আসার কথা। এখার মনে হচ্ছিল যেন এক যুগের সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের উপর দিয়ে সে ভেসে চলেছে, যাতে তার ছোট্ট এক টুকরো কাঠ। একটা ঢেউ থেকে আর একটা ঢেউ। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, আর বুঝি সে তাল রাখতে পারছে না। কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের ব্যক্তিগত-টুকে ধরে সে বুঝি চূড়ার ঘন্টার তোলে বসে খেলা করছে। যে সমুদ্রে সে নামবে বলে ভাবে নি, সমুদ্র স্নানের সুখের ঘর প্রবাসের বাতাসের উপর ভর করে কাছে আসতে আসতে ও হারিয়ে যাওয়ার পর সমুদ্রের কথা সে ভুলতেই বসেছিল, সেই সমুদ্রই অবাধ চলন রূপ ধরে তাকে যেন ঘিরিয়ে নিতে চাইছে। ধরে অসমান মৃত্যুর সুখস্পর্শকে সে ভয় পেয়ে চলেছিল, এখা বুঝতে পারছিল না এই ভয় সে কুসংস্কার ভরে প্রথম ধরে ধরে মৃত্যুর তোলে তুলে পড়বে না কি সময়ের কঠিন ব্যবধানে পড়ে তোলা প্রতিরোধ-কেই ঘিরে রাখবে।

কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলতে যাওয়ার কষ্টটুকু তার কিছুই মনে পড়ছে না। মৃত্যুর চরম খাদে তুলে পড়ার সময়ের ভগ্নাংশটুকুতে সে নিজের মধ্যে ছিল না বলেই মনে হয়। যে ভাবনার কোন শেষ নেই সে ভাবনার মধ্যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নিমজ্জিত হতে হতে এক সময় ধৈর্যের সামান্যতম বোধটুকুও অবলুপ্ত হয়, সমস্ত বোধবুদ্ধি শিথিলতা গ্রাস করে, ভাবনায় ক্লান্তি আসে। সে ক্লান্তি দূর করার জন্যে ভাবনাকে সরিয়ে দেওয়া নয় তার মধ্যে পুরো-পুরি আত্মসমর্পণ করেই বোধহয় কিছুটা যা মুক্তি পাওয়া যায়।

স্বপ্ন দেখতে মন চায়। বিশেষ করে তা যদি ভালবাসার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়। কিন্তু সেই একই স্বপ্ন যদি কোন দূরে আঘাতে ভেঙে গিয়ে কতকগুলো হাত পা কাটা বিশ্রী আকারের জানবের রূপ পরিগ্রহ করে অথবা হয়ে পড়ে এমন অ-জাগতিক রূপরেখা যাদের জোড়া লাগানোর যে কোন অক্লান্ত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য তখন যে-কোন স্বপ্ন দেখতেই ভয় করে, স্বপ্ন হলে স্বতন্ত্র কিছুর উপ-লব্ধি হারিয়ে গিয়ে তা তখন শুধু-মাত্র দুঃস্বপ্ন নামেই জেগে থাকে। পাটে নেমে আসা সূর্যের শেষ মিষ্টি তাপ দেহ ভরে শুষে নিতে নিতে শেষ আলোকরশ্মির হারাতে না যাওয়া মেদুরতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে দিতে ওরা শুনেছিল শঙ্খধ্বনি, দিনের অবসানে তার পরবর্তী রূপ মুক্তির আবাহনের সুমধুর ধ্বনি।

কেমন যেন ঘোর লেগেছিল দু-জনেরই চোখে-মুখে, দুজনেরই শরীরে। বিচ্ছিন্নিত সূর্যতাপ শরীরের অণু-পরমাণুতে মিশে গিয়ে অন্য এক উত্তাপের সঞ্চার করছিল গোপনে গোপনে, সে উত্তাপ অন্যকে বোঝানোর নয়, শুধুমাত্র উত্তাপ দিয়েই সে উত্তা-পের প্রমাণ হয়। উত্তাপ থেকে জন্ম নেয় শীতলতা। এখা কি তা বোঝেনি? না কি এখার সে উত্তাপ দমন করার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বহু শতাব্দীর প্রবাহমানা পাহাড়ের বুক চিরে পথ করে দেওয়া প্রপাত সলিল-রাশি? এক অদ্ভুত পরিপ্রেক্ষিত শৌভিকের আর্তি ছাড়িয়ে এখার বাঁচার আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র চিৎকারকে বয়ে নিয়ে চলল পাহাড় থেকে সাগরের দিকে, জলের স্রোতের গর্জন ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কান্নাকাটি-মিনতিকে।

ছোকরার গলা টিপে বন্দী করে রাখা জলের অংশে তখন একটা বুদ্বুদ করে প্রদীপ ভাসানো শুরু হয়েছে। পৌণ্ডিকের মনের মধ্যে জমে থাকা প্রদীপের ভেলা তখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে, জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসা প্রদীপের মতোই ঊর্ধ্বমুখে পরিত্যাগ করে নিশ্চলাত্মা হয়ে নিজের বুকেই নিজে ঢলে পড়ে থাক করে দিচ্ছে।

ছয় পায়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলো এবার। পরমুহূর্তেই ইচ্ছে করল সারা বিজ্ঞানাটার গড়াগড়ি দিতে। বিজ্ঞানার এধার থেকে ওধার, এ কোণ থেকে ও-কোণ সবটা জুড়েই প্রনো এক গন্ধ। এবা জানে ও গন্ধ কোন ধূপের নয়, কোন কৃত্রিম সুগন্ধীজাত নয়, এ গন্ধ কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, এ গন্ধ কেবলমাত্র প্রকৃতিই সৃষ্টি করতে পারে।

কপালের উপর ভাঁজ করে রাখা বাঁ হাতটা নিয়ে পৌণ্ডিক চেকে রাখল বন্ধ করা চোখ দুটো আরও আরও অন্ধকার চাইছে যেন গভীর অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে অন্ধকারের রূপ দেখতে। বাদের সিঠে কিছু একটা যেন সুড়সুড়ে করছে, হাত্য না করার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ তা সম্ভব হ'ল না, অনায়াস অন্ধকারের রস আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেছে। অনুভূতির জায়গা হাতড়াতে লাগল, মনে হ'ল কিছু যেন একটা উঠে এল হাতের দুই আঙুলের ডগায়। অল্প চোখ মেলতেই আবার চোখ বুজে ফেলে চলে যেতে লাগল অতীতের অন্ধকারের গভীরে, যে অন্ধকার প্রায় সূর্যের সমান দীপ্তি নিজেই নিজের তলনা নিজেই ধরে ফেলে দিচ্ছে। সেদিনও উঠে এসেছিল এরকমই কিছু, তবে তা ছিল অনুভূতী বয়সের আর আজ যা এল সময়ের বুকে পা দিয়ে হেঁটে আসা অভিজ্ঞতার একীকৃত রশ্মি। সেদিন তা ছিল অনুভবনে, আর আজ একজনে। পরম বিষাদমাখা প্রাপ্তির হতাশা মাখা আনন্দের পরশ দিয়ে সন্তর্পণে ঠোঁটের উপর বিছিয়ে সে ফুলের আস্বাদ নিতে লাগল পৌণ্ডিক।

কিছুক্ষণ আগের শিথিল ভাবটা অনেকটা কেটে এসেছে। তাহলেও আলস্যের অবসান ছেড়ে উঠতে খুব একটা ইচ্ছে করছে না। জীবনের নৌকো বিভঙ্গবালহীন সমুদ্রে ভাসাতে ভাসতে নাবিক যেন কিছুটা তাকাতেই দেখতে পাচ্ছে সমুদ্রের রেখা লবণাক্ত জলের ভয়াবহতা অতিক্রম করে যতটা সেখানে পাওয়া যাবে প্রকৃতির বুকে সাজানো খাবা, প্রকৃতির জন নিজের বের করে আনা জীবনধারী মাতৃস্তন্য, ধান চোক আর তরিতরকারি চোক এ দোল নতুনভাবে বেঁচে থাকার আশ্বাস। যে নাবিক সমুদ্রের অসীম নীলকেই নিজের জীবনের আদি ও অন্ত বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তার কাছে মাটির কাদা রং চোখে তামাটে আভরণ পড়ে তোলে, সে আভরণ ভেদ করে অনেকদিন আগে দেখা মাটিকে কতটা বাস্তব বা কতটা আপন বলে সে গ্রহণ করবে তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে, কখনো বা সে সন্দেহ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়। মাটি আবার তার হারানো সন্তানকে কোলে তুলে নেয়,—আবার কখনও বা সন্তান বড় অভিমান ভরে মাটির আহ্বানের প্রতি পরম অবিশ্বাসে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মাতৃস্তন্যের আকর্ষণ চিরন্তন, তবে চিরসত্য হয়ে তা কি সব সময় দেখা দেয়? অনেক সময়ই অভিমান আর সব টানকে ছাড়িয়ে ফেলে বিশাল মহীরুহের ধরে উঠে আপনাতে আপনি বিলীন হয়ে যেতে চায়। পৌণ্ডিকের সামনে এখন বিরাট সমস্যা নিজের অন্তর্লীন বহতা স্রোত ছোট্ট-মোট্টা থাকতে থাকতে মেদিনী বিদীর্ণ করার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

জীবনের আবর্তনটা ঠিক সুখের মতই কিনা এই মুহূর্তে এই চিরাচরিত পৌণ্ডিকের মস্তিষ্কের কোষগুলিতে স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কোন নির্দিষ্ট বিন্দু স্পর্শ আবর্তন শেষ করে আসের জায়গাতেই পৌঁছোয়। পৌণ্ডিকের জীবনের মূলধারা থেকে যে দুটো শাখানদী প্রবাহিত হয়ে আপন আপন ছন্দে মিলিত হত, বিচ্ছিন্ন হত ও আবার মিলিত হত তারা প্রায় স্থায়ীভাবেই সমান্তরাল অঙ্ক ছন্দে ক্ষিতল করা শুরু করেছিল, দুই ছন্দই তার মূল কম্পাঙ্ক থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হচ্ছিল, না জানি হঠাৎ কীভাবে কোন প্রলয়ঙ্কর দুর্বার শক্তির ইঙ্গিতবাহী হয়ে আবার একধারায় মিশে গেল। এই কূল-প্লাবী বন্যার বেগকে রোধ করার শক্তি নিজের অজান্তেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল,শুধু পৌণ্ডিকের মধ্যেই নয়। এই মুহূর্তে একই ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এধার মনেও। জীবনে কখনও কখনও এক একটা ঘটনা ঘটে যা কল্পনার অতীত অবাস্তব।

অনেক জায়গা ঘুরে অনেক আবেদন নিবেদন করে অনেক চেষ্টাও চালিয়েও এধাকে তখন ফিরে পাওয়া যায় নি। অনির্দিষ্ট জীবনের মহা-প্রবাহে ভেসে গিয়েছিল এধা নামে সদ্য উচ্ছলতা যুবতীটি। আর যার কূল ভাঙে সে কূল তৈরি করতে উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারে না,

হতাশ নিশ্বাস মাত্র সম্বল করে বাকি জীবন টুক টুক করে সে নিশ্বাস গুণে চলে, কতগুলো গুণলে গোনা শেষ হয়ে পারানির কড়ি মিলবে তা সে জানে না—শুধু মাঝে মাঝে গুনতে ছন্দ হারিয়ে ফেলে, তখন এক নিশ্বাস থেকে আর এক নিশ্বাস কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়। হারানিধি-দিনের বোঝার চেয়েও নিশ্বাসের বোঝা কত ভারি তা উপলব্ধি করে সামান্য হাওয়াকে ক্রমশই বেশি ভারি লাগতে থাকে।

কূল ভাঙল শৌভিকের। অকূল পাথারে ভেসে গিয়ে অন্য কূলে পৌঁছেছে এবা, কূল গড়ে তোলার বিলম্বের ইচ্ছে না নিয়েই। এর জন্যে বিশ বছরেরও বেশি সময় চলে গেছে, সময় তার দাবি মিটিয়ে নিতে ছাড়েনি। সময়ে সময়ে যা বড় বেশি করেই দাম ধরে দিতে হয়েছে মহাকালের রাজসভায়। আর এই অনেক মূল্য ধরে দিতে হয়েছে বলেই সদা-ক্রোটা কুঁড়ি কিন্তু গোছানো গাছানো কূল হতে পারে নি। বড় বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এদিকে ওদিকে তার পাতা ছড়িয়ে দিয়েছে। অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে এবাকে, সেদিনের ভবিষ্যৎ আজকের ছিন্নমূল বর্তমান। যে জীবন আমা নয় অন্য সে জীবন ঘাড়ের উপর এসে পড়ে কিন্তু যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সামান্যতম সুযোগের জন্যে ঘরে বাইরে মনে মনে পাগিয়া হয়ে নিরন্তর নীলকণ্ঠের মেয়ে বেড়ায় তার আরও অনেকের অসাধ্য। এবাও পারছে না এ কঠিন ভার অনির্দিষ্ট কাল বয়ে যেতে। কিন্তু তার নিজের তো কোন উপায় নেই। যার অন্তরে ভালবাসার মানুষটি ভালবাসার চিরন্তনতায় তাকে বুকে টানি নিলে তবেই সে ফিরতে পারে। সমাজের খামখেয়ালী নিষ্ঠুর চাওয়ার মধ্যে তার স্থান কোথায় ঠিকমত নির্ধারণ করে না দিলে সে বুঝিই বা পায় কি করে?

নবমী সন্ধ্যে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে জলের উচ্ছ্বাস হয় সব থেকে বেশি। গানের আসরে সামনের দিকে বসা শৌভিকের চোখে চোখ পড়া মাত্রই উচ্ছ্বাসে সে রকা জলস্রোত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু অন্য পক্ষের মনের খবর? হে ঈশ্বর, গ্রহণ না করলেও সে যেন একটিবার আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা দিয়ে যায়। আমার এতদিনের শুকিয়ে ওঠা বুকে তৃষ্ণিত চাষীর মত বীজ রোপণ না করুক অন্তত জলধারা যেন আমাকে বঞ্চিত না করে।

চিনেছিল শৌভিকও। আর তখনই মনে হয়েছিল এ আসর এখনই শেষ হোক। দীর্ঘ বিরহের পর জিজ্ঞাসার আর্তির ব্যাকুলতা আরও বেশি করে থাকে। দুরু দুরু বুকে গ্রীন রুমে এসে আছে এবা। সমস্ত শৃঙ্খলা আজ ভেঙে যাচ্ছে, আর ভেঙে যাচ্ছে বুকেও শৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার হয়ে যাক এটুকুই এবা মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে।

শৌভিক চেয়েছিল আমন্ত্রণ, তবুও না চাইলেও সে যেত। না গিয়ে সে থাকতেই পারত না। তবে আমন্ত্রণের আগেও আরও কিছু অধ্যায় থাকে। আর সে অধ্যায়ের নায়ক শৌভিককেই হতে হবে। আসর শেষ হওয়ার আগেই লিখিত অনুরোধ পৌঁছে গেল এবার হাতে। পড়তে পারে নি এবা, কেননা কে লিখেছে, কি লিখেছে তা ওর জানা। জল ভরা চোখে অনেক দিন আগের খুবই চেনা হাতের লেখার দিকে পলক না ফেলা চোখে তাকিয়েই নিজে ছুটে চলে এল। খুব কষ্টে সামলে নিতে হল আবেগ। সমাজের কঠিন অনুশাসন অলক্ষ্য থেকে তার রাঙা চোখ দেখিয়ে আটকে রাখল এবাকে। শেষে যে বহুর কণ্ঠস্বর আকুল প্রার্থনা হয়ে জেগে উঠেছিল পাখিনী ঝরার পাহাড় ভাঙা স্রোতে তা ছোঁ মেরে তুলে নিল, 'এসো, অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় আছি।' শৌভিক কি বলবে? অনেকদিন পরে সেই সুন্দর সুরে শৌভিকের নিজের মধ্যেই আন্দোলিত হতে থাকল। আত্মসম্বরণ অবস্থায় ওর মুখ থেকে শুধু বেরোল, 'তোমায় নিতে এসেছি। আমার সাথে চল।'

সেও এক জ্যোৎস্নারাত। সে রাতে সুখী গৃহিরা ঘর ঘরে গৃহকোণে। প্রায় পথই যাদের চিরন্তন আবেগের সন্ধান দিয়েছে তারা সেই শৌভিক আর এবা, অনেক বছর আগের মতই নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। দুজনের মনেই কামনা, 'যেও না রজনী আজি লয়ে তারা মনে।' অনেক কথা যখন একসাথে বেরিয়ে আসতে চায় তখন তাদের মধ্যে আসে পরের সঙ্গিরেখা টানা বেশ কষ্টসাধ্য। আর তাই সবশুরে একসাথে ছিলে অনের অন্তরীক্ষে নতুন এক অজানা অচেনা কিন্তু যেন অসীম ভালো-লাগার একটা মাইই সুর বাজতে থাকে। কোন এক অলক্ষ্য ধরনিবর্ণ তাদের দুজনকেই আটকে রাখে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা, হারানো দিনগুলোর হতাশা উগরে ফেলতে।

পায়ে পায়ে দুজনে পৌঁছে যায় বন্ধ দরজার সামনে। চাবি লাগিয়ে ডানদিকে মোচড় দিতেই চার দেওয়া-

দেয় আবরণ, যেখানে নিজেদের গোপনীয়তা মুক্ত হওয়ার জন্যেই সতৃষ্ণ চাতকের মত অপেক্ষা করে। এই গোপনীতা তারা দুজনেই অনেক-দিন কামনা করেছিল, আর যখন পাওয়ার কোন আশা না রেখে হঠাৎ সে দিনটা কেমন যেন এসে গেল তখন পাওয়ার উপরেও বিশ্বাস হারিয়ে যায়। আর হয়তো বা বাস্তবকে হাতে ছুঁয়ে যাওয়া কিনা পরীক্ষা করার জন্যেই তারা পরস্পরের বাহুবের মধ্যে আরও গভীর হয়ে জড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে বাস্তব সরে গেলেও সারা দেহে গন্ধ হয়ে লেগে থাকে, অনেক স্নানেও তা ধুয়ে মুছে যায় না।

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসার আগেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে শৌভিক। টুকটাক জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে আবার দুজনের হয়, হবে এবার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। দরজায় দুবার ধাক্কা শুনে এরা আবার নেমে আসে বাস্তবে। খোকে গুছিয়ে উঠতে হবে, দেখতে হবে কে এল। উঠতে হ'ল না এবাকে। কলিং বেল বাজিয়ে আর একবার দরজায় আঘাতের আগেই বাইরে শৌভিকের গলা শোনা গেল, 'আমি শৌভিক।'

তোমার জন্যেই দরজা দুবছর ভেজিয়ে রাখা আছে, তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যেই।

উজ্জ্বল পদক্ষেপে প্রবেশ করে শৌভিক। এরা আগের অবস্থান থেকে বলে, 'কই, এসো। আমি এখানে।'

জুতো ও চর্মজাত দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগ

'চ র্ম জ'

পূজা ও উৎসবে অথবা নিত্যপ্রয়োজনে জুতো, চপ্পল ও বিভিন্ন চর্মজাতদ্রব্যের সম্ভারের জন্য 'চর্মজ' বিপণন কেন্দ্রে আসুন ও ক্ষুদ্র চর্মশিল্প সংস্থা / কারিগর দ্বারা নির্মিত দ্রব্য বিপণনে সহায়তা করুন. ন্যায্যমূল্যে আকর্ষণীয় নূতন নূতন ডিজাইনের চর্মজাত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্মশিল্প উন্নয়ন নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি সংস্থা)

'শিল্পভবন'

২ ও ৩ নং র‍্যাক বার্ণ লেন (পঞ্চম তল), কলিকাতা—৭০০ ০১২

ভাণ্ডার

- **ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার**

৪র্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	৭০০·০০ টাকা
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	৬০০·০০ „
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	৪০০·০০ „
ভিতরে ½ পৃষ্ঠা	২৫০·০০ „
ভিতরে ¼ পৃষ্ঠা	১৫০·০০ „
রঙীন এক পৃষ্ঠা (ভিতরে)	৬০০·০০ „

- **প্রতি সংখ্যায় পাঁচ অথবা তার বেশি সংখ্যক গ্রাহককে এবং পুনর্বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতাকে শতকরা ২০ টাকা ছাড় দেওয়া হয়। পাঁচ ও তার বেশি সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহকারীকেও শতকরা ২০ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।**

- ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক ছায়িত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম।
- ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- মাসিক ভাণ্ডারে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- আপনার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্যের অর্ধেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও প্রতিবেদন কবি সাহিত্যিকদের মনমাতানো লেখায় সমৃদ্ধ বলেতরে এক 'ধারণীয় ভাণ্ডার'। এজন্যে মূল্য তাই মূল্য পঁচিশ টাকা।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের যাবতীয় "West Bengal State Co-operative Union"-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেক অথবা মানি অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট / চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফৎ টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

সম্পাদক, ভাণ্ডার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

(নগর কার্যালয়)

২০এ, নেতাজি সুভাষ রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০১

সমবায়ে জনশিক্ষা

জনতার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সমবায় আন্দোলন এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন সমবায় আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারকল্পে বুলেটিন পটভূমিকায় নিজেদের নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে।

- রাজ্যে ছয়টি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমবায় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।
- সমবায় সমস্যা শিক্ষণ প্রকল্প অনুযায়ী সমবায় সমিতির সদস্যদের ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- সমবায় নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রমের ব্যবস্থা ৮টি শিক্ষণ কেন্দ্রেই আছে।
- অতিও ভিসুয়াল পদ্ধতিতে সমবায় বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।
- প্রতি জেলায় সমবায় সম্পর্কে আলোচনাচক্র, সম্মেলন, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- রাজ্যস্তরেও সমবায় সম্পর্কে সম্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- সমবায় বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।
- সমবায় আন্দোলনের সাহিত্যভাণ্ডার এই 'ভাণ্ডার' নিয়মিত পড়ুন।
- সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে সমবায় শিক্ষা তহবিলের অর্থ আদায়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সমবায় সমিতিসমূহের কাছে অনুরোধ তারা যেন সমবায় শিক্ষা তহবিলের প্রদেয় অর্থ স্থানীয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে "সমবায় শিক্ষা তহবিল" এ্যাকাউন্টে সময় মত জমা দেন।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন-এর প্রধান কার্যালয়
৪নং নরমাথ বাবু লেন, ৫ম তল, কলিকাতা-১২ কর্তৃক প্রচারিত।

বাংলার তাঁত ও হাতের কাজ

বিচিত্র বর্ণের শাড়ি, শান্তিপুরী ধুতি ও জামা এবং পশমি কাপড়। বর্ণে, সুষমায় অনন্য। আর ঘর সাজাবার জন্য চিরকালীন হস্তশিল্প। বেত, কাঠ, মাটির, পোলার আশ্চর্য সুন্দর শিল্পকর্ম। তন্তুজ তন্তুশ্রী, মঞ্জুষা বা চর্মজ-এর দোকানে আসুন। পণ্যসম্ভারে নিজের রুচির প্রতিফলন আপনাকে আনন্দিত করবে।

বাংলার শিল্প ঃ আপনার গৌরব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—৩৩২৩.১১

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

প্রতিটি চারাগাছকে বড় করে তোলার জন্য যেমন উপযুক্ত ব্যবধানে সযত্নে রোপণ করতে হয়, তেমনি প্রতিটি শিশুকে সুস্থ, সবল করে গড়ে তুলতে চাই – শিশুদের জন্মের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান।

লুপ, আন্তরাহ বড়ি, নিরোধ ইত্যাদি প্রাথমিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে ইচ্ছামত সন্তানলাভ করা সম্ভব।

এজন্য যে কোন নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার কল্যাণ বিভাগে যোগাযোগ করুন।

মাস মিডিয়া • রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর • প: ব: সরকার

শারদীয়া অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

বালী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩৯৬ জি টি রোড, বালী, হাওড়া

সমবায় ব্যাঙ্ক আপনার, আমার সকলের

★ এখানে বিভিন্ন জমা প্রকল্পে যে-কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি হারে সুদ প্রদান করা হয়।

★ সহজ শর্তে স্বর্ণ কারকী ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ঋণ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ একটা পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য আপনি আপনার নিজের ব্যাঙ্কে আসুন।

● পুরী হলিডে হোমে সুযোগ গ্রহণ করুন ●

"...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও। দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একসেন্ট্রিবিদ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—০৩২৩/১১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ :

- বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- বাঙ্গালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন
- বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- কলকাতা ত্রিশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর
- ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার

জীবনীগ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত
- সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত
- সুকুমার : লীলা মজুমদার
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত

সংকলনগ্রন্থ

- সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত — ৩০ টাকা
- প্রেমেন্দ্র গল্পসংগ্রহ — ৪৫ টাকা
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ — ৫০ টাকা

মুখপত্র

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত
- আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান :

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১/১ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
- ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১০

আই দি ৪-৩৩২৩/৯১

অর্থনৈতিক উন্নতির অংশীদার

ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে
অর্থনৈতিক উন্নতির যে যোগসূত্র রয়েছে রাজ্যে
উত্তরোত্তর বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধিই এটা প্রমাণ করে।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ পর্ষদ উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম, রাণীনগর, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় হলদিয়া এবং উলুবেড়িয়া ইত্যাদি স্থানে যে-সমস্ত শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেই সব কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের যোগান দিতে এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইতিমধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এ রাজ্যে ২০০টি বৃহৎ শিল্প সংস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছে। এতো গেল নতুন শিল্প স্থাপনের কথা। এ পর্যন্ত ৮৯১৭৬টি গভীর, অগভীর ও নদী জলোত্তলন কার্যে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেটে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে কৃষিক্ষেত্রেও রাজ্যে রেকর্ড ফসল সম্ভব হয়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। এক ফসলি চাষের পরিবর্তে দুটো-তিনটে ফসল ফলেছে একই জমিতে। সুখা মরশুমে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে সেচের ফলে রাজ্যে ৭ ৬১০০ হেক্টর চাষের জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে ২২,৬১,২০০ টনেরও বেশি। সেই সঙ্গে অবশ্যই বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৩০৭৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ পর্ষদ যে-সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সে-সব জায়গায় এখন গ্রাহক সংখ্যা ১৭,৫৮,৭২১।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

DEPARTMENT OF POSTS—INDIA

Office Of The Chief Postmaster General

WEST BENGAL CIRCLE

P-36, C. R. AVENUE, CALCUTTA-700 012

POSTAL LIFE INSURANCE, A SPECIALISED SCHEME RUN BY GOVT

Only for Employees of

CENTRAL GOVT., STATE GOVT. LOCAL BODIES, PUBLIC SECTOR UNDER TAKINGS BOTH CENTRAL AND STATE GOVT AIDED EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNIVERSITIES.

All Nationalised Banks. All subsidiary Bank of the State Bank of India and Financing Institutions :

Viz. (a) Industrial Development Bank of India, b) Industrial Finance Corporation of India, (c) Industrial Credit and Investment Corporation of India, d) Industrial Reconstruction Corporation of India, (e) Unit Trust of India, (f E S I. etc.

POSTAL LIFE INSURANCE OFFERS

Lower Premium.

Higher bonus.

Premium deduction from Salary or if desired cash payment in any Post Office through P.R. Book.

Facilities of easy loan and easy payment by nomination.

[] Bonus 1989-90 on whole life policies Rs. 83 - per thousand per annum and Rs. 67/- on Endowment Policies per thousand per annum.

Income Tax Rebate.

PLI for Protection Join PLI Family for General Security Prompt after sale service at P.L.I. Service Counter 1st floor, Yogayog Bhawan, 36, C. R. Avenue, Calcutta-700 012.

For Details Contact Or Write To :

THE CHIEF POSTMASTER GENERAL (PLI Sec.)

WEST BENGAL CIRCLE

P-36, C. R. AVENUE (1st Floor
YOGAYOG BHAWAN, CALCUTTA-700 012
Telephone : 27-1111 (Extn. 91 & 97)
&
26-0710, 26-5417 26-2669

With best compliments from :

The Statesman Employees' Co-operative Credit Society Limited
Registration No. 54 Cal/63
Phone : 27-1000

Statesman House. 4 Chowranghee Square
Calcutta 700 001

We Cordially Invite
You at Our
PURI HOLIDAY HOME
(LILY COTTAGE, Swargadwar)

Please Contact

Dena Bank Employees' Co-operative Credit Society Limited
16 A Brabourne Road, Calcutta 700 001.
Phone No. 22-1113

ভাণ্ডার

- ভাণ্ডার প্রতি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- ভাণ্ডারে সমবায়মূলক লেখা পাঠাতে আগ্রহী লেখকদের অনুরোধ জানান হচ্ছে।
- লেখা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা টাইপ করে এক পৃষ্ঠায় লিখে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠান।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- গ্রাম বাংলার সমবায় সমিতিসমূহের খবরা-খবর পাঠান।
- ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য আকর্ষণীয় শর্তে এজেন্সী হওয়ার জন্য সম্পাদকের নিকট লিখুন।

ভাণ্ডার সমবায় আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র

ভাণ্ডার আপনার আমার সকলের

সমবায় আন্দোলনের পটভূমিকায় বেনফেডের অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা লিঃ (বেনফেড্) একটি নাম। যে নাম আজ সারা পশ্চিমবাংলার চাষীভাই ও সাধারণ মানুষের জীবনে এনেছে এক নতুন উদ্যম। বাংলার চাষীভাইরা আজ আর সহায়হীন, পরিত্রাণ, অর্থ কষ্ট, দেনায় জর্জরিত অনুকম্পার পাত্র নয়। আজও পশ্চিমবাংলার চাষীরা সোনা ফলাতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা তার সভ্য কৃষি বিপণন প্রাথমিক সমিতিগুলির মাধ্যমে একদিকে কৃষি উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদি যেমন রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, অগভীর নলকূপ ইত্যাদির সুষম বিতরণ অপরদিকে উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা করেছেন, সঙ্গে সোনার ফসলের ন্যায্য দাম, সঠিক ওজন ও নিশ্ছিদ্র ছাড়কাট ব্যবস্থা।

বেনফেডের এই প্রচেষ্টায় আমাদের চাষীভাইরা যদি আরও সুখী সম্পদশালী হন, তবেই হবে আমাদের প্রচেষ্টার সফল উত্তর।

পশ্চিমবাংলার কৃষি আন্দোলন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা লিঃ (বেনফেড —সব সময়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা লিঃ (বেনফেড)

১৮, রবীন্দ্র সরণী, পোদ্দার কোর্ট, কলিকাতা—৭০০ ০০১

কৃষি ও কৃষকের সাফল্যের প্রতীক

কৃভকো ইউরিয়া

দীর্ঘদিন ধরে শস্য উৎপাদনে জমির মূল্যবান খাদ্য উপাদান ও উর্ব্বরাশক্তি শেষ হয়ে যায় যাহা পরবর্ত্তী ফসল ভরপুর ভাবে ফলানোর জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

কৃভকো বিশ্বের বৃহত্তম সমবায় সার কারখানা, তার পরীক্ষিত ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাটিকে তার উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য অতি উন্নতমানের ইউরিয়া উৎপাদন করছে। কৃভকোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,৫২,০০০ টন, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এক ব্যাগ ইউরিয়া।

কৃভকো ইউরিয়ার তুষারশুভ্র কণিকার মধ্যে রয়েছে ৪৬% নাইট্রোজেন যা সহজেই জলে মিশে যায়। সব ঋতুতে সব ফসলের উপযোগী এই কৃভকো ইউরিয়া সহজেই চাষীভাইরা পেতে পারেন এর ব্যাপক বিস্তৃত সমবায় সরবরাহ ব্যাবস্থাবলীর এবং কৃষক ভারতী সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে।

KRIBHCO

কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড

ডি ৫ - ১৩৭ সেক্টর - ১, সল্ট লেক, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৪

Paradise

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে সুধানারায়ণ সাউ কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক সত্যযুগ এন্টারপ্রাইজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭২ হইতে মুদ্রিত।